জাগৃহি
শারদীয়
সংখ্যা
১৩৮১

জাগৃহি
JAGRIHI

আশ্বিন, ১৩৮১
October, 1974

মূল্য : দুই টাকা

TALBOT & CO.

দীঘা

ঢেউয়ের কলতান ও ঝাউবনের মর্মর···নির্জন সোনালি সৈকতে আলস্যমধুর মন্থর উজ্জ্বল প্রহর উদ্‌যাপন···অথবা গম্ভীর সাগর-সংগীতের তালে তালে সমুদ্রস্নান···।

‘দীঘা ট্যুরিস্ট লজ’ অথবা ‘সৈকতাবাস’ অথবা ‘চীপ ক্যান্টিনে’ উঠতে পারেন।

‘দীঘা ট্যুরিস্ট লজ’ ও ‘সৈকতাবাসে’র জন্য ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে অগ্রিম বুকিং যাত্রার তিনদিন আগে বন্ধ হয়।

TCP/TB 34A(R)

ট্যুরিস্ট ব্যুরো পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ইস্ট, কলিকাতা-১ ফোন: ২৩-৮২৭১ গ্রাম: TRAVELTIPS

পুজোয় চাই নতুন জুতো
দুরন্ত পায়ে
বেড়ে ওঠার নকশা
ছোট ছোট এই মানুষগুলোর
মন পাওয়ার যাদু— বাহারি অথচ টেকসই জুতো
যা দুরন্ত পায়ের সব দস্যিপনাকে সামাল
দিয়ে পা-কে দেবে নিশ্চিন্ত আরাম।
ক্লাসমেট ০৩
সাইজ ৭-১০
১১-১, ২-৫
পিন্টু ০৬
সাইজ ৩-৬
৭-১০, ১১-১
পনিটেইল ১৭
সাইজ ৯-১১
১২-১, ২-৫
জুবিলী ০৭
সাইজ ৯-১,
২-৫
টাফিস ১০
সাইজ ৯-১১
১২-১, ২-৫
জুনিয়র ০৩
সাইজ ৭-১০
১১-১, ২-৫
কুমারী ৪১
সাইজ ৭-১০
১১-১, ২-৫
Bata
Bata
Bata
Bata

যখন আর যেখানেই থাকুন-
উৎসবে আর আনন্দে
আপনাদের সঙ্গে ইউকো ব্যাঙ্ক॥
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী
করে তুলতে সাহায্য করছে॥
UCOC-40 BEN

With Compliments of :

M/S. ROY TRADERS

233, S. N. ROY ROAD,

CALCUTTA-38

Manufacturers of

Rivets & Nut Bolts

প্রাণলক্ষ্মী ধরিত্রীর গভীর আহবানে
মা দাঁড়ায় এসে
যে মা চিরপুরাতন নূতনের বেশে

—রবীন্দ্রনাথ

জাগৃতি সংঘ পরিচালিত সাহিত্যপত্র

ঊনবিংশ বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৮১

॥ সম্পাদক ॥

দুলাল তপাদার

সূচীপত্র

গল্প

প্রচ্ছদ—সমীর সরকার

শ্রীজ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক জাগৃতি সংঘ, কাটজুনগর, কলিকাতা-৩২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সেন্ট্রাল প্রিন্টিং প্রেস ৭৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

জাগৃতি সংঘের পঁচিশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জাগৃহির সমস্ত লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীকে শুভেচ্ছা জানাই।

—সাধারণ সম্পাদক
জাগৃতি সংঘ।

বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা

অশোক মিত্র

এটা শরৎকাল, উজ্জ্বলতার ঋতু, আনন্দের ঋতু। বাঙালি আমি, রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে পৃথিবীকে চেনার প্রবণতা আমার, রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে আমার ভাবনা-অনুভাবনা নিজেদের প্রকাশ করতে উন্মুখ। শরৎকাল, শাদা-শাদা গাল-ফোলা মেঘ, ভরা নদী, কাশফুল, রবীন্দ্রনাথের গান : বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজায়ে এনেছি ডালা····

গলায় ঠেকে যায় গান, উচ্চারণ করতে পারি না, মুখ নিচু ক'রে বসে থাকতে হয়। ছন্নছাড়া দেশ, গুণ্ডাদের-হাতে-তুলে-দেওয়া সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মন্ত্রীরা-চোর-না-চোররা-মন্ত্রী শাস্ত্রমীমাংসা এই তর্কের প্রান্তে ধুকপুক করছে, কাতারে-কাতারে লোক গ্রামে-গঞ্জে নিরন্ন-বুভুক্ষু, অথচ প্রতিবাদের পরিভাষা আপাতত বিপর্যস্ত। কোথায় নবীন ধানের মঞ্জরী, উপচে-পড়া প্রাচুর্যের উপচার সাজিয়ে কারা আর আসবে এই দুর্ভিক্ষের প্রহরে, রবীন্দ্রনাথের গান এখন নিরেট ব্যঙ্গ। শরৎকাল, নদী-খালের দু'পাড় আচ্ছন্ন ক'রে কাশফুল নিশ্চয়ই ফুটেছে, শেফালির সংস্কৃত সৌরভ আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে নাসারন্ধ্র আক্রমণ করবে, কিন্তু, তা'হলেও, এটা গানের সময় নয়, রবীন্দ্রনাথের গানকবিতা এই মুহূর্তে বীভৎস রসিকতা। দু'কান ঢেকে থাকতে হয় তাই।

যদি তা না-থাকি, তা হ'লে আসলে আমি দু'কান কাটা। দিল্লিতে সিকিম নিয়ে ঢলাঢলি হয়, ভূগর্ভে পরমাণু ফাটানো নিয়ে গর্বিত চর্বিতচর্বণে প্রহর কাটে, হয়তো আগামী বছর আকাশে এক ভারতীয় হাউই ঘুরে-ঘুরে রাজ্যেশ্বরীর মহিমা কীর্তন করবে, জাতির প্রতিরক্ষা বজ্রদৃঢ়তর হবে, নাগা-মিজোদের সিজিল করার জন্য কড়া ক'রে গেরো বাঁধা হবে। শুধু যা একটু ফাঁক থেকে যাবে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয় : দেশের অধিকাংশ লোক না-খেতে পেয়ে কাৎরাবে, গ্রামে-গঞ্জে তাদের অনেকের শব পচবে, হাওয়া দূষিত করবে, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ শরীরটাকে টেনে-হিঁচড়ে রেলস্টেশনে চাই কি এমন কি কাছের শহরে হাজির

করবে যদি দু'মুঠো ক্ষুদকণা মেলে এই আশায়। আশা বরাবরই ছলনাময়ী ঃ জ্ঞান বাড়বে, কিন্তু তার আগেই বোধহয় তাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের গান বেচারীদের কোনো কাজে লাগবে না, নবীন ধানের মঞ্জরী কিংবদন্তী হয়ে থাকবে।

অথচ এমন হবার কথা নয়, কোনো অঙ্কের হিশেবেই নয়। দেশে যা শস্যোৎপাদন, তা সুষ্ঠু বিতরণ করলে পর্যাপ্ত দু'মুঠো সকলেরই ভাগে জোটা সম্ভব। বিদেশীদের কাছে হাত পাতারও কোনো দরকার নেই, নিজেদের যা ফলন সমানভাবে তা সবাইকে পরিমাপ ক'রে দিলেই সমস্যার ইতি। কিন্তু সেরকম তো হবার নয়। সমাজতন্ত্রের ভণিতার দেশ এটা। যারা জলে ভিজে-রোদে পুড়ে-কাদায় হেজে গিয়ে ফসল ফলাবে, দেশের তিরিশ কোটি ভূমিহীন কৃষক তথা স্বল্পবিত্ত চাষী, এই সমাজকাঠামোয় তাদের জীবিকার-বাঁচবার অধিকার গ্রাহ্য নয়। তাদের আবাদী জমি নেই, জমিতে তাদের অধিকার নেই, অন্যের জমিতে তাদের জন খাটতে হয়, সব ঋতুতে কাজ মেলে না, যদিও বা মেলে জন খেটে যা উপার্জন তাতে খিদের খাবার জোটানো সম্ভব নয়, কারণ মহানুভব সরকার শস্য তথা অন্যান্য জিনিশপত্রের হু-হু ক'রে দাম বাড়াবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। নিশ্চিন্ত, কোনো গরিবকেই আর খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে না, সেরকম উপার্জন তাদের নেই। এ এক সুচারু প্রণালীতে উপনীত হওয়া গেছে ঃ খাদ্যশস্যের দাম যত বাড়বে, সাধারণ শ্রমজীবির আহারের পরিমাণ তত কমবে, আহার যত কমবে কাজ করার সামর্থ্যও তার তত হ্রাস পাবে, তার উপার্জনও অতএব ক্রমশ কমবে, সুতরাং তার আহারের পরিমাণ আরো কমবে, এমনি ক'রে আমরা এক চমৎকার সময়ে পৌঁছে যাবো যখন অভাবগ্রস্ত একজনও কেউ থাকবে না, কারণ তারা তার আগেই খিদের তাড়নায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন ফের শরৎ ঋতু সমাগত হবে, উজ্জ্বল ঝকঝকে রোদ্দুর, ভরা নদী, টলমল সুখ, গান, 'মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে, বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা, নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে.... ।'

সেই দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে। আপাতত যে-হতভাগ্যরা না খেতে পেয়ে রেলসড়কের ধারে-শহরের চৌমোহানায়-গ্রামের অশ্বথতলায় মুখ থুব্‌ড়ে মারা যাচ্ছে, কী করা যাবে, তারা তো আগে থেকেই সমাজতন্ত্রের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। মুষ্টিমেয় আমাদের ক'জনের মতো তারা বাঁচার প্রকরণটা শেখেনি, তারা বরাবর বিশ্বাসে ভর দিয়ে চলেছে, বিশ্বাস-

ঘাতকতা শেখেনি, চুরির শিকার হয়েছে, চুরি করতে শেখেনি, অনৃতভাষণ শুনেছে, নিজেরা মিথ্যাবাদী হ'তে পারে নি, মহারানীর জয়গান করেছে, মহারানীকে ঘৃণা করতে শেখেনি, ভাঁওতায় ভুলেছে, ভাঁওতার গহনে ঢুকে তার আসল সত্যটা প্রকাশ করতে শেখেনি। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের সৌজন্য বজায় রেখে গেছে, তাদের ভদ্রতায় কোনো ত্রুটি থাকেনি। ভদ্র থেকে গেছে ব'লেই ঐ ছোটলোকগুলি আজ মারা পড়ছে, আমরা ভদ্রলোকেরা ওদের পথে পা দিইনি ব'লে ওদেরই মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে কেমন বেঁচে-বর্তে আছি, ভবিষ্যতে আরো থাকবো।

সুতরাং গলায় গান ঠেকে যাওয়া উচিত নয়। এটা শরৎকাল, উজ্জ্বলতম ঋতু, অতীতে রাজারা এ-সময় দিগ্বিজয়ে বেরোতেন, এসো আমরা রবীন্দ্রসংগীত শুনি ঃ বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা.....

কথাশিল্পী তারাশঙ্কর

ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্ত

কথাশিল্পী বলতে আমরা বুঝি গল্প, উপন্যাস ও এই জাতীয় গদ্যে লিখিত রসসাহিত্যের স্রষ্টাকে। বাঙলা সাহিত্যে সত্যকার গদ্যের উদ্ভব হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলার কথাশিল্পের প্রকৃত সূচনা। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর যে তিনজন কথাশিল্পীর নাম প্রথমেই মনে আসে তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিনজন স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হলেও সবদিক বিচার করলে তারাশঙ্করের বৈশিষ্ট্যই বোধহয় সবচেয়ে বেশী।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুলাই বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে তারাশঙ্করের জন্ম হয় এবং ১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। তারাশঙ্কর তাঁর প্রায় ৭৩ বৎসরের অধিককাল জীবনে ১২৫টির ও বেশী কাব্য, প্রবন্ধ উপন্যাস গল্প ও নাট্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলির অধিকাংশই গদ্য-কাহিনীর নাট্যরূপ এবং লিখিত গ্রন্থ সমূহের বেশীর ভাগই গল্প ও উপন্যাস। এইজন্য তিনি বিশেষভাবে ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসাবেই পরিচিত।

বাংলা সাহিত্যের অনেক সাহিত্যিকের মতো প্রথম 'ত্রিপত্র' নামক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 'কল্লোল' মাসিক-পত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি গল্প 'পোনাঘাট পেরিয়ে' পড়ে তিনি গল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। রাঢ় অঞ্চলের কয়লাকুঠির সাঁওতাল জীবনকে নিয়ে লেখা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিও তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর প্রথম সার্থক গল্প 'রসকলি' ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের 'কল্লোল' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর থেকে তারাশঙ্করের লেখনী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি রচনায় ক্রিয়াশীল ছিল। সামগ্রিক ভাবে

বিচার করলে তারাশঙ্কর বর্তমানকালে ভারতীয় সাহিত্যের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য দাবীদার।

প্রায় দেড়শোরও বেশী ছোটগল্পের স্রষ্টা হলেও তারাশঙ্কর প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক। প্রকৃত ঔপন্যাসিকের বহুগুণ তাঁর মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে বর্তমান। মহৎ কালজয়ী উপন্যাসের ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য ও সমগ্রতা তাঁর উপন্যাসে এক আশ্চর্য মাত্রায় পরিস্ফুট হয়েছে। মানুষের ভগ্নাংশ নয়, পরিপূর্ণ মানুষের জীবন রহস্যের সন্ধানই তাঁর উপন্যাসের লক্ষ্য। বাঙলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি মানুষকে অস্বীকার না করেও এক বিস্তৃত জনপদের পটভূমিকায় ক্রিয়াশীল এক মানবগোষ্ঠীকে নায়কের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আঞ্চলিকতা ও সাময়িকতার মধ্যেও তিনি সমগ্র ও চিরন্তন দেশ কাল ও পাত্রকে তাঁর উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। এইদিক দিয়ে তিনি একাধারে আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন। তারাশঙ্কর তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে সর্বাঙ্গীন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সমকালীন জীবন ও পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ সচেতনতা থাকলেও তিনি বাংলা তথা ভারতের ঐতিহ্য আদর্শ ন্যায় ও নীতি সম্পর্কে আন্তরিকভাবে আস্থাবান ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই বিষয়ে বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তারপর রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচনায় নগরজীবন অস্বীকৃত না হলে ও প্রধানতঃ গ্রাম্যজীবন ও তার বিভিন্ন দিক সামগ্রিক ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। পাশ্চাত্য স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস দর্শন সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কম-বেশী অবহিত থাকলেও প্রাচ্যের ধ্যান ধারণা আদর্শ ইত্যাদির প্রতি তিনি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। এই দিক দিয়ে 'কল্লোল,' 'কালিকলম,' 'প্রগতি' প্রভৃতি আধুনিক লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বুদ্ধের অহিংসা নীতি, গান্ধীজীর আদর্শ, শাক্ত ও বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতির দ্বারা। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় রাঢ় অঞ্চলের পটভূমিকায় রূপায়িত হয়েছে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও নতুন যুগের সঙ্গে তার সংঘাত, শাক্ত, বৈষ্ণব ও লৌকিক-ধর্মের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, ব্রাহ্মণ্যমহিমাবোধ ও তার পাশাপাশি সাঁওতাল, বাউরী, বেদে, কাহার, নবশাক, বাগ্দি, হাড়ি, মুচি, ডোম, আউল, বাউল প্রভৃতি উপেক্ষিত জন সম্প্রদায়ের জীবনের রহস্য বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াকাণ্ড। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রতিক কালের গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বদেশ প্রেম, বাংলার তথা ভারতের সন্ত্রাসবাদ ও তার সংশয়ময় পরিণাম, মানবতাবোধ প্রসূত সাম্যবাদের আদর্শ ও তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রভৃতি।

তারাশঙ্করের এই মানসিকতা ও তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসও গল্প সাহিত্যের বিষয়বস্তু বিচার করলে দুটি ধারা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। একটি ধারা 'রসকলি', 'বেদেনী', 'রাইকমল', 'কবি', 'নাগিণী কন্যার কাহিনী', 'আরোগ্য নিকেতন', 'রাধা', 'মঞ্জুরী অপেরা' ইত্যাদি গ্রন্থগুলির মধ্যদিয়ে প্রবহমান। দ্বিতীয় ধারা বয়ে চলেছে 'চৈতালী ঘূর্ণী', 'নীলকণ্ঠ', 'আগুন', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ইত্যাদি গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় ধারাটি তাঁর সাহিত্যের মূল ধারা এবং এরই পরিপুরক হয়েছে প্রথম ধারাটি। প্রথম ধারার মধ্যে তিনি দেশের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, আচার, আচরণ, প্রভৃতির সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের শাক্ত, বৈষ্ণব, হাড়ি, মুচি, ডোম, বেদে, কবিয়াল, পটুয়া, মালাকার প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের জীবন রূপায়িত করেছেন। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদে ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ কিছু বেশী। অন্য ধারার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা, সমাজ সংস্কারে আগ্রহ, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও প্রাচীন ভাবাদর্শের সঙ্গে নূতন কালের সংঘাত ও সমন্বয়ের ভাবনা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় ধারায় এক শাখায় তিনি সমসাময়িক নগরকেন্দ্রিক যুগ ও জীবনের নৈরাশ্যবেদনাকে আশ্চর্য্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'মন্বন্তর', 'মহানগরী' প্রভৃতি উপন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে গ্রাম-জীবনের তুলনায় নগরজীবনের রূপকার হিসাবে তাঁর সাফল্য সীমিত।

পূবেই বলেছি ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলি বিশিষ্ট। এইদিক দিয়ে প্রাচীন কাব্যের সঙ্গে তাদের সমধর্মিতা অনুভূত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্র-নাথের উপন্যাসে যে ব্যাপ্তিবোধ ও কালচেতনা লক্ষ্য করা যায় তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে তাদের এক নূতন পটভূমিকায় উপস্থিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মতো ব্যক্তি চরিত্রের গভীরতা সৃষ্টির চেয়ে তারাশঙ্কর সমষ্টিগত চরিত্র সৃষ্টির দিকে বেশী আগ্রহী হয়েছেন। মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি তাদের বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বিস্তীর্ণ দেশ ও কালের পটভূমিকায় এক অখণ্ড ঐক্য প্রকাশিত হয়েছে এবং এই ঐক্যের মধ্যে দিয়েই তিনি মানুষের পরিপূর্ণতার সন্ধান করেছেন। তার পূর্বসূরীদের অনেকের মতো তিনি মানুষকে আদর্শায়িত করে দেখেননি, মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলিকে সহজ ও অকপটভাবে প্রকাশ করেছেন। এই জন্যই তারাশঙ্করের সৃষ্ট চরিত্রগুলি এত জীবন্ত ও স্বাভাবিক। তারাশঙ্করের মতো এত অসংখ্য বৈচিত্র্যময় চরিত্র বোধহয় বাংলা সাহিত্যে আর কেউ সৃষ্টি করেননি। বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত মানুষের চরিত্র সৃষ্টিতে

তারাশঙ্কর বহুক্ষেত্রেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিভূতিভূষণের মতো তিনি পল্লীজীবনকে আদর্শায়িত করেন নি, তিনি পল্লীজীবনকে তার প্রকৃত স্বরূপে ব্যক্ত করেছেন। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও তারাশঙ্করের কৃতিত্ব সুবিদিত। তাঁর 'অগ্রদানী'. 'বেদনেী', 'ডাক হরকরা'. 'তারিণী মাঝি', 'পৌষলক্ষ্মী'; 'জলসাঘর', 'রসকলি', 'ছলনাময়ী', 'জাদুকরী', 'রায়বাড়ী', 'পুত্রেষ্টি', 'তমসা', 'ডাইনী', 'কান্না', 'না', প্রভৃতি গল্প বাঙলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। এই সব গল্পের মধ্যে দিয়ে তারাশঙ্কর যেন বিন্দুতে মানব সিন্ধুর স্বাদ দিয়েছেন। এই সব গল্পের চরিত্রগুলি স্বক্ষেত্রে স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চাইতে তারাশঙ্কর চরিত্রের স্বাভাবিক ও সহজ মূর্ত্তির প্রতি অধিকতর আগ্রহশীল ছিলেন। এর কারণ মাটি ও মানুষ সম্পর্কে তারাশঙ্করের গভীর অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক মননের চেয়ে এক নিবিড় হৃদয়বোধ।

কিশোরদের জন্যেও তারাশঙ্কর যে কয়টি গল্প লিখেছেন সেগুলিও স্বাদে ও বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'কিশোর সঞ্চয়ন'. 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

তারাশঙ্করকে সমগ্রভাবে বুঝতে হলে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার কালের কথা', 'আমার সাহিত্য জীবন' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব ও 'কৈশোর স্মৃতি' অবশ্যই পড়া উচিত। এমন অন্তরঙ্গ ও অকপট আত্মজীবনী বাঙলা সাহিত্যে খুব কমই লেখা হয়েছে।

তারাশঙ্করের রচনাশৈলীর বিষয় যে ত্রুটিগুলি সাধারণতঃ উল্লিখিত হয় সেগুলি হচ্ছে অতিকথন, বক্তৃতা-প্রবণতা, ঘটনার আকস্মিকতা সৃষ্টির দ্বারা নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়াস, কাহিনী বিন্যাসের শৈথিল্য, মাত্রাতিরিক্ত কাব্যিকতা ইত্যাদি। কিন্তু জীবন রসের রসিকতা ও তার প্রকাশ রীতির আন্তরিকতা ও সুস্থ স্বাভাবিকতায় তাঁর রচনার ত্রুটিগুলি অকিঞ্চিতকর বলেই মনে হয়। তাঁর ভাষা কোনো কোনো স্থানে উচ্ছ্বাসময় হলেও সাধারণভাবে তা সাবলীল, গতিশীল ও বাক্যগুণান্বিত। দেশজ শব্দের অবাধ ব্যবহার তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট।

জীবদ্দশায় এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন সাহিত্যিকই তারাশঙ্করের মতো সম্মান পাননি। রবীন্দ্র পুরস্কার ও আকাদেমী পুরস্কার ছাড়াও তিনি একলক্ষ টাকা মূল্যের ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি সম্মান সূচক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত হন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে মরণোত্তর ডি. লিট্

জাগৃতি সংঘের পঁচিশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জাগৃহির সমস্ত লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীকে শুভেচ্ছা জানাই।

—সাধারণ সম্পাদক
জাগৃতি সংঘ।

বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা

অশোক মিত্র

এটা শরৎকাল, উজ্জ্বলতার ঋতু, আনন্দের ঋতু। বাঙালি আমি, রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে পৃথিবীকে চেনার প্রবণতা আমার, রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে আমার ভাবনা-অনুভাবনা নিজেদের প্রকাশ করতে উন্মুখ। শরৎকাল, শাদা-শাদা গাল-ফোলা মেঘ, ভরা নদী, কাশফুল, রবীন্দ্রনাথের গান : বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজায়ে এনেছি ডালা····

গলায় ঠেকে যায় গান, উচ্চারণ করতে পারি না, মুখ নিচু ক'রে বসে থাকতে হয়। ছন্নছাড়া দেশ, গুণ্ডাদের-হাতে-তুলে-দেওয়া সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মন্ত্রীরা-চোর-না-চোররা-মন্ত্রী শাস্ত্রমীমাংসা এই তর্কের প্রান্তে ধুকপুক করছে, কাতারে-কাতারে লোক গ্রামে-গঞ্জে নিরন্ন-বুভুক্ষু, অথচ প্রতিবাদের পরিভাষা আপাতত বিপর্যস্ত। কোথায় নবীন ধানের মঞ্জরী, উপচে-পড়া প্রাচুর্যের উপচার সাজিয়ে কারা আর আসবে এই দুর্ভিক্ষের প্রহরে, রবীন্দ্রনাথের গান এখন নিরেট ব্যঙ্গ। শরৎকাল, নদী-খালের দু'পাড় আচ্ছন্ন ক'রে কাশফুল নিশ্চয়ই ফুটেছে, শেফালির সংস্কৃত সৌরভ আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে নাসারন্ধ্র আক্রমণ করবে, কিন্তু, তা'হলেও, এটা গানের সময় নয়, রবীন্দ্রনাথের গানকবিতা এই মুহূর্তে বীভৎস রসিকতা। দু'কান ঢেকে থাকতে হয় তাই।

যদি তা না-থাকি, তা হ'লে আসলে আমি দু'কান কাটা। দিল্লিতে সিকিম নিয়ে ঢলাঢলি হয়, ভূগর্ভে পরমাণু ফাটানো নিয়ে গর্বিত চর্বিতচর্বণে প্রহর কাটে, হয়তো আগামী বছর আকাশে এক ভারতীয় হাউই ঘুরে-ঘুরে রাজ্যেশ্বরীর মহিমা কীর্তন করবে, জাতির প্রতিরক্ষা বজ্রদৃঢ়তর হবে, নাগা-মিজোদের সিজিল করার জন্য কড়া ক'রে গেরো বাঁধা হবে। শুধু যা একটু ফাঁক থেকে যাবে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয় : দেশের অধিকাংশ লোক না-খেতে পেয়ে কাৎরাবে, গ্রামে-গঞ্জে তাদের অনেকের শব পচবে, হাওয়া দূষিত করবে, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ শরীরটাকে টেনে-হিঁচড়ে রেলস্টেশনে চাই কি এমন কি কাছের শহরে হাজির

করবে যদি দু'মুঠো ক্ষুদকণা মেলে এই আশায়। আশা বরাবরই ছলনাময়ী ঃ জ্ঞান বাড়বে, কিন্তু তার আগেই বোধহয় তাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের গান বেচারীদের কোনো কাজে লাগবে না, নবীন ধানের মঞ্জরী কিংবদন্তী হয়ে থাকবে।

অথচ এমন হবার কথা নয়, কোনো অঙ্কের হিশেবেই নয়। দেশে যা শস্যোৎপাদন, তা সুষ্ঠু বিতরণ করলে পর্যাপ্ত দু'মুঠো সকলেরই ভাগে জোটা সম্ভব। বিদেশীদের কাছে হাত পাতারও কোনো দরকার নেই, নিজেদের যা ফলন সমানভাবে তা সবাইকে পরিমাপ ক'রে দিলেই সমস্যার ইতি। কিন্তু সেরকম তো হবার নয়। সমাজতন্ত্রের ভণিতার দেশ এটা। যারা জলে ভিজে-রোদে পুড়ে-কাদায় হেজে গিয়ে ফসল ফলাবে, দেশের তিরিশ কোটি ভূমিহীন কৃষক তথা স্বল্পবিত্ত চাষী, এই সমাজকাঠামোয় তাদের জীবিকার-বাঁচবার অধিকার গ্রাহ্য নয়। তাদের আবাদী জমি নেই, জমিতে তাদের অধিকার নেই, অন্যের জমিতে তাদের জন খাটতে হয়, সব ঋতুতে কাজ মেলে না, যদিও বা মেলে জন খেটে যা উপার্জন তাতে খিদের খাবার জোটানো সম্ভব নয়, কারণ মহানুভব সরকার শস্য তথা অন্যান্য জিনিশপত্রের হু-হু ক'রে দাম বাড়াবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। নিশ্চিন্ত, কোনো গরিবকেই আর খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে না, সেরকম উপার্জন তাদের নেই। এ এক সুচারু প্রণালীতে উপনীত হওয়া গেছে ঃ খাদ্যশস্যের দাম যত বাড়বে, সাধারণ শ্রমজীবির আহারের পরিমাণ তত কমবে, আহার যত কমবে কাজ করার সামর্থ্যও তার তত হ্রাস পাবে, তার উপার্জ্জনও অতএব ক্রমশ কমবে, সুতরাং তার আহারের পরিমাণ আরো কমবে, এমনি ক'রে আমরা এক চমৎকার সময়ে পৌঁছে যাবো যখন অভাবগ্রস্ত একজনও কেউ থাকবে না, কারণ তারা তার আগেই খিদের তাড়নায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন ফের শরৎ ঋতু সমাগত হবে, উজ্জ্বল ঝকঝকে রোদ্দুর, ভরা নদী, টলমল সুখ, গান, 'মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে, বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা, নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে....।'

সেই দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে। আপাতত যে-হতভাগ্যরা না খেতে পেয়ে রেলসড়কের ধারে-শহরের চৌমোহানায়-গ্রামের অশ্বত্থতলায় মুখ থুব্‌ড়ে মারা যাচ্ছে, কী করা যাবে, তারা তো আগে থেকেই সমাজতন্ত্রের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। মুষ্টিমেয় আমাদের ক'জনের মতো তারা বাঁচার প্রকরণটা শেখেনি, তারা বরাবর বিশ্বাসে ভর দিয়ে চলেছে, বিশ্বাস-

ঘাতকতা শেখেনি, চুরির শিকার হয়েছে, চুরি করতে শেখেনি, অনৃতভাষণ শুনেছে, নিজেরা মিথ্যাবাদী হ'তে পারে নি, মহারানীর জয়গান করেছে, মহারানীকে ঘৃণা করতে শেখেনি, ভাঁওতায় ভুলেছে, ভাঁওতার গহনে ঢুকে তার আসল সত্যটা প্রকাশ করতে শেখেনি। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের সৌজন্য বজায় রেখে গেছে, তাদের ভদ্রতায় কোনো ত্রুটি থাকেনি। ভদ্র থেকে গেছে ব'লেই ঐ ছোটলোকগুলি আজ মারা পড়ছে, আমরা ভদ্রলোকেরা ওদের পথে পা দিইনি ব'লে ওদেরই মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে কেমন বেঁচে-বর্তে আছি, ভবিষ্যতে আরো থাকবো।

সুতরাং গলায় গান ঠেকে যাওয়া উচিত নয়। এটা শরৎকাল, উজ্জ্বলতম ঋতু, অতীতে রাজারা এ-সময় দিগ্বিজয়ে বেরোতেন, এসো আমরা রবীন্দ্রসংগীত শুনি ঃ বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা.....

কথাশিল্পী তারাশঙ্কর

ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্ত

কথাশিল্পী বলতে আমরা বুঝি গল্প, উপন্যাস ও এই জাতীয় গদ্যে লিখিত রসসাহিত্যের স্রষ্টাকে। বাঙলা সাহিত্যে সত্যকার গদ্যের উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলার কথাশিল্পের প্রকৃত সূচনা। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর যে তিনজন কথাশিল্পীর নাম প্রথমেই মনে আসে তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিনজন স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হলেও সবদিক বিচার করলে তারাশঙ্করের বৈশিষ্ট্যই বোধহয় সবচেয়ে বেশী।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুলাই বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে তারাশঙ্করের জন্ম হয় এবং ১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। তারাশঙ্কর তাঁর প্রায় ৭৩ বৎসরের অধিককাল জীবনে ১২৫টির ও বেশী কাব্য, প্রবন্ধ উপন্যাস গল্প ও নাট্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলির অধিকাংশই গদ্য-কাহিনীর নাট্যরূপ এবং লিখিত গ্রন্থ সমূহের বেশীর ভাগই গল্প ও উপন্যাস। এইজন্য তিনি বিশেষভাবে ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসাবেই পরিচিত।

বাংলা সাহিত্যের অনেক সাহিত্যিকের মতো প্রথম 'ত্রিপত্র' নামক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 'কল্লোল' মাসিক-পত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি গল্প 'পোনাঘাট পেরিয়ে' পড়ে তিনি গল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। রাঢ় অঞ্চলের কয়লাকুঠির সাঁওতাল জীবনকে নিয়ে লেখা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিও তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর প্রথম সার্থক গল্প 'রসকলি' ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের 'কল্লোল' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর থেকে তারাশঙ্করের লেখনী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি রচনায় ক্রিয়াশীল ছিল। সামগ্রিক ভাবে

বিচার করলে তারাশঙ্কর বর্তমানকালে ভারতীয় সাহিত্যের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য দাবীদার।

প্রায় দেড়শোরও বেশী ছোটগল্পের স্রষ্টা হলেও তারাশঙ্কর প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক। প্রকৃত ঔপন্যাসিকের বহুগুণ তাঁর মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে বর্তমান। মহৎ কালজয়ী উপন্যাসের ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য ও সমগ্রতা তাঁর উপন্যাসে এক আশ্চর্য মাত্রায় পরিস্ফুট হয়েছে। মানুষের ভগ্নাংশ নয়, পরিপূর্ণ মানুষের জীবন রহস্যের সন্ধানই তাঁর উপন্যাসের লক্ষ্য। বাঙলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি মানুষকে অস্বীকার না করেও এক বিস্তৃত জনপদের পটভূমিকায় ক্রিয়াশীল এক মানবগোষ্ঠীকে নায়কের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আঞ্চলিকতা ও সাময়িকতার মধ্যেও তিনি সমগ্র ও চিরন্তন দেশ কাল ও পাত্রকে তাঁর উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। এইদিক দিয়ে তিনি একাধারে আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন। তারাশঙ্কর তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে সর্বাঙ্গীন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সমকালীন জীবন ও পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ সচেতনতা থাকলেও তিনি বাংলা তথা ভারতের ঐতিহ্য আদর্শ ন্যায় ও নীতি সম্পর্কে আন্তরিকভাবে আস্থাবান ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই বিষয়ে বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তারপর রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচনায় নগরজীবন অস্বীকৃত না হলে ও প্রধানতঃ গ্রাম্যজীবন ও তার বিভিন্ন দিক সামগ্রিক ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। পাশ্চাত্য স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস দর্শন সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কম-বেশী অবহিত থাকলেও প্রাচ্যের ধ্যান ধারণা আদর্শ ইত্যাদির প্রতি তিনি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। এই দিক দিয়ে 'কল্লোল,' 'কালিকলম,' 'প্রগতি' প্রভৃতি আধুনিক লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বুদ্ধের অহিংসা নীতি, গান্ধীজীর আদর্শ, শাক্ত ও বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতির দ্বারা। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় রাঢ় অঞ্চলের পটভূমিকায় রূপায়িত হয়েছে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও নতুন যুগের সঙ্গে তার সংঘাত, শাক্ত, বৈষ্ণব ও লৌকিক-ধর্মের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, ব্রাহ্মণ্যমহিমাবোধ ও তার পাশাপাশি সাঁওতাল, বাউরী, বেদে, কাহার, নবশাক, বাগ্দি, হাড়ি, মুচি, ডোম, আউল, বাউল প্রভৃতি উপেক্ষিত জন সম্প্রদায়ের জীবনের রহস্য বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াকাণ্ড। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রতিক কালের গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বদেশ প্রেম, বাংলার তথা ভারতের সন্ত্রাসবাদ ও তার সংশয়ময় পরিণাম, মানবতাবোধ প্রসূত সাম্যবাদের আদর্শ ও তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রভৃতি।

তারাশঙ্করের এই মানসিকতা ও তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসও গল্প সাহিত্যের বিষয়বস্তু বিচার করলে দুটি ধারা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। একটি ধারা 'রসকলি', 'বেদেনী', 'রাইকমল', 'কবি', 'নাগিণী কন্যার কাহিনী', 'আরোগ্য নিকেতন', 'রাধা', 'মঞ্জুরী অপেরা' ইত্যাদি গ্রন্থগুলির মধ্যদিয়ে প্রবহমান। দ্বিতীয় ধারা বয়ে চলেছে 'চৈতালী ঘূর্ণী', 'নীলকণ্ঠ', 'আগুন', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণ-দেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ইত্যাদি গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় ধারাটি তাঁর সাহিত্যের মুল ধারা এবং এরই পরিপূরক হয়েছে প্রথম ধারাটি। প্রথম ধারার মধ্যে তিনি দেশের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, আচার, আচরণ, প্রভৃতির সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের শাক্ত, বৈষ্ণব, হাড়ি, মুচি, ডোম, বেদে, কবিয়াল, পটুয়া, মালাকার প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের জীবন রূপায়িত করেছেন। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদে ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ কিছু বেশী। অন্য ধারার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা, সমাজ সংস্কারে আগ্রহ, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও প্রাচীন ভাবাদর্শের সঙ্গে নূতন কালের সংঘাত ও সমন্বয়ের ভাবনা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় ধারায় এক শাখায় তিনি সমসাময়িক নগরকেন্দ্রিক যুগ ও জীবনের নৈরাশ্যবেদনাকে আশ্চর্য্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'মণ্বন্তর', 'মহানগরী' প্রভৃতি উপন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে গ্রাম-জীবনের তুলনায় নগরজীবনের রূপকার হিসাবে তাঁর সাফল্য সীমিত।

পূবেই বলেছি ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলি বিশিষ্ট। এইদিক দিয়ে প্রাচীন কাব্যের সঙ্গে তাদের সমধর্মিতা অনুভূত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্র-নাথের উপন্যাসে যে ব্যাপ্তিবোধ ও কালচেতনা লক্ষ্য করা যায় তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে তাদের এক নূতন পটভূমিকায় উপস্থিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মতো ব্যক্তি চরিত্রের গভীরতা সৃষ্টির চেয়ে তারাশঙ্কর সমষ্টিগত চরিত্র সৃষ্টির দিকে বেশী আগ্রহী হয়েছেন। মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি তাদের বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বিস্তীর্ণ দেশ ও কালের পটভূমিকায় এক অখণ্ড ঐক্য প্রকাশিত হয়েছে এবং এই ঐক্যের মধ্যে দিয়েই তিনি মানুষের পরিপূর্ণতার সন্ধান করেছেন। তার পূর্বসূরীদের অনেকের মতো তিনি মানুষকে আদর্শায়িত করে দেখেননি, মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলিকে সহজ ও অকপটভাবে প্রকাশ করেছেন। এই জন্যই তারাশঙ্করের সৃষ্ট চরিত্রগুলি এত জীবন্ত ও স্বাভাবিক। তারাশঙ্করের মতো এত অসংখ্য বৈচিত্র্যময় চরিত্র বোধহয় বাংলা সাহিত্যে আর কেউ সৃষ্টি করেননি। বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত মানুষের চরিত্র সৃষ্টিতে

তারাশঙ্কর বহুক্ষেত্রেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিভূতিভূষণের মতো তিনি পল্লীজীবনকে আদর্শায়িত করেন নি, তিনি পল্লীজীবনকে তার প্রকৃত স্বরূপে ব্যক্ত করেছেন। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও তারাশঙ্করের কৃতিত্ব সুবিদিত। তাঁর 'অগ্রদানী', 'বেদেনী', 'ডাক হরকরা', 'তারিণী মাঝি', 'পৌষলক্ষ্মী'; 'জলসাঘর', 'রসকলি', 'ছলনাময়ী', 'জাদুকরী', 'রায়বাড়ী', 'পুত্রেষ্টি', 'তমসা', 'ডাইনী', 'কান্না', 'না', প্রভৃতি গল্প বাঙলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। এই সব গল্পের মধ্যে দিয়ে তারাশঙ্কর যেন বিন্দুতে মানব সিন্ধুর স্বাদ দিয়েছেন। এই সব গল্পের চরিত্রগুলি স্বক্ষেত্রে স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের চাইতে তারাশঙ্কর চরিত্রের স্বাভাবিক ও সহজ মূর্তির প্রতি অধিকতর আগ্রহশীল ছিলেন। এর কারণ মাটি ও মানুষ সম্পর্কে তারাশঙ্করের গভীর অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক মননের চেয়ে এক নিবিড় হৃদয়বোধ।

কিশোরদের জন্যেও তারাশঙ্কর যে কয়টি গল্প লিখেছেন সেগুলিও স্বাদে ও বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'কিশোর সঞ্চয়ন', 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

তারাশঙ্করকে সমগ্রভাবে বুঝতে হলে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার কালের কথা', 'আমার সাহিত্য জীবন' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব ও 'কৈশোর স্মৃতি' অবশ্যই পড়া উচিত। এমন অন্তরঙ্গ ও অকপট আত্মজীবনী বাঙলা সাহিত্যে খুব কমই লেখা হয়েছে।

তারাশঙ্করের রচনাশৈলীর বিষয় যে ত্রুটিগুলি সাধারণতঃ উল্লিখিত হয় সেগুলি হচ্ছে অতিকথন, বক্তৃতা-প্রবণতা, ঘটনার আকস্মিকতা সৃষ্টির দ্বারা নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়াস, কাহিনী বিন্যাসের শৈথিল্য, মাত্রাতিরিক্ত কাব্যিকতা ইত্যাদি। কিন্তু জীবন রসের রসিকতা ও তার প্রকাশ রীতির আন্তরিকতা ও সুস্থ স্বাভাবিকতায় তাঁর রচনার ত্রুটিগুলি অকিঞ্চিতকর বলেই মনে হয়। তাঁর ভাষা কোনো কোনো স্থানে উচ্ছ্বাসময় হলেও সাধারণভাবে তা সাবলীল, গতিশীল ও বাক্যগুণান্বিত। দেশজ শব্দের অবাধ ব্যবহার তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট।

জীবদ্দশায় এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন সাহিত্যিকই তারাশঙ্করের মতো সম্মান পাননি। রবীন্দ্র পুরস্কার ও আকাদেমী পুরস্কার ছাড়াও তিনি একলক্ষ টাকা মূল্যের ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি সম্মান সূচক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত হন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে মরণোত্তর ডি. লিট্

উপাধি প্রদান করেন। জনপ্রিয়তার দিক দিয়েও তারাশঙ্কর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন। এই সব খ্যাতি অর্থ ও মর্যাদা যেমন সকল সাহিত্যিকই চান তেমন তারাশঙ্কর হয়তো স্বাভাবিক ভাবেই এগুলি চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত জীবনরসের রসিক মহৎস্রষ্টা তারাশঙ্কর সবচেয়ে বেশী করে কি চেয়েছিলেন? 'আমার কালের কথা' গ্রন্থে তারাশঙ্কর লিখে-ছিলেন, "আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়।" এই চাওয়ার মধ্যেই তারাশঙ্করের প্রকৃত শিল্পী সত্তার পরিচয় রয়েছে এবং তিনি যে এ বিষয়ে অনেকাংশে সার্থক হয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

মধ্যবিত্ত সংকট : শিল্প সাহিত্যে

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাকে দেখেছি দেবী লোহিত সকালে,
মাইকেলী মেঘনাদে, বিদ্যাসাগরের
বজ্রগর্ভ করুণায়, বিপ্লবী আরাবে।
আজ বিলাপের কাল! আনন্দআকাশে
জুটেছে অন্যান্য জীব, হননের মন্ত্র মুখে।
অতীতের ঐশ্বর্য মহিমা চেতনার প্রান্তে আজ
বিভীষিকা মূর্তি ধরে
লোকায়ত কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন বিধুর
মধ্যবিত্ত মানসের বিড়ম্বিত গ্লানি?

(সমর সেন)

আর্নল্ড হসার তাঁর দি ফিলজফি অব আর্ট হিস্ট্রিতে শিল্পের সমাজতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে চমৎকার বলেছেন যে সব শিল্পই সমাজনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু শিল্পের সব কিছু সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শিল্পগত উৎকর্ষের কোন সমাজতাত্ত্বিক বিনিময় নেই। একই সামাজিক অবস্থা থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বা অকিঞ্চিৎকর, দু'ধরণের শিল্পই সৃষ্ট হতে পারে। বিশেষ শিল্পীর আত্মসচেতনায় ভঙ্গুর সমাজও ঐক্যবদ্ধ, সংলগ্ন হয় বিশ্বরূপ দর্শনে। শিল্পসৃষ্টি বা শিল্প ক্রিয়ার নিজস্ব ইতিহাস বা যুক্তি আছে। বিশেষ শিল্পের বিভিন্ন স্তরের, মোটিফের আন্তর গাঠনিক সম্পর্কের সূত্রেই এই ইতিহাস বোঝা যায়। সমাজ-ইতিহাসের পটে শিল্প সাহিত্যের বিচারে শিল্পের সামাজিক ইতিহাসের লেখকের এই সতর্ক বাণী অবশ্যই স্মরণীয়—একটি যুগের শৈল্পিক বিভঙ্গের বিচারে সেই সমাজ-সময়ের পট অবশ্যই বিবেচ্য হলেও, শিল্পের নিজস্ব ইতিহাসের বিশ্লেষণও অপরিহার্য। এক্ষেত্রে কিন্তু শিল্পী বা লেখক ব্যক্তিটির ব্যক্তিগত ইতিহাস নানা খুঁটিনাটি বুঝতে সাহায্য করলেও বেশী দূর নিয়ে যেতে পারে না। কারণ কেবল শিল্প-সাহিত্যেই নয়, দর্শন-সমালোচনাতেও অনেক সময়ই শিল্পী বা লেখকের

ব্যক্তিগত মতামত ছাপিয়ে ওঠে অন্য মাত্রা—এঙ্গেলস যেমন বালজাকের বিচারে দেখান বা সাধারণ মানুষের ঘর্মাক্ত প্রাত্যহিক থেকে অনেক দূরে থাকলেও গ্রীক শিল্প সাহিত্যের আকর্ষণ মার্কসের কাছে যেমন একটুও কমে না। কিংবা ব্যক্তিগত ভাবে হিউম সম্পূর্ণভাবে সংশয়বাদী না হলেও তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ সেদিকেই নিয়ে যায়, ঈশ্বরবিশ্বাসী দেকার্তের দর্শনচিন্তা ঈশ্বরনিরপেক্ষ যুক্তিবাদের ভূমিকাই নির্মাণ করে। আসলে লেখক বা শিল্পীর বিশ্বদৃষ্টি তাঁর ব্যক্তিগত ইতিহাসে গড়ে ওঠে না : শ্রেণী বা দলের ইতিহাসের পটেই বিকশিত হয়ে ওঠে। তাই দেখা যায় শিল্পকলার প্রতি নিষ্ঠাবান হয়েও শিল্পী তাঁর শ্রেণীর বিশ্ববীক্ষার ভাঙনে বাস্তবকে ধরতে পারেন না শিল্প-জীবনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়, আবার বিপরীতে সঠিক তত্ত্বকে রূপান্তরিত করতে পারেন না শিল্পের কনটেন্টে, গঠনে। এই শ্রেণীর, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাঙন, উদ্‌ভ্রান্তি, বিশ্বদর্শনের ভেঙ্গে পড়াতেই এ সময়ের বাংলা শিল্প-সাহিত্যের সংকটের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় : কেবল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ভগ্নস্তূপের বিশ্লেষণে বা লেখক বা শিল্পীর ব্যক্তিগত রোজনামচায়, তিনি মদ্য পান করেন কি না বা পুজোয় কোথায় বেড়াতে যান ইত্যাদি গ্রাম্যঘোঁটে এ ব্যাখ্যা লভ্য নয়। যে কোন সামাজিক মানুষের মতই, লেখক-শিল্পীকেও ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে অন্বিত হতে হয় বৃহত্তর সমগ্রে : এই সমগ্রই প্রত্যক্ষতঃ তাঁর শ্রেণী, তাঁর শ্রেণীর পর্বান্তরে, প্রানময়তায়-ভাঙনে লেখকের-শিল্পীর সচেতনে-অচেতনে বিশ্বদর্শন তৈরী হয়। এই বিশ্বদর্শনেরই উচ্চতম প্রকাশ ঘটে শিল্প-সাহিত্যে, লেখক-শিল্পীর আত্মসচেতনতায়। এই শ্রেণীর পটভূমিকাতেই তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত মতামতের দ্বিধা দোলাচল, মাঝে মাঝে স্থূল স্বার্থপরতা অবান্তর হয়ে যায় গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলীবাঁকের উপকথার প্রতীকী তাৎপর্যে, আবার ব্যক্তিগত জীবনে উজ্জ্বল তত্ত্বের আভায় ভাস্বর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস কিছুতেই কাটাতে পারে না নৈরাজ্য, তাঁর শ্রেষ্ঠ দুটি উপন্যাসের নৈরাজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী পরবর্তী পর্যায়ের সঠিক তত্ত্বের উপন্যাস গল্পের ফর্মে আনে বিশৃঙ্খলা, কখনও ছকবাঁধা রক্তহীনতা। ঐক্য-বদ্ধ বিশ্বদর্শন রূপান্তরিত হয় না, উপন্যাসের স্থাপত্যে বা গল্পের ভাস্কর্যে।

বাঙালী মধ্যবিত্ত তার উনিশ শতকীয় ইতিহাস থেকে যে বিশ্বদর্শন গড়ে তুলেছিল, তা আজ ইতিহাসের নানা গতিতে ত্রস্ত, ভগ্ন : কোন ঐক্যবদ্ধ জগৎচিত্রই সেখানে নেই। ১৯০৫—১২-র বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক উল্লাস ও যথার্থ্য ইতিহাসের চাপে, এই শ্রেণীর হিগেমনি সৃষ্টির ব্যর্থতায়, স্বার্থপরতায়, কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে

সংযোগের অভাবে, তাদের সম্পর্কে ভীতিতে, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব না-পাওয়ার মোহভঙ্গে ধীরে ধীরে অতলান্ত অন্ধকারে অবসিত হল। দুর্ভিক্ষ ও দেশবিভাগ, উত্তর-দেশবিভাগ পর্বের ভাবাদর্শগত শূন্যতা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঠাট্টা অসহায় এই শ্রেণীকে এক ক্রান্তি লগ্নে নিয়ে এসেছে : দুরন্ত বিদ্রোহে হয় পুনরুজ্জীবন, নয় ভয়াবহ ভবিষ্যতে প্রতিক্রিয়ার ভূমিকা পালন। কোন বিশ্বদর্শনই শ্রেণী হিসাবে তার আর নেই। এই শ্রেণীর শিল্প-সাহিত্য প্রচেষ্টায় তার এই ইতিহাস ছায়া ফেলতে বাধ্য। কয়েকটি উদাহরণে ব্যাপারটা বোঝা যায়।

মৃণাল সেন স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে, তিনি ক্রোধের, বিদ্রোহের ছবি তুলতে চান। 'ভুবন সোম', 'কলকাতা৭১'-এ তাঁর সৎ প্রচেষ্টা অবশ্যই স্মরণীয় : প্রথম ছবিটিতে যেভাবে তিনি মৌল ভারতীয় জীবনের সামনে আমাদের নিয়ে যান, তা সত্যিই তারিফ করার মত। কলকাতা-৭১-এর বিষয়নিষ্ঠা, সৎ জীবনবোধ আমাদের আশান্বিত করেছিল : মধ্যবিত্ত চেতনার অবসাদের বিপক্ষেই বুঝি আত্মসচেতন শিল্পকর্মে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন মৃণাল সেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী ছবিতে এসেই হোঁচট খেতে হল। এ ছবিটি যে তিনি হাল্কাভাবে তুলেছেন, তা নয়। তিনি যে কোন সচেতন মোটিভ থেকে বিকৃত করতে চেয়েছেন তা ভাবারও কোন কারণ নেই। নিজ বিশ্বাস, বিশ্লেষণ মতই একটি বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত একটি যুবকের আত্মজিজ্ঞাসাকে ধরতে চেয়েছেন মৃণাল সেন 'পদাতিকে।' এই বিশ্লেষণের সঙ্গে যে অনেকের মতান্তর, মনান্তর থাকতে পারে সেটা তো স্বাভাবিক। এই মুহূর্তের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় সেটা হতেই পারে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে মৃণাল সেন তাঁর বিষয়বস্তুর প্রতি সৎই থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশ্বদর্শনের শূণ্যতায়, দ্বিধায় এই বিষয়বস্তুকেই যখন ফিল্মের কনটেন্টে তিনি ধরতে গেলেন, অর্থ-শব্দ-ছন্দ-চিত্রকল্পের সমন্বয়ে শিল্পের প্রতীকে বাঁধতে গেলেন, তখনই দেখা গেল শিল্পের আর্তিতে ধরতে পারছেন না তাঁর বিষয়কে। যে সহানুভূতি যে মহিলার বিচ্ছিন্ন ঘরে যুবকটি আশ্রয় নেয়, তার ভাইয়ের জন্য মৃণাল সেন যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন, যুবকটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিশ্চয়ই সে সহানুভূতি মৃণাল সেনের ছিল। কিন্তু সুস্থ আত্মসমালোচনা যে প্রাণময় ব্যবহার, কর্মের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠে তার প্রতি উৎসাহী থাকতে পারলেন না মৃণাল সেন। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে যুবকটিকে প্রায় শূণ্যে একটি সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে গেলেন। ব্যবহার নির্ভর তাত্ত্বিক তর্ক তাই ফিল্মটিতে প্রত্যক্ষে এল না, পরোক্ষে যেটুকু এল তাও নানা বিকারের মধ্য দিয়ে। যুবকটিকে তার প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে স্থাপন করা হল না,

আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপক অংশ এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইতে চাইছে না। সেই কারণেই যে মৃণাল সেন কলকাতা ৭১-এ প্রথম ও দ্বিতীয় গল্পে নিরাসক্ত মননে বাস্তবকে ধরতে চেয়েছিলেন, তিনি আটতলার বিচ্ছিন্নতায় তাঁর অ্যাকশন-অভিজ্ঞ নায়ককে তুললেন, যার আচার আচরণে তার তীব্র অভিজ্ঞতার কোন পরিচয়ই নেই। মৃণাল সেনের এই ব্যর্থতায় তাঁর ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই কার্যকর, তবে যে শ্রেণীগত পটভূমিকায় ও যে শ্রেণীর জন্য তিনি ছবি তোলেন, তার ইতিহাসও স্মরণীয়। শ্রেণীর বিশ্বদর্শনের ভাঙ্গন, অকিঞ্চিৎকরতার দরুণই, উচ্চবিত্ত মহিলার ব্যক্তিগত এক দুঃখের সঙ্গে ঐ যুবকের যন্ত্রণার সমীকরণ করলেন মৃণাল সেন। বুঝলেন না, এই সমীকরণে যুবকটির যন্ত্রণারও তাৎপর্য হারায়ঃ অর্থাৎ ব্যাপক সময়-সমাজ-চিহ্নিত বিষয়কে তিনি নিছক ব্যক্তিগত স্তরে নিয়ে গেলেন। এই সব কিছুকেই কেবল ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে নিয়ে যাওয়াই শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্তর সংকট ও দুঃস্থতার, বিশ্বদর্শনগত পটভূমিকাকে ভেঙ্গে যাওয়ার লক্ষণ। অথচ কলকাতা ৭১-এ এই দারিদ্র, বঞ্চনার ইতিহাসকেই তিনি করতে চেয়েছিলেন কয়েকটি কাহিনীর চিত্রকল্পে, ব্যক্তির দুঃখ যন্ত্রণাকে তিনি ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন ইতিহাসের পটে। পদাতিকে তিনি উল্টোটানে ভেসে গেলেন। শ্রেণীগত বিশ্ববীক্ষার একান্ত অভাবেই এটা আসে, না হলে সত্যজিৎ রায়ের মত সচেতন শিল্পীও দু-এক বছর আগেই যিনি 'প্রতিদ্বন্দ্বী' তুলেছেন, তিনি কি করে মাতেন দুর্ভিক্ষ নিয়ে রঙীন খেলায়। নানা রঙের সাদৃশ্যে বৈপরীত্যে হয়ে ওঠেন মাত্র ডেকোরেটিভ, অশনি সংকেতের দক্ষ ডিজাইনার?

মৃণাল সেনের বিপরীতে যদি পুর্ণেন্দু পত্রীকে আমরা ধরি তাহলে একই ছবি দেখব। পুর্ণেন্দু পত্রী মৃণাল সেনের মত সমাজ-ইতিহাস সচেতন পরিচালক নন, কিন্তু শিল্পের প্রতি শিল্পের জন্যই নিষ্ঠাবান। কত সুন্দর করে দেখানো যায়, এই প্রাথমিক চিন্তাই তাঁর ফিল্মের মূলে থাকে, আর এবিষয়ে দেশী-বিদেশী ফিল্মের টেকনিকগত ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যভাঙ্গাকে তিনি কাজে লাগান। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন,—এই ত্রয়ীর নানা কাজের ছাপ তাঁর চলচ্চিত্রে থাকে। প্রথম দুটি ফিল্মে মাধ্যমটিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করতে না পারলেও, স্ত্রীর পত্রে গিমিকের লোভ তিনি সামলাতে পারেন নি। কিন্তু ছেঁড়া তমসুকে তিনি অনেক পরিণত, সতর্ক, বিশেষতঃ ফিল্মের সমগ্র ছন্দেই বিভিন্ন সট সিকোয়েন্স-এর পরিকল্পনা তিনি করেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিষয় অনুযায়ী ফর্মের প্রয়োগে পুর্ণেন্দু পত্রী এদিক থেকে যে এগোচ্ছেন তা বেশ বোঝা যায়। মধুর তোমার শেষ যে না পাই,

গানটির চমৎকার ব্যবহারেই তিনি তাঁর সচেতনতার পরিচয় রাখেন: প্রথমবারে ব্রজেনের ব্যবহারের বৈপরীত্যে, পরের বারে তিনটি ছেলের মানসিক পরিবর্তন-মুখীনতা ও অসহ্য যন্ত্রণার পটে দিকপ্লাবিত করে এই গান বাজতে থাকা নিশ্চয়ই তাৎপর্যময়। তিনবন্ধু ও ব্রজেনের স্বীকারোক্তিতে স্টিল ইত্যাদির ব্যবহার তারিফ করার মত: একদিকে ঐ তিনটি যুবকের জীবনে বিজলী কত গভীর অবলম্বনের মত এসেছিল, তা যেমন এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তেমনি প্রচলিত উপায়ে দেখানোর স্থূলতার হাত থেকেও রক্ষা করেছে। তিনটি ছেলের ফুঁপিয়ে কাঁদায় তাদের জীবনে বিজলীর তাৎপর্যই তীব্রভাবে ধরা পড়ে। আবার অন্ধকার জীবন থেকে ছেলে তিনটি যে অন্যমুখী হচ্ছিল তাও ঐ কান্নাতেই আভাসিত। আবার একটু শিথিলভাবে অন্বিত হলেও, বিজলীর আত্মহত্যার পটভূমিকা তৈরী বা প্রভাতের কবিমনের ভেসে ওঠার কাজে কবি সম্মেলনটিকেও পুর্ণেন্দু পত্রী কাজে লাগাতে চেয়েছেন—যদিও এই অংশটি এমনিতে খুবই কাঁচা, একজন কবিকে মত্তাবস্থায় দেখানোর প্রয়োজনই বা কী? এক কথায়, পুর্ণেন্দু পত্রীও মৃণাল সেনের মত তাঁর বিষয়বস্তুর প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠেঃ এই চমৎকার ফিল্মটিকেও কেন শেষ পর্যন্ত একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত কাহিনী হিসাবেই মনে হয়। সেই পুরাতন বাস্তব, কিন্তু কোন নতুন মাত্রা সংযোজিত নয়। কবিতাকে যে অর্থে কেনেথ বর্ক প্রতীকী বলেছেন, সে অর্থে কেন ফিল্মটি প্রতীকী হয়ে উঠল না? পুর্ণেন্দু পত্রী তাঁর নির্বাচিত বিষয়কে এক বিশ্বদর্শনের জগচ্চিত্রে গ্রথিত করতে পারলেন না। ঋত্বিক ঘটক যেমন মেঘে ঢাকা তারায় সাধারণ বিষয়কেই ফিল্মের কনটেণ্টে, অন্যমাত্রায় সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন বা সত্যজিৎ রায় অপরাজিতকে বাংলা দেশের ইতিহাসেরই প্রতীক করেছিলেন, পুর্ণেন্দু পত্রী তা পারলেন না। তাঁর কাহিনী হয়ে গেল বহুবলা গল্পের মতই: বাড়ীর দারিদ্র্য, মেয়েকে দিয়ে উপার্জন, মেয়ের গ্লাণিতে আত্মহত্যা, আবার উল্টোদিকে একটি মেয়ের সংস্পর্শে কয়েকটি তথাকথিত সমাজ-বিরোধীর হৃদয় পরিবর্তন – বাংলা জনপ্রিয় ফিল্মে এ গল্প আগেই পাওয়া গেছে।* সেই কারণেই তাঁর সংযত পরীক্ষা-নিরিক্ষাও গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত হতে

* অবশ্য প্রেক্ষণ সৌন্দর্যের দিকে অতিমনোযোগী হবার ফলে, পুর্ণেন্দু পত্রী তাঁর চরিত্রগুলিকেও যথার্থ প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন নি। ছেলে তিনটির বিচিত্র হাসি, বা মদ্যপান বাংলা ফিল্মের মামুলী ব্যাপার, ব্রজেন বা বিজলী কেউইই স্পষ্ট নয়।

পারল না। চাকিতে খবরের কাগজে রেশনের দাম বাড়ল বা চাকরি নেই-এর বেদনার মতই সবকিছু তেলেভাজা মুড়িতে চাপা পড়ে গেল। ছেঁড়া তমসুকও হল তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ের ব্যক্তিগত কাহিনী। ওপর থেকে গোটা শহরটার বাড়ীগুলো দেখালেও, তাই-ই রইল। মৃণাল সেনের সমাজইতিহাস বোধ ও পূর্ণেন্দু পত্রীর শিল্পর জন্য শিল্প বিশ্বদর্শণের অভাবে, শ্রেণীর উদ্‌ভ্রান্তিতে এক জায়গায় এসে থামল। ফিল্মের ক্ষেত্রে এটি বিবেচনার যোগ্য : কারণ ফিল্মই জনগণের সব থেকে কাছের মাধ্যম, এই আধুনিক যন্ত্রনির্ভর মাধ্যমটিরই লোকশিল্পের ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করার ক্ষমতা প্রবল। অথচ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এই মাধ্যম বাঁধা—মৃণাল সেনের মুল সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া এবং পূর্ণেন্দু পত্রীর বিষয়ের সীমা না বাড়ান সেই কারণে আরও ইঙ্গিতবহ।

ফিল্মের মত শিল্প মাধ্যম থেকে যদি কবিতার দিকে তাকাই তাহলে একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। মধ্যবিত্ত কবিরাও শ্রেণীর ইতিহাসের ক্রান্তি লগ্নে পাচ্ছেন না তত্ত্ববিশ্বের পটভূমি, যাতে তিনি দাঁড়াতে পারেন। আর শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতার উত্তরাধিকারে জনসাধারণের স্রোতস্বিনীতে উজাল ঠেলতেও অপারগ। অথচ কবিতার আবেগকে এই তত্ত্ববিশ্বের দৃঢ় কাঠামোয় বাঁধতে না পারলে কবিতা হয়ে ওঠে স্বাধিকার প্রমত্ত। এমনকি ফরাসী মালার্মের শব্দ ব্রহ্মও একটি তত্ত্বের পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ পোষণে দাঁড়ায়—কবিতার যে ক্রিয়া, মুল অ্যাটিটিউডের সূত্রে কাব্য অভিজ্ঞতার যে প্রায় নাটকীয় অভিব্যক্তি তা দাঁড়াতে পারে কবির বিশ্ববীক্ষার স্থির ভূমিতে। নচেৎ ব্যক্তিগত মনলৌল্যে কবিতা হয়ে ওঠে খেলার সামগ্রী, মুহূর্ততত্ত্বের বিলাস। একই কবি এক এক সময় এক এক রকম লেখেন কখনও বৈচিত্র্যের মোহে, মৌলিক হবার মরীচীকায়—মধ্যবিত্ত বাস্তবের অন্ধকারে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখই বড় করে দেখতে চান তিনি, প্রায় ছেলেমানুষের মতই অন্বিত হতে পারেন না বৃহত্তর সমগ্রে। যেমন একজন কবি লেখেন,

> হলুদ শাড়ি আর পরো না, এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি
> ঘরে তোমার হলদে পর্দা! মিনতি করি খুলে রাখো
> এবার মাঠে হলুদ ধান ফলে নি।
> এপাড়া জুড়ে শানাই বাজে, ওপাড়া জুড়ে শামিয়ানা
> ব্যস্ত মানুষ, সুখী মানুষ, শঙ্খ আর উলুধ্বনি, লাল চেলি
> সবই থাকুক, বন্ধ রাখো গায়ে হলুদ
> এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি।
> [ধান : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়]

কবিতাটির আবেগ নৈর্ব্যক্তিক, ব্যাক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর পটে তিন স্তবকের কবিতাটি প্রায় লৌকিক আবেদনের ঢঙে যাথার্থ্য পায়। দুটি স্তবকের সিঁড়ি পেরিয়ে তৃতীয় স্তবকের শেষ দুটি ছত্রে কবি যখন বলেন, ওমা, তুমি ভয় পেওনা। শিশুর অন্নপ্রাশন হবে অনাদি কালের গোধুলি বেলায়, তখন কবিতাটির ক্রিয়া বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়ে। প্রথম স্তবকে একটি মেয়ে, দ্বিতীয় স্তবকে একটি ছেলে, ও তৃতীয় স্তবকে মাকে উদ্দেশ্য করে কবির কণ্ঠস্বর ধাপে ধারে নাটকের চূড়া স্পর্শ করে অনাদিকালের গোধুলি বেলায়। অথচ এই কবিই বিশ্বদর্শনের তত্ত্ববিশ্বের অভাবে নীরা সিরিজের কবিতা লেখেন। একটি নারীর প্রতীকে উপমায় নিশ্চয়ই জীবনের আবেগ নাটক দানা বাঁধতে পারে, বহুস্তরান্বিত অভিজ্ঞতা কবিতায় রূপ পায়, যদি ঐ তত্ত্ববিশ্ব, উপযুক্ত আত্মসচেতনতা থাকে। কিন্তু এই কবি নীরার অসুখ, হাসি, অশ্রু, অপমানে যে ভাবে বিচলিত হন, ছেলেমানুষী করেন, তাতে বোঝা যায় ধান কবিতাটির কাব্য অভিজ্ঞতার চাপ থেকে তিনি মুক্তি পেতে চান ব্যক্তিগত খুচরো সুখ-দুঃখের খামখেয়ালে, নৈরাজ্যে। যে প্রেমের যন্ত্রণার আকাশে জীবন পতাকা ওড়ে তা থাকে না অসুস্থ এই পলায়নে—প্রেমকে, নারীকে জীবন সংলগ্ন করেও এ কবিরা দেখতে পারেন না; নারীর শরীরের তীব্র বর্ণনাও কেমন নৈর্ব্যক্তিক তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তার প্রমাণ তো অনেক আছেই, যেমন নেরুদার ‘বডি অব এ উওম্যান,’ যেখানে কবি বলেন, my rough peasant’s body digs in you/and makes the son leap from the depth of the earth. কৃষকের মাটি চাষের চিত্রকল্পে সমগ্র সম্পর্কটিই অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। প্রেমও যে সম্পর্কের, সংযোগের, উল্লাস-যন্ত্রণার সেতু—প্রেমের তৃপ্তি অতৃপ্তি একই দীক্ষা, যেমন জানত চণ্ডীদাস বা দান্তে—এ সব কথা নীরার কবিরা আমলে আনতে চান না। মধ্যবিত্ত কানাগলিতে, শ্রেণীর প্রায় চরিত্রহীন পরিণতিতে প্রেমও হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিগত ছেলেমানুষী, দায়িত্বহীন খেলা, সাবান উপহারের মতই ঘটনা [নীরা, তোমায় একটি রঙিন সাবান উপহার দিয়েছি শেষ বারে]। বলাই বাহুল্য, এঁরাই প্রভাবশালী হন, মধ্যবিত্ত ইতিহাসের, ক্লান্ত কর্দমাক্ত অস্তিত্বে, যেমন জীবনানন্দের হতাশা, ক্লান্তি, নির্জনতা, বিপন্নতা, মধ্যবিত্ত পাঠক তার শূণ্যতায় লুফে নিয়েছিল, ঐ তাৎপর্যপুর্ণ কবির দ্বান্দ্বিক টেনশন ছাড়াই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্‌ভ্রান্তিতেই অগ্নিকোণের পদাতিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বাণিজ্য-সাহিত্য পত্রিকায় পদ্য লেখেন, আগের সেই সীমাবদ্ধ কিন্তু উল্লেখযোগ্য কাব্যদক্ষতাও আর থাকে না।*

অপরদিকে, যে সব কবি ব্যক্তিগত সীমায় কবিতাকে বাঁধতে চান না, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবাদ-বিদ্রোহকেই কবিতার বিষয় করতে চান, কবিতাকে সামাজিক কর্ম হিসাবেই দেখেন, অর্থাৎ উপরিউক্ত কবির বিপরীতে যাঁদের অবস্থান তাঁদের সংকট ঘনায় অন্যভাবে। মধ্যবিত্ত অস্থিরতা, ইতিহাসের বিভ্রান্তির উত্তরাধিকার তাঁরাও কাটাতে পারেন না। জীবনের অভিজ্ঞতার ত.কে য শিল্পের অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করতে হয়, এ কথা তাঁদের কাছে অবাস্তব, বোধহয় বিপ্লব-বিরোধীও। এও কিন্তু মধ্যবিত্ত ভগ্ন ইতিহাসের একপেশেমি। যে দ্বান্দ্বিকতত্ত্বে জীবন ও শিল্প উভয় উভয়ের কাছে লীন হবার কথা, জীবনের বিষয়ই শিল্পের কনটেন্ট হবার কথা, কবিতার গঠনে আয়রনি-প্যারাডক্স চিত্রকল্প-প্রতীকে গলিত ইস্পাতের মত কাবের প্রবাহিত হবার কথা, তা এঁদের কবিতায় দুর্নীরিক্ষ্য। শিল্পের ইতিহাস, তার বিশেষ সমস্যা ও সমাধান আমলই পায় না এঁদের রচনায়, অথচ কবিতাই লিখতে চান এঁরা। ফলে জীবনের প্রতি তাঁদের আবেগ, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ পরিবেশ সচেতনতা বর্ণহীন একমাত্রিক হয়ে পড়ে—জীবনলগ্ন প্রত্যয় কবিতায় যান্ত্রিক উচ্চারণে পরিণত হয়।

মানুষ, ঘৃণা করো এই শাদা ভাল্লুকদের
তোমার বুকের সমুদ্র-বিশাল ঢেউ ভাঙতে যারা
দেগেছে চক্রান্তের কামান
ঘৃণা করো লাল তারা বুকে লাগানো এই বুড়ো বেশ্যাদের
ঘৃণা করো মানুষের বিদ্রোহের আকাশে উড়ন্ত লোলুপদৃষ্টির এই শকুনদের।

(অনীক, জুন-জুলাই ১৯৭৪)

* কবিতা ফিল্মের মত গণমাধ্যমের বিপরীত আধুনিক যুগে। তাই কবিতা ও ফিল্মের আলোচনায় দুই মেরুই স্পর্শ করা যায়। গল্প বা উপন্যাসের মত শিল্পকর্মের বিচারেও একই জিনিস দেখব। নাটক বাংলাদেশে নাট্য প্রযোজনা পাঠ্য নাটক নয়।

সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীরা নিপাত যাক্,
ঘোষণা করি : সমাজতন্ত্রের দুর্গ মহাচীন আমাদের বন্ধু,
ঘোষণা করি : বিশ্বব্যাপী লড়াই-এর প্রত্যেক স্বদেশে আমরা অভিন্ন
·· সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্, নিপাত যাক্, নিপাত যাক্।

(ঐ)

এই দুটি উদ্ধৃতিতে ঘৃণা আছে, ঘোষণা আছে, ক্রোধ আছে : এসব উপাদান দিয়েই ভাল কবিতা নিশ্চয়ই হতে পারে। কিন্তু এখানে হয়নি।*

সমগ্র অ্যাটিটিউডটাই হয়ে গেছে ব্যক্তিগত ক্রোধের মত, ঘোষণাটা হয়ে গেছে উত্তেজিত বক্তৃতার মত, কবিরা যতটা ক্রোধকম্পিত, উত্তেজিত ততটাই কবিতার মূল উপাদান যে শব্দ ও ধ্বনি সে সম্পর্কে উদাসীন। দ্বান্দ্বিকতত্ত্বের সুবিধা, তার টেনশন, বিরোধ-সমন্বয়ের পট, কিছুই এই কবিতা দুটিতে নেই : একজন ব্যক্তি আর একজনের ওপর রেগে গেলে যেমন কটুকাটব্য করে, এও সেই রকম। সমাজ-মনস্কতা, জীবনের প্রত্যয় সবই ক্রুদ্ধ ব্যক্তিগত অভিশাপের মত এখানে বাজছে। নীরার কবিদের মতই বিপরীত ভাবে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বদলে ব্যক্তিগত ক্রোধ ঘৃণাকে এখানে আমরা পাই অথচ এই উত্তেজনা, মধ্যবিত্ত চীৎকার ভিনদেশী বিপ্লবীদের কবিতায় দেখি না। তাঁদের কবিতায় সেই নৈর্ব্যক্তিকতা থাকে, যাতে ব্যক্তিগত অনুভূতি সর্বজনীন হয়ে ওঠে। "বৈপ্লবিক" ক্রোধ বা ঘৃণার মধ্যবিত্ত উত্তেজনা সেখানে অনুপস্থিত।

"মেঘেরা জড়ায় গিরিচূড়াদের, গিরিচূড়া বাঁধে মেঘেদের
নিচে ঐ নদী আয়নার মতো ঝিকিমিকি জলে স্বচ্ছ।
পশ্চিমগিরিমৌলিতে ঘুরি, হৃদয় আমার চঞ্চল,
দক্ষিণাকাশে তাকিয়ে স্বপ্নে দেখি পুরাতন মিতাদের।"

(বিষ্ণু দে-র অনুবাদ)

* অনুষ্টুপ, অনীক বা প্রস্তুতির মত পত্রিকায় যে সব কবিতা প্রকাশিত হয় তা সবই উপরিউক্ত কবিতা দুটির মত অত স্থূল নয়। অন্যত্রও পত্রিকায় বা গ্রন্থাকারে এর থেকে পরিণত প্রগতিপন্থী কবিতা দেখা যায়। দুটি চরম উদাহরণই বাছা হয়েছে : অন্যগুলো প্রায় ক্ষেত্রে এরই মৃদু সংস্করণ।

কিংবা

Red, orange, yellow
green, blue; indigo, violet—
Who is dancing in the sky
Whirling this ribbon of colour ?

After the rain
the sun has returned to set,
And the pass the lines of hills
are blue.

A desperate battle
raged here once,
Bullet-holes
pit the walls of the village,
They are an embellishment
And to-day the hills
seem yet more fair.

(মাইকেল বুলক ও জেরোম চেনের অনুবাদ)

প্রথম কবিতাটির মিতা শব্দটিতেই বিপ্লবীদের সঙ্গে একাত্মবোধ স্পষ্ট হয়েছে। সমাজতন্ত্রের দুর্গ মহাচীন আমাদের বন্ধুর মত বক্তৃতা এখানে করতে হয় না। পশ্চিমগিরিমৌলিতে ঘোরা ও হৃদয় চঞ্চলের উল্লেখে বিপ্লবী টেনশন চমৎকার এসেছে প্রথম দুলাইনের প্রকৃতির আবেগে—প্রথম ছত্রেই দক্ষিণ ও উত্তরের মিলনের পট প্রস্তুত হয়েছে। দ্বিতীয় কবিতাটির প্রথম স্তবকের বৃষ্টিক্ষান্ত বিকেলের সপ্তরঙের শান্ত সৌন্দর্য—আকাশে কে নাচছে, আলোর ফিতে ঘোরাচ্ছে। এই প্রশ্নেই ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারির চতুর্থ ঘিরে ফেলার পরের অবস্থা ইঙ্গিতে ধরা পড়ে। তারপরের দ্বিতীয় স্তবক ও তার শেষ দুটি ছত্রের মানবিক অনুভূতি চমৎকার নতুন আবেগে বাঁধা পড়ে, লড়াইয়ের স্মৃতিতে। দুকবিই প্রকৃতির আবেগে মানুষের লড়াইকে বাঁধেন, বিশাল ল্যাণ্ডস্কেপের পটে কবিতাকে স্থাপন করেন। দ্বিতীয় কবির অমসৃন লৌকিক প্রকাশভঙ্গীর প্রত্যক্ষতায় তাঁর দেশের কবিতার ধ্রুপদী ঐতিহ্য ও লোক ইতিহাস অন্বিত হয়, দেশজ ইতিহাসের বোধে সমৃদ্ধ তাঁর কবিতা তাই ব্যক্তিগত জীবনের তত্ত্বকে, বিশ্বদর্শনকে আত্মস্থ করতে পারে কবিতা ও

জীবনের আবেগে। বাংলা ভাষায় এ কবিরও প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক বিষ্ণু দে।

বলাই বাহুল্য, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ও তার বর্তমান শূণ্যতা এ সময়ের বাংলা শিল্পসাহিত্যের সংকট নিয়ন্ত্রিত করলেও, এই ইতিহাসের উল্লেখেই সবকিছুর ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বান্দ্বিক উত্তরণে এই ইতিহাসের উদ্‌ভ্রান্তি বিশ্ববীক্ষাহীনতা ভেঙ্গে যেতে পারে নব নব শিল্প প্রচেষ্টায়। ব্যক্তির আত্মসচেতনায় কাটতে পারে মধ্যবিত্ত অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, —জন্মাতে পারে যথার্থ বিশ্বদর্শনের আলোকে, তত্ত্ববিশ্বের পটে, ব্যক্তি ও ইতিহাস-সমাজের বিরোধ-সমন্বয়ের আঁতিতে যথার্থ উজ্জিবনী কবিতা, গল্প, নাটক, বা সব মিলিয়ে ফিল্ম। তার আভাষও কোন কোন জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। জীবন ও শিল্পের দুই শিং ধরে কারুর কারুর যে সংগ্রাম আপাতত অঙ্কুরিত হচ্ছে, তাই মহীরুহ হোক, এই আমাদের প্রার্থনা। জ্যেষ্ঠ কবি কবিতা সম্পর্কে যে আশা করেন, সকল শিল্প সম্পর্কেই সেই আশা করি আমরাও।

কবিতা কি শুধু ছাপার হরফে মেলে ?
কবিতার আদিরূপ কবিতার বাহিরে—
জীবনই কবিতা, রুদ্র সে অবহেলে
মৃত্যুকে মারে জঙ্গল গ্রাম শহরে।

এই কবিতাই আসবে হয়তো হরফে
লেখায় ছাপায় জীবনের মুখে কবিতা,
সেইদিন পাব মিশ্র আগুনে বরফে
নতুন দিনের মল্লার ভেজা সবিতা।

(বিষ্ণু দে)

প্রাগবৈদিক ও বৈদিক সংগীত : সংঘাত ও সংশ্লেষ

হীরেন্দ্র চক্রবর্তী

ভারতীয় সঙ্গীতের সুসম্পূর্ণ ইতিহাস অদ্যাবধি রচিত হয়নি। যে কতগুলি বই বিগত শত বৎসরের মধ্যে বেরিয়েছে তার মধ্যে অনেক কিছু আছে; নেই কেবল কোন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। যারাই ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস লেখেন তারাই আরম্ভ করেন আর্য সঙ্গীত অর্থাৎ ঋক-সাম বেদের সংগীত থেকে যেন আর্যদের আগে যারা এদেশে থাকত বা এসেছিল তাদের কোন সঙ্গীত ছিল না। অবশ্য একথাটা যদি সত্যি হত তাহলে ইতিহাস লেখকের কোন সমস্যা থাকত না; তিনি অনায়াসে ঘোষণা করে দিয়ে কর্তব্য শেষ করতে পারতেন যে, সামবেদ থেকেই আমাদের যাবতীয় সংগীতের উদ্ভব। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রায় সকল লেখকই এই ভাবে তাদের কর্তব্য শেষ করেছেন।

ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ভরতের নাট্যশাস্ত্র। কিন্তু নাট্যশাস্ত্র একান্তভাবে সংগীতের বই নয়—ওটা নাট্যশাস্ত্রের বই, সংগীত তাতে এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। ভরতের সিদ্ধান্তগুলি একান্তভাবে তার নিজস্ব নয়। পূর্ববর্তী ব্রহ্মাভরত এবং সদাশিব ভরত নামে দুই জন সংগীত শাস্ত্রীর অধুনালুপ্ত দুইটি সংগীত গ্রন্থ থেকে তিনি তার পদ্ধতিটি আহরণ করে নিজের বইয়ে উদ্ধৃত করেছেন। অতএব নাট্যশাস্ত্রে তৎকালীন সংগীতের ইতিহাস আশা করা হয়তো সমীচীন নয়। কিন্তু ভরতের পরে সংগীতগ্রন্থ যারা রচনা করছেন তারাও কেউ এদিক মাড়াননি। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে লিখিত মতঙ্গ মুনির 'বৃহদ্দেশী' সংস্কৃতে লিখিত সংগীতগ্রন্থের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে তৎকালীন শাস্ত্রীয় সংগীতের পরিচয় আছে, ভারতীয় জাতিগানের বিলুপ্তির সংবাদ আছে কিন্তু পূর্ববর্তী কালের সংগীতের ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা নেই। অবশ্য প্রাচীন ভারতীয়রা গ্রীক বা রোমানদের মত ইতিহাস সচেতন ছিল না।

ইতিহাসের বদলে তারা বরং কিংবদন্তী মিশ্রিত পুরাণ পছন্দ করত। বেদোত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষেরা কী ধরণের সংগীত অনুশীলন এবং উপভোগ করত তার কোনো নির্ভরযোগ্য খবর বৈদিক প্রাতিশাখ্য, নারদী শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে পঞ্চদশ শতকের লোচন পণ্ডিতের 'রাগতরঙ্গিণী' পর্যন্ত কুত্রাপি পাওয়া যায় না। সকলেই সমকালীন অভিজাত সংগীতের পরিচয় দিয়ে স্বকর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। ভারতের অসংখ্য প্রদেশে যে অসংখ্যভাষাভাষী সভ্য, অর্ধসভ্য এবং অসভ্য মানুষ বাস করত তাদের সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থকারদের কোন কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা অতএব শ্রদ্ধা ছিল না। অতএব তাদের গ্রন্থে অভিজাত আর্যসমাজে প্রচলিত সংগীত ছাড়া আর কিছুর পরিচয় নেই। এই সব লেখকদের তখন যারা পোষণ করতেন সেই সব রাজশ্রেণী বা অভিজাত শ্রেণীর উন্নাসিকতা এর আংশিক কারণ হতে পারে, তবে লেখকদের সাহস বা কর্তব্যবোধের অভাবও কম ধর্তব্য নয়। কেননা, একই রাজশক্তির আওতায় রচিত কালিদাসের নাটকে প্রাকৃত জনের সমাদৃত গানগুলি আমরা পেয়েছি। স্বরলিপির অভাবে সুরগুলি পাওয়া যায়নি কিন্তু নৃত্য সম্পর্কে যে সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে মালবিকা বা উর্বশী কী ধরনের নাচ নেচেছিলেন তা হয়তো একদিন খুঁজে বের করা যাবে।

এর মধ্যে মতঙ্গ মুনিকে তবু ধন্যবাদ দিতে হয় যে, তিনি প্রথমে অন্যান্য অনার্য জাতিগুলির অনগ্রসর সংগীত সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, অগ্রসর জাতি এবং তাদের ভাষা থেকে কী কী সংগীত আর্যদের সংগীতবিজ্ঞানে গৃহীত হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন এবং বেদোত্তর যে গান্ধর্ব গানকে ভরত তার জাতিগানের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, নানা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ভৌগলিক কারণে তা যে সম্ভব নয়, তা মতঙ্গ তার বৃহদ্দেশীতে আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বিগত শত বৎসরের মধ্যে যে সব বিদেশীরা ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে কিতাব লিখেছেন যেমন স্যর উইলিয়ম জোন্স্, স্যর হেনরি উইলসন, অগষ্টস উই লর্ড প্রভৃতি তারা প্রথমত এবং প্রধানত দৃষ্টিপাত করেছেন ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিনী তত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং শুদ্ধ ঠাট নির্ধারণের দিকে। সংগীতের ইতিহাস তারা লিখতে পারেন নি কারণ ইতিহাসের উপকরণ অনেক করেও তারা খুঁজে পাননি। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস কোনদিন ছিল না।

আজও যে আছে তা নয়। যেমন প্রাগ্‌বৈদিক যুগে ভারতের সংগীত কেমন ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। বৈদিক এবং বেদোত্তর সাহিত্যে বা পুরাণে আর্য জাতিগুলির আত্মকলহের বিবরণ সবিস্তারে আছে, পোষ্টা

রাজাদের দানধ্যানের প্রশস্তি আছে কিন্তু দেশের বা মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ নেই। বিগত শতকের লেখক বা যারা প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালে গ্রন্থ লিখেছেন, তাদের অজ্ঞতাকে তবু উপেক্ষা করা যায় কিন্তু যারা সিন্ধুসভ্যতার বিবরণ প্রকাশের পর গ্রন্থ লিখেছেন তাদের অজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা কঠিন।

আজকাল অনেক স্কুল-কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস পড়ান হয়। যারা পড়ান তাদের লেখা কিতাব পড়লে তাদের প্রশান্ত অজ্ঞতা দেখে হতবাক হতে হয়। সকলেই এককথা বলে দিয়েছেন সামবেদ থেকেই ভারতীয় সংগীতের উদ্ভব। বৈদিক আর্যদের আগে সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান এবং গুজরাতে যে উন্নত সভ্যতা বিকাশলাভ করেছিল, যার পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ অদ্যাপি নীরব সাক্ষীর মত দণ্ডায়মান, তাদের কথা এই সব গ্রন্থকারেরা ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নি। এ ছাড়া এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে যে সব আর্যেতর জাতি (race) উপজাতি (কোম বা tribe) বা আদিম গোষ্ঠী (aborigine) বাস করে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে, তাদের সংগীত বা সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন স্বীকৃতি এই সব তথাকথিত সংগীতেতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ ঐতিহাসিক যুগে এই সব সংগীত ভারতীয় সংগীতকে, এমন কি বৈদিক সংগীতকে পর্যন্ত, কতখানি প্রভাবিত এবং পরে সমৃদ্ধ করেছে তা হয়তো এরা ধারণাও করতে পারেন না।

সিন্ধু উপত্যকার মহেন্-জো দারো থেকে পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং বেলুচিস্তানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার প্রমাণস্বরূপ যে পুরীগুলির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শিক্ষিত সমাজে অবিদিত নেই। পুরাতাত্ত্বিক ভাষায় এর স্তর বিভাগ করা হয়েছে আদি ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা নামে। সম্প্রতি গুজরাটেও এ ধরণের একটি ভূগর্ভস্থ পুরী আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্বে একে বলা হত সিন্ধু উপত্যকা বা হরপ্পা সভ্যতা। এখন এর নূতন নামকরণ প্রয়োজন। পণ্ডিতদের কারো কারো ধারণা এই সভ্যতা ভারতের সমুদ্রোপকূল ধরে গাঙ্গেয় বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সম্প্রতি ২৪-পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং বীরভূমে যে সব পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ খণিত হয়েছে তা থেকে এই ধারণা ভিত্তিহীন বলে মনে হয় না।

সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার রচয়িতাদের সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহলে মতভেদ আছে। বেশীর ভাগ লোকের ধারণা এই সভ্যতা দ্রবিড়ভাষীদের ; কারও কারও ধারণা অ্যালপাইন বা প্রাচ্য কোন ইণ্ডিড জাতি এই সভ্যতার শ্রষ্টা। এই বিতর্কে প্রবেশ না করেও এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, যারাই এর শ্রষ্টা হোক, তারা

বৈদিক দেবযানে বিশ্বাসী আর্য নয় একথা নিশ্চিত। কেননা, আর্যরা থাকত অস্থায়ী গ্রামের লতাপাতার ঘরে বা তাঁবুতে, আর সৈন্ধবরা থাকত পোড়া ইটের তৈরি পুরীতে। আর্যরা যজ্ঞ করত এবং মূর্তিহীন বরুণ, ইন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির উপাসনা করত আর সৈন্ধবরা নানা দেবদেবীর মূর্তির এমন কি লিঙ্গযোনির পর্যন্ত পূজা করত। ভারতে প্রবেশকালে আর্যরা ছিল একান্তভাবে পশুপালক এবং সামান্যভাবে কৃষিজীবি, সৈন্ধবরা ছিল একান্তভাবে কৃষি, শিল্প, পশুপালন এবং বানিজ্য নির্ভর। আর্যদের কোন লিপি ছিল না, তাদের বেদের অপর নাম ছিল শ্রুতি, কেননা, তা শুনে মনে রাখতে হত কিন্তু সৈন্ধবদের লিপি ছিল যদিও এখন পর্যন্ত তার পাঠোদ্ধার করা যায়নি। সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, এই সব প্রতিবেশীদেরই আর্যরা শিশ্নদেবাঃ অর্থাৎ লিঙ্গপূজক, অনৃতদেবাঃ অর্থাৎ তুচ্ছ দেবতার পুজক ইত্যাদি বলে নিন্দা করত। সৈন্ধব নাগরিকেরা মাতৃতন্ত্রের এবং মহিষমর্দিনী দুর্গার পূজারী ছিল। শহরের মধ্যে দুর্গে বাস করতেন রাজা। দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা হত মন্দিরে। দুর্গা নামটি দুর্গ থেকেই এসেছিল। পশুপতি শিব ছিলেন পশুপালন এবং কৃষির দেবতা। বোধ হয় সংগীতেরও। মহিষ যাদের কুলপ্রতীক (totem) এমন জাতিদের পরাজিত করে হরপ্পীয়রা রাজ্য স্থাপন করেছিল, যেমন অনার্য বা আর্যেতর জাতির পুর ধ্বংস করতে সাহায্য করত বলেই বৈদিকদের দেবরাজের অপর নাম বা উপাধি হয়েছিল পুরন্ধ্র বা পুরন্দর। হরপ্পীয়দের নাক আর্যদের মত উঁচু এবং লম্বা ছিল না বলে বৈদিকরা তাদের উপহাস করত 'অনাস' অর্থাৎ নাসিকাহীন বলে। বৈদিক আর্যদের আবৃত্তির যে গ্রাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় তারা মোটা বা ভারী গলায় কথা বলত এবং তাদের প্রতিবেশীদের কণ্ঠস্বরকে 'ক্রুষ্ট' বা ক্যান্‌কেনে বলে উপহাস করত। ঋগ্বেদে আর্যরা অনার্য প্রতিবেশীদের আর একটা নাম দিয়েছিল মৃধ্রবাচঃ যার সঠিক অর্থ নিয়ে গোলমাল দেখা যায়। কেউ বলেছেন কথাটার মানে হল মিথ্যাবাদী। কিন্তু মিথ্যা অর্থে ঋগ্বেদে অনৃত শব্দের প্রয়োগই স্বাভাবিক যেমন অনৃতদেবাঃ অর্থাৎ মিথ্যা দেবপূজক। মৃধ্রবাচঃ বলতে চড়া বা নাকী সুরে কথা বলার কথাই বোঝাচ্ছে। গানের ব্যাপারেও আর্যরা যে হরপ্পীয়দের এই বলে ঠাট্টা করত তা যথাপ্রসঙ্গে দেখান যাবে।

এই প্রতিতুলনার হেতু এই যে কোন কোন আর্য ও বেদবাদী মহল থেকে দাবী করা হয়েছে যে, হরপ্পীয় সভ্যতা আসলে আর একটি বৈদিক সভ্যতা এবং তা বেদের

কাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলে এসেছে। বৈদিক এবং হরপ্পীয় ধর্মের তৌল আলোচনা করলেই বোঝা যাবে এই দাবী কত অসার।

ভারতে আসার পূর্বে বৈদিক আর্যরা কিছুকাল পারস্যে বাস করেছিল বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান। তা যদি বা নাও হয় ধর্মমতের দিক থেকে পার্শ্বিক, বৈদিক গ্রীক ও রোমক আর্যদের মধ্যে প্রাথমিক মিল দেখা যায়। আদিতে সকলে আকাশ বা দ্যৌস্-কে আদিদেবতা মনে করে নাম দিয়েছিল বরুণ। পার্শ্বীরা বলত উরুবন। একেই আবার বলা হত অসুর অর্থাৎ আগেকার মূর্তিরূপী দেবতা নয়। এরপরে বৈদিকেরা যখন সূর্যকে বরুণের মিত্র কল্পনা করে তাকে ইন্দ্ররূপী দেবেন্দ্র বানিয়ে তুললেন তখনি সুরু হল পার্শ্বিকদের সঙ্গে বিভেদ। তারা অভিযোগ করলেন যে, বৈদিকরা পিতৃযান পরিত্যাগ করে দেবযান আশ্রয় করছেন; শীঘ্রই তারা একেশ্বরবাদ পরিত্যাগ করে বহু দেবতার ভক্ত হবেন এবং যশ্ন অর্থাৎ যজ্ঞ পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজক হবেন। জেন্দ আবেস্তায় জরথুষ্ট্র এই কথা বলেছেন। প্রতিকার হিসেবে তিনি পুরাতন বরুণ অর্থাৎ অহুর মহাদেব বা অহুর মজদার নিরাকার আরাধনায় ফিরে যেতে বলেছেন। বৈদিক গাথার মত পার্শ্বীদের ও গাথা আছে তার নাম পৃশ্নি গাথা; বৈদিক আঙ্গিরস সংহিতার মত পার্শ্বীদের সংহিতার নাম ভার্গব সংহিতা। এই আঙ্গিরস বংশীয় ব্রাহ্মণেরাই বৈদিক পিতৃযানকে পরিত্যাগ করে তেত্রিশ কোটি দেবতার জনম দিয়ে অনার্য দেবতাদের শুদ্ধি করে। হিন্দু দেবদেবীর পথ করে দিয়ে গেছেন দুর্গা থেকে শ্রীতলা—ওলা বিবি পর্যন্ত। পার্শ্বীরা বর্ণাশ্রমেরও বিরোধী ছিলেন। এদিক থেকে ভার্গব পরশুরাম এবং বিশ্বামিত্রের উপকথার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। পরশুরাম মাতৃতন্ত্র অর্থাৎ mother cult গ্রহণের বিরোধী ছিলেন যে কারণে তাকে মাতৃহন্তা বলে চিত্রিত করে শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্রের হাতে হতমান করা হয়েছে।

দৈবিক আর্য এবং অদৈবিক অনার্য ধর্মের সমন্বয়ে আধুনিক হিন্দু ধর্ম। এর ফলে ভাল মন্দ দুইই হয়েছে। তবে তাতে আপাতত আমাদের প্রয়োজন নেই। আর্যদের পক্ষে কেন হরপ্পা সভ্যতার জনক হওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে কিছু যুক্তি দিতে গিয়ে এত কথা বলতে হল। হরপ্পাতে যে কুমারী পুতুল পাওয়া গেছে তা ভারতবর্ষের সমস্ত স্বল্পার্য অঞ্চলে পাওয়া যায়। নর্ডিক আর্যরা যে বাইরে থেকে পশ্চিম-উত্তরা পথে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন তার জাতিগত প্রমাণ এই

যে; বারানসীর পূর্বের অধিবাসীদের মধ্যে আর্য প্রভাব কমতে কমতে অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গ এবং আসামে তা নেই বললেই চলে।

মহেন্-জো-দারো, হরপ্পা, চান্হু দারো এবং গুজরাট অঞ্চলে সংগীতের যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে তার মধ্যে বীণা, বেণু, বাঁশী, শিঙ্গা, মন্দিরা এবং বিভিন্ন তাল-বাদ্য উল্লেখযোগ্য। বীণাগুলির চেহারা একটু আদিম বলে কেউ কেউ সেই যুগের সংগীত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তারা একটা তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য বিস্মৃত হয়েছেন যে, মহেন্-জো-দারোতে যে বাঁশী পাওয়া গেছে তাতে সাতটি ছিদ্র আছে। সাতটি স্বর বাজাবার জন্যই যে সাতটি ছিদ্র করা হয়েছিল তাতে সন্দেহ করার কারণ থাকে না। কিন্তু সকলেই জানেন যে, বৈদিক সংগীতের আরম্ভ হয়েছিল একস্বরে। গাথাযুগে স্বরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল দুইয়ে; সামের যুগে স্বরের সংখ্যা হল তিন—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। এক স্বরের ঋক্ গানের নাম আর্চিক, দুই স্বরের গাথার নাম গাথিক এবং তিন স্বরের বেদগানের নাম সামিক। অথচ ডঃ ভিক্টর গর্ডন চাইল্ড তার What happened in History বইয়ে দেখিয়েছেন যে, খ্রীঃপূঃ চার হাজার থেকে তিন হাজারের মধ্যে মিশর, ব্যাবিলন এবং সিন্ধু উপত্যকার সংগীতে সাত স্বরের আবির্ভাব ঘটেছিল। কেবল গ্রীস, রোম এবং পারশ্য ভরতের আর্যদের সংগীতে সাত স্বরের অভাব দেখা যায়।

আর্য জাতিগুলির যাযাবর সমাজব্যবস্থা কৃষি ও শিল্পের চেয়ে পশুপালনের উপরে অত্যধিক নির্ভরতাই যে এর জন্য দায়ী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতীয় আর্য নেতাদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র এবং হলধর বলরামই বোধ হয় স্বজাতিকে অধিকতর কৃষিনির্ভর করতে চেয়েছিলেন। সীতা সম্পর্কিত উপকথা এবং বলরামের হলধর উপাধি এই রকম আভাস দেয়।

ভারতের অরণ্য এবং পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী যে সব আদিম জাতি এবং উপজাতিগুলি হাজার হাজার বছর ধরে প্রত্ন ও নব্য প্রস্তর যুগের সমাজ ব্যবস্থায় বাস করে আসছে তাদের সংগীত ও আর্চিক সংগীতের মত একস্বারিক নয়। ভারতীয় আদিম অধিবাসীগুলির মধ্যে সবচেয়ে অনুন্নত অবস্থায় আছে আন্দামানের মানুষেরা যাদের নব্য প্রস্তর যুগের এদিকে স্থান দেওয়া যায় না। তাদের সংগীতও এতদিনে পাঁচস্বরে পৌঁছে গেছে। অবশ্য এর পেছনে অপর সংস্কৃতির প্রভাব থাকতে পারে কারণ ওরা এখন সভ্য

সমাজের সঙ্গে মিশছে এবং কিছু চাষবাসও করছে। আন্দামানীদের মধ্যে দ্বিস্বারিক এবং ত্রিস্বারিক গানও পেয়েছেন নৃত্বাত্বিক গবেষকরা।

নাগাভূমির আবর জাতির গানে তিনটি স্বর পাওয়া গেছে। উড়িষ্যার জুয়াংদের চাঙ্গু-গীতে মোটামুটি চারটি স্বর দেখা যায়। দ্রাবিড়ভাষী গড়বাদের গানে চার স্বরের আভাস পাওয়া যায়। আবার মধ্যপ্রদেশের কোরকুদের মধ্যে পাওয়া যায় মন্দ্র সপ্তকের এক স্বর এবং মধ্য সপ্তকের প্রথম তিন স্বর—অনেকটা ভূপালীর মত। আরবদের সম্মেলক গানে পাঁচ স্বরের ঠাটও দেখা যায় তবে সবগুলো স্বর একই গানে ব্যবহার নাও হতে পারে। আর দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এই পশ্চাৎপদ অনুন্নত জাতিদের তুলনায় বৈদিক সংগীতের দীনতা দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

পৃথিবীর শিল্পবিশেষজ্ঞেরা মহেন্-জো-দারোর নর্তকী মূর্তির সজীবতা, সৌকুমার্য এবং গতিশীলতা দেখে আশ্চর্য হয়েছেন। ডঃ গর্ডন চাইল্ড বলেছেন যে, এমন শিল্পময় স্বাভাবিক লাবণ্য এবং গতিচাঞ্চল্য গ্রীসের ক্লাসিকাল যুগের আগে পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায়নি। এই নর্তকীর প্রসঙ্গেই আমরা হরপ্পার সঙ্গীতের একটি আনুমানিক ছবি এঁকে নিতে পারি। নর্তকীর নাচের জন্য ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই কয়েক জন সহকারী গাইয়ে-বাজিয়ের দরকার—যেমন একজন বা ততোধিক তালবাদক, এক বা ততোধিক বীণাজাতীয় যন্ত্র, এক বা ততোধিক গায়ক গায়িকা কারণ যখনকার মূর্তি তখন পর্যন্ত বিশুদ্ধ নৃত্য বিকাশ লাভ না করারই কথা। এর সংগে বংশী, বেণু, শিঙ্গা বা শানাই-জাতীয় কিছু। তালবাদ্য হিসাবে খুব সম্ভব পাখবাজ বাজত কারণ বাজনাটি ঐ অঞ্চলের এবং নামটার সঙ্গে গান্ধার দেশের গন্ধ আছে। কারণ ঋগ্বেদে পখ্‌থ বা পখ্‌থন কথা দুটি আছে। পখ্‌থ-বাদ্য থেকে পখবাজ বা পাখোয়াজ খুব ধ্বনিসম্মত। অন্তত পুষ্করের চেয়ে যে কাছাকাছি তা হলফ করে বলা যায়। হরপ্পার বাঁশীতে যেহেতু সাতটি ছিদ্র আছে সেই হেতু তখনকার গানও যে সাত স্বরেই রচিত হবে তা তো বলাই বাহুল্য। অতএব দেখা যাচ্ছে হরপ্পীয়রা যখন সাত স্বরে বীণা এবং তালবাদ্য ও গীত সহযোগে নৃত্য করছে এবং তা উপভোগ করছে তখন ঋগ্বেদের গান এক স্বরে 'লীলায়িত' হচ্ছে। পরিস্থিতিটা কট্টর বেদবাদীদের পক্ষে যে একটু অস্বস্তিকর তা বলাই বাহুল্য।

আর একটি অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ হল বীণাযন্ত্রটি। ঋগ্বেদে বীণার নাম নেই। পরবর্তীকালে কর্করী, বাণ ইত্যাদি বীণার নাম পাওয়া যায়। সংস্কৃত ব্যাখ্যা-কারেরা বীণার প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ধারণ করতে হাস্যকর প্রয়াস করেছেন যথা 'বন্'

শব্দ করে এই জন্য বন ধাতু গত্যর্থে ঘঙ ইতি বীণা হ্রস্ব আকারের ঈ এবং ন এর ণ আদেশ পাণিনির নিয়মেই অসম্ভব, সেইজন্য বলা হল নিপাতনে সিদ্ধ। আসলে বাণ এবং বীণা দুটি শব্দই দ্রবিড় গোষ্ঠীর। সেইজন্য পাণিনি এবং সায়নাচার্যকে এইরকম গলদঘর্ম হতে হয়েছে।

আর্যরা, বিশেষত নর্ডিক আর্যরা, কৌম একতা, সেনাশৃঙ্খলা, উন্নত ধরনের মারণাস্ত্র (খুব সম্ভবত লৌহ নির্মিত) উন্নত ভাষা, একেশ্বরবাদী ধর্ম, বলিষ্ঠ দেহ, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি অনেক বিষয়েই বলীয়ান ছিলেন; অশ্ব, রথ প্রভৃতির জন্য তাদের গতি এবং আক্রমণবেগও ছিল যেমন প্রচণ্ড তেমনি দুর্নিবার। কোন সুসভ্য জাতিই তাদের ধ্বংসকারিতা থেকে রক্ষা পায়নি—গ্রীস, রোম পারশ্য, ভারত— কেউ না। তবে কোনো চলন্ত সেনাবাহিনীর মধ্যেই সুকুমার শিল্পের বা সভ্যতার অন্যান্য উপকরনের চর্চা হয় না! সেনাবাহিনীর মধ্যে বাদক থাকে। তারা নানা প্রকার দুন্দুভি ও বংশী বাজিয়ে সৈন্যদের উত্তেজিত করে। সব সময় মার্চের উপর যারা থাকে তারা বীণা জাতীয় যন্ত্রের অনুশীলন করতে পারে না। আর্য যোদ্ধারাও সোমরস পান করে যজ্ঞবেদী ঘিরে নৃত্য করত কিন্তু তার সঙ্গে হরপ্পার কৃষি ও নাগর সমাজের শান্তিপূর্ণ নৃত্যের প্রভেদ অনেক। আর্যের সাহিত্যের মতো তার সঙ্গীতও ছিল প্রতিপক্ষকে দস্যু মনে করা, তাকে স্পর্ধা করা এবং যুদ্ধে আহ্বান জানান।

খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ থেকে ১৫০০ সালের কাছাকাছি এই দুই বিরোধী জনগোষ্ঠি, ভাষা এবং সংস্কৃতি পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। সামরিক দ্বৈরথে জয় হয়েছিল তড়িদ্গতি আর্যদের। হরপ্পা অঞ্চলের সম্পন্ন মানুষেরা ক্রমে দক্ষিণে সরে গিয়েছিল, নিরুপায়েরা থেকে গিয়েছিল। এরাই সংখ্যাধিক—চিরকাল যেমন হয় তখনও তেমনি। এদের জীবনচর্যার সঙ্গেই হয়েছে বৈদিক সভ্যতার প্রথম সংঘাত। এই সংঘাতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দুইই দেখা গিয়েছে, ধর্মে, ভাষায়, সাহিত্যে ও শিল্পে। সংগীতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সামিক যুগ পর্যন্ত আর্যদের সংগীতে তিনটি স্বর ছিল উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। কিছুকালের মধ্যেই তারা একটা নতুন স্বর পেলেন এবং তার নাম দিলেন স্বরান্তর অর্থাৎ অন্য স্বর। হয়তো অন্যের কাছ থেকে নেওয়া স্বর। বেদের স্বরগ্রাম ছিল অবরোহী যেমন গা রে সা। এর সঙ্গে স্বরান্তরকে যুক্ত করলে দাঁড়ায় মা গা রে সা। অর্থাৎ অষ্টকের পুর্ব ভাগ সম্পূর্ণ হল। এই ঘটনা ঘটেছিল খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতক নাগাদ।

পরবর্তী ব্রাহ্মণদের বেদগান দেশীয় গানের তুলনায় কত লাবণ্যহীন ছিল, বৌদ্ধদের বিদ্রূপের মধ্যে তার সাক্ষ্য রয়েছে। একজন বৌদ্ধ শ্রমণ বলেছেন, ব্রহ্মণদের বেদগান শুনলে মনে হয় বর্ষাকালে ক্ষেতের আলে বসে এক সারি ব্যাঙ ডেকে চলেছে। উপমাটা যেমন বাস্তবসম্মত তেমনি মারাত্মক। অথচ এরই পাশাপাশি ছিল কোশল অঞ্চলের গ্রাম্য রমণীদের মেঘগীতি যা গৌতম বুদ্ধের কালেও প্রচলিত ছিল। জাতকের একটি গল্পে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মেঘ-গীতির ঐতিহ্য অনুসরণ করেই কালিদাস লিখেছিলেন তার অমর দূতকাব্য—মেঘদূত। বর্ষাকালে মল্লার সুর গাওয়া হত এমন উল্লেখও জাতকে আছে। বলাই বাহুল্য এই প্রাণবন্ত এবং উন্নত সংগীত আর্য সংগীতজ্ঞদের প্রভাবিত না করে পারেনি। একটা সত্য জিনিসকে চিরকাল কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আর্যদের দরবারী সংগীতেই প্রথম এর প্রভাব পড়ল। ধর্মীয় সংগীত আলাদা হয়ে গেল। এই পরিবর্তনের দূত হলেন গন্ধার প্রদেশের অধিবাসী সংগীতনিপুণেরা যারা আর্যদের দ্বারা মিত্র রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। খুব সম্ভব আর্যদের সিন্ধু আক্রমণের সময় এই গন্ধর্বরা আর্যদের সহায়তা করেছিলে। আর্যসাহিত্যে দেখা যায় গন্ধর্বদের গানে আর্য দেবতারা প্রীতি লাভ করেন। রামায়ণ-মহাভারত থেকে কালিদাসের কাল পর্যন্ত এই কিংবদন্তী চলে এসেছে। আমরা যেমন আজকাল পশ্চিমের ওস্তাদদের গান পছন্দ করি এবং তাদেরই গুরু বলে মানি তেমনি ছিল আর্যদের কাছে গন্ধর্বদের মান। হরপ্পার সংগীত থেকে গন্ধর্বদের সংগীত কতটা পৃথক ছিল বলা যায় না কেননা সিন্ধুর পাশে পেশোয়ার থেকে কান্দাহার পর্যন্ত ছিল গন্ধার দেশ। যাই হোক গন্ধর্বদের সাহায্যে আর্যদের সংগীত কলা বিকাশ লাভ করতে লাগল এবং খুব সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক নাগাদ ব্রহ্মাভরত নামক সংগীতবিজ্ঞানী চতুর্থ এবং পঞ্চম স্বরসংবাদের তত্ত্ব বের করে ফেললেন। ওই সময়ে গ্রীসের স্বরগ্রামও ছিল চার স্বরের এবং পাইথাগোরস গ্রীক লায়ারে আরও তিনটি তার সংযোগ করেন। তিনি নাকি পারশ্যের মাধ্যমে এই তত্ত্ব পেয়েছিলেন। এর পরে সদাশিবভরত নামে সংগীত বিজ্ঞানী একটি গ্রন্থ লেখেন। এই দুজনের কারও গ্রন্থ পাওয়া যায়নি তবে খ্রীঃ দ্বিতীয় শতকের ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এদের গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ আছে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ষড়্‌জ, মধ্যম এবং গান্ধার নামে তিনটি গ্রাম পাওয়া যায়। ষড়্‌জ গ্রাম আর্যদের, গান্ধার গ্রাম গন্ধারদের কিন্তু মধ্যম গ্রামটি কাদের? বলাই বাহুল্য মধ্যম গ্রামটি ছিল হরপ্পা অঞ্চলের প্রচলিত ঠাট, মধ্যম সপ্তকের মধ্যম থেকে

তার সপ্তকের মধ্যম পর্যন্ত—খুব চড়া স্কেল, গাইতে গেলে গলা চিরে যেত। এই জন্যেই ঋগ্বেদে ওদের বলেছিল ক্রুষ্ট এবং মৃধ্রবাক্‌। পাঞ্জাবীরা এখনো চিল্লীসুরে কথা বলে যদিও তাদের মধ্যে আর্য রক্ত কম নয়। এই চড়া সুর এবং স্বরস্থানের গলদের জন্যই গ্রামটি বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তার ঠাটটি এখনো বেঁচে রয়েছে এখনকার খাম্বাজ ঠাটের মধ্যে।

হিন্দুমার্গী কিছু কিছু সংগীতেতিহাসকার বেদ-বেদ করে সংগীতের স্বাভাবিক বিকাশ এবং সমন্বয়ের প্রক্রিয়াকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। যেমন মার্গ কথাটার যে ব্যাখ্যা তারা দেন তাও হাস্যকর। মৃগকে যেমন অন্বেষণ করে তেমনি করে ব্রহ্মাভরত ইত্যাদি কর্তৃক অন্বিষ্ট যে সংগীত তার নাম মার্গ; মৃগ + ক্ত = মার্গ। কোন ব্যাকরণের নিয়মে এই পদ সিদ্ধ হয় জানি না, তবু প্রশ্ন থাকে, ভরতেরা কোথায় অন্বেষণ করেছিলেন? কোথায় কী কী পেয়েছিলেন? বলাই বাহুল্য এই দেশেই অন্বেষণ করেছিলেন। এই দেশের প্রাকৃত, পালি, সৌরসেনী, মাগধী অর্ধমাগধী, মহারাষ্ট্রী, বঙ্গালী, কলিঙ্গী, তেলিঙ্গী, লাটী, সৌবীরী, কাম্ভোজী, আন্ধ্রী, গুর্জরী প্রভৃতি ভাষার মধ্যেই তা পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু ভরতেরা এদের স্বীকৃতি দেননি। পরিবর্তে তারা কতকগুলি স্কেলের স্বরগ্রামকে জাতি বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সাধের গান্ধর্ব সংগীতকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গন্ধর্বরা তখন কোথায়? খ্রীঃ ৫ম শতকে তারা ছিল পার্শ্ব সম্রাট ডেরিয়াসের (দ্রহ্যুস্‌?) অধীনে, দ্বিতীয় শতকে শকদের অধীনে, খ্রীঃ দ্বিতীয় শতকে কুষাণদের এবং পঞ্চম শতকে হুনদের অধীনে। মুসলমান আমলের আগে ভারতের সঙ্গে গন্ধর্বদের আর যোগাযোগ ঘটেনি। মুসলমান আমলে সিন্ধু, হরপ্পা এবং গন্ধারের সঙ্গে আবার ভারতের যোগাযোগ ঘটে এবং গ্রেট মোগলদের দরবারে পর্যন্ত তারা গানবাজনা শোনাতে ও শেখাতে এসেছিল কিন্তু তখন মুসলমান বেশ বলে কেউ তাদের চিনতে পারেনি। এখনও চেনে না। সেইজন্য কোন কোন চন্দ্রাহত গবেষক হিমালয়ের বরফ ভেদ করে জীবনশূণ্য অলকায় গন্ধর্বদের সাক্ষাৎ পান।

বৈদিক সংগীত দেশী আর্যেতর সংগীত থেকে আর তিনটি স্বর গ্রহণ করল। সব মিলে সাত স্বরের নাম হল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, ক্রুষ্ট, অতিস্বার্য। এই বারে বৈদিক স্বরের উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এবং স্বরান্তর নাম বদলে গেল। এই চারটি স্বরের বদলে সামগানেব অক্ষরের মাথায় ১, ২, ৩, ৪ লিখে স্বরের নির্দেশ দেওয়া থেকে এদের এই রকম নামান্তর হয়েছিল। লৌকিক ঠাটের

প্রভাবে নতুন তিনটি স্বরও যুক্ত হল। শেষে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ অবরোহী স্বরগ্রামটাই বদলে আরোহী স্বরগ্রাম হয়ে গেল।

স্বরগ্রামের নতুন নামকরণে প্রথম স্বর ষড়্‌জের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাও যুক্তিসহ নয়। ষট্ থেকে যে জাত হয় সে তো সপ্তম। অন্য কারো দেখা নেই, প্রথম জনই যদি বলে আমি ছয়জন থেকে জন্মেছি তাহলে তার দাবি কি ধোপে টেকে? নিষাদ কথাটার মানে কি? যতদূর জানি অষ্ট্রিক জাতি এবং ভাষাকে বেদে-পুরাণে নিষাদ বলা হয়েছে। সে তো আজ আর্য এবং বৈদিক সংগীতে সগৌরবে বিদ্যমান স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর রূপে।

ভারতীয় সংগীতে যে সময়ে ষড়্‌জ মধ্যম এবং ষড়্‌জ-পঞ্চমের নিয়ম আবিষ্কৃত হয় সেই সময় গ্রীসে পাইথাগোরস rule of fourth এবং rule of fifth আবিষ্কার করেন। প্রাগার্য সংগীতের তুলনায় বৈদিক সংগীতের এই আদিমত্ব ঘোচানোর জন্য বেদবাদীরা একটা নতুন কৌশল অবলম্বন করছেন আজকাল। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত কথাগুলি আসলে voice register বা স্বরস্থান যাকে গুপ্তযুগে বলা হত মন্দ্র, মধ্য এবং তার; আজকাল বলা হয় উদারা, মুদারা, তারা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বৈদিক সাহিত্যে বা শিক্ষায় বা পুরাণে কোথাও এমন দাবি কখনো করা হয়নি। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী বা পতঞ্জলির মহাভাষ্যে পর্যন্ত এমন কোনো উল্লেখ নেই। উদাত্ত অনুদাত্তাদি সম্বন্ধে পাণিনি তিনটি স্বরেরই ব্যাখ্যা করেছেন, স্বরস্থানের নয়। সায়নও তাই করেছেন। ভরত, মতঙ্গ, শঙ্করাচার্য, শার্ঙ্গদেব কেউই এমন দাবি করেননি। বস্তুত তিন-চার স্বরে যদি সামিক সংগীতের মানহানি হয়ে থাকে তাহলে এই রকম অবাস্তব ব্যাখ্যায় তা মোটেই রক্ষা পায়নি।

আবার দাবি করা হয়েছে যে, কোনো কোনো সামিক সংগীতে সাত স্বরের দেখা পাওয়া যায়; অতএব সামগানও সাত স্বরে গাওয়া হত। এ তো খুবই স্বাভাবিক কথা। পাশাপাশি যদি একটা সজীব সংগীতপদ্ধতি লোকসমাজে সমান্তরাল ভাবে বিদ্যমান থাকে তাহলে নিয়মাবদ্ধ সংগীত তার দ্বারা সকল কালেই প্রভাবিত হয় যেমন আমাদের যুগে খ্যাল গান ঠুমরীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং হচ্ছে; লোক-সংগীত শহুরে রীতির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। ভরতেরা আট শ বছর ধরে লৌকিক সংগীতকে অস্বীকার করে এসেছেন কিন্তু ৭ম শতাব্দীর পরে মতঙ্গ এসে দেশী অর্থাৎ প্রাকৃত জনের সংগীতকে স্বীকার করেছেন। মতঙ্গ অবশ্য বলেছেন যে,

পাঁচ স্বরের কোনো জাতি বা রাগ হয় না বলে খস্, পুলিন্দ, কালিন্দী ইত্যাদি রাগের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তক্ষশীলা অঞ্চলের টক্ককে তিনি রাগেয় মর্যাদা দিয়েছেন। আবার ৯—১১ শতকে জৈন সংগীতজ্ঞ পার্শ্বদেবের আমলে আমরা দেখি এরাও রাগের মর্যাদা পেয়েছে। মতঙ্গের আমলে এরা চতুঃস্বারিক ছিল। খসের বর্তমান নাম খট্, পুলিন্দ হয়েছে পিলু যাতে ১১টা স্বরই লাগে আর কালিন্দীর বর্তমান নাম কলিঙ্গড়া বা কালেংরা।

রাগ শব্দটির ব্যাখ্যাও অদ্ভুত। মনোরঞ্জন করে বলেই তার নাম রাগ। তাহলে কি বলতে হবে যে-সব গানে পাঁচ স্বরের কম লাগে তাদের মধ্যে রঞ্জক গুণের অভাব আছে? তাহলে কেবল উপজাতীয় সংগীতই বাদ পড়বে না, সমগ্র বৈদিক সংগীতই বাদ যাবে কারণ তাতে স্বরের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন, স্বরান্তর নিয়ে চার।

পাণিনির আমল থেকেই আমরা দেখছি একটা সংশ্লেষ বা সমন্বয়ের চেষ্টা চলছে। আর্যেতর জাতিগুলি বৈদিক ভাষার মধ্যে তাদের জাতীয় শব্দ এবং বাগ্‌বিধি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। পাণিনি এদের প্রকৃতি অনুধাবন করে তাদের নিয়ম-গুলি সূত্রাকারে গ্রথিত করেছেন। ভরত এবং মতঙ্গও একই জিনিস করেছেন। জীবন্ত সংগীত বৈদিক নিষেধ অগ্রাহ্য করে এই ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। ধর্মে ও রাষ্ট্রনীতিতে এই সংশ্লেষ বা সমন্বয়ের প্রক্রিয়া জিন এবং বুদ্ধের আমল থেকেই চলছিল। ঋগ্বেদের আমলে যে সংঘাতের সূত্রপাত গুপ্তযুগের শেষে তা সমন্বয় লাভ করল।

মার্গ, রাগ, তাল ইত্যাদি কথাগুলির যে সংস্কৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে বেশ বোঝা যায় কথাগুলো আর্য ভাষার নয়। ধ্রুব বা ধ্রুবা কথাটাও তাই। ভরত নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ধ্রুবা চার স্বরের গান তবু তিনি তাদের নাট্যগীতি রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। কেন? কারণ লোকে পছন্দ করত। ধুরুবা নামে একটা উপজাতি এখনও মধ্য ভারতে বাস করে এবং ওদের মধ্যে এখনও চার স্বরের গান পাওয়া যায়। ভরত এবং কালিদাস দুজনেই অবন্তীর অধিবাসী ছিলেন বলে মনে হয়।

পাঁচ স্বরের কমে রাগ হয় না এই সংস্কার আর্যদের মধ্যে কবে থেকে এল এবং কোথা থেকে? নিশ্চয়ই লোকসংগীত থেকে এবং লোকসংগীতের মধ্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধ ছিল সিন্ধু-হরপ্পা অঞ্চলের সংগীত। কাজেই ভারতীয় সংগীতের বিকাশের ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতার দানকে স্বীকার না করে উপায় নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ তার প্রান্তীয় ভাষাগুলির বিকাশে আর্যেতর লোকসমাজের দান যেমন

সর্বাগ্রগণ্য, সংগীতের ব্যাপারেও তেমনি। ধর্ম, বেশবাস, খাদ্য ইত্যাদির ব্যাপারে সিন্ধু-হরপ্পা আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে। যতদিন এখানকার মানুষ থাকবে ততদিন তার মৃত্যু নেই। ততদিন সংগীতের অধিষ্ঠাতৃদেব রূপে নৃত্য করবেন নটরাজ শংকর পশুপতি যিনি হরপ্পীয় কল্পনা। তার বন্দনা হবে শংকরা রাগে। অবশ্য বৈদিক দেবী বাক্ বা সরস্বতীও থাকবেন তার সঙ্গে—নৃত্যের সঙ্গতি দান করবেন সারস্বত বীণার ঝঙ্কারে। বহুকাল যাবৎ বৈদিক বাগীশ্বরী আর্যেতর সমাজে শংকর দশভূজার আত্মজা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এটাই হল সংশ্লেষের চাক্ষুষ প্রতিমূর্তি যার মধ্যে আছে সিন্ধুসভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতার অন্তর্লীন সংশ্লেষ।
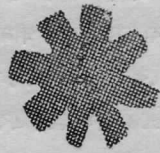
লিট্‌ল জার্নালের সাধারণ সমস্যা ও তার প্রতিকার

অপূর্ব ঘোষ

সাহিত্যজগৎ সম্বন্ধে যাঁরাই একটু ওয়াকিবহাল তাঁদের কাছে লিট্‌ল্ জার্নালের বিশদ পরিচিতি দেওয়া নিশ্চয়ই বাহুল্য মাত্র। লিট্‌ল জার্নাল আয়তনে ছোট কিন্তু রচনা মর্যাদায় ছোট নয়। এই সব গোত্রহীন পরিচিতিহীন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় কিছু কিছু রসোত্তীর্ণ ও সার্থক রচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে যেগুলি আগামীদিনে ধ্রুপদী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। লোকচক্ষুর অগোচরে তন্নিষ্ঠ সাহিত্য সাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রকাশিত এই সব পত্রপত্রিকার ভিতর এমন কিছু থাকে যেগুলি একটা গোটা জাতির সাহিত্যকর্মকে প্রভাবিত করে।

ছোট ছোট সাময়িক পত্রপত্রিকায় আজ যাঁরা আত্মপ্রকাশের আশায় কুণ্ঠিত পদক্ষেপে ঘোরাফেরা করছেন, তাঁরাই হয়তো আগামীকালের জন-নন্দিত সাহিত্যিক। শুধু আমাদের দেশে নয়, সমস্ত দেশের সাহিত্যসাধনার ইতিহাসে এর প্রমাণ বিধৃত আছে। আজকের সুপ্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত কোন সাহিত্যিক বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন না যে তাঁরা লিট্‌ল্ জার্নালকে অস্বীকার করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। টমাস ম্যানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় পৃথিবীতে মহৎ প্রতিভার যুগ শেষ হয়ে গেছে। আজকের সাহিত্য রচিত হয় দেশ ও কালের খণ্ডিত চেতনার বাহনরূপে। সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করে আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসারও মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশের তাগিদে কবি-লেখকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সৃষ্টির তাগিদে কাব্যসাহিত্যে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত কালজয়ী প্রতিভার অনুপস্থিতিতে এই সব অল্পশক্তি সম্পন্ন লেখকরাই আজ সাহিত্যছত্রের প্রকৃত ছত্রধর। সকলের রচনার সমষ্টিগত মুল্য যে টুকু আছে তা নিয়ে আমাদের গর্ব করার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কোন বৃহৎ প্রচার সংখ্যার পত্রিকা যেগুলি মুলতঃ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলে, সেগুলিতে সাহিত্য নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার

কোন অবকাশ নেই। অধিকাংশ পাঠকের মনোরঞ্জন করে পত্রিকার বিক্রয় সংখ্যা বাড়নোই তার মূল লক্ষ্য। অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত সাহিত্য পত্রিকা গুলিই সাহিত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারে। কোন বিশেষ সময়ের শক্তিধর কোন মহৎ পূর্বসূরীর বিরুদ্ধে বেদ্রোহ ঘোষণা করার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। সেই পূর্বসূরীর সৃষ্টিকে অতিক্রম করে সাহিত্যের পুরাণো রীতিনীতি ভেঙে ফেলার অভীপ্সা একান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। এই অস্বীকৃতি বা বিদ্রোহের প্রবণতা সবসময় নতুন যুগ সৃষ্টি করতে না পারলে ও এর গুরুত্ব অপরিসীম। কল্লোলকালের রবীন্দ্র বিদ্রোহের কোন শাশ্বত মুল্য থাক বা না থাক সমকালীন বাঙলা সাহিত্যের পালবদলের দায়িত্বটুকু পালনে তার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। সচরাচর এই সব বিদ্রোহী কবি লেখকরা বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়েছেন Establishment এর পক্ষপুটে আশ্রিতা-নটীসাজে সজ্জিতা বাহুবল্লভা পত্রিকার পৃষ্ঠায় নয়—পরিচিতিহীন অথবা স্বল্পপরিচিত নিরাভরণ লিট্‌ল ম্যাগজিনের পাতায়। সুতরাং বলা যেতে পারে, এই-সব ছোট ছোট পত্রপত্রিকাগুলিই একটা জাতির সাহিত্যজীবনের অকৃত্রিম সাধনাকে বহতা নদীর মত অক্ষুন্ন রাখে।

যা একটা জাতির সাহিত্য সাধনাকে বাঁচিয়ে রাখে তার জীবনের কিন্তু সুনিশ্চিত গ্যারান্টি কিছুই নেই। ভারত সরকারেরRegistrar of Newspapers for India-এর বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান তুলে দেওয়া হল। এর-থেকে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে বাংলা পত্রপত্রিকার-সংখ্যা প্রতিবৎসর বাড়তির পথে এবং বৃদ্ধির হারও উর্ধ্বমুখী।

বৎসর	দৈনিক	সাপ্তাহিক	অন্যান্য	মোট—
১৯৬৯	১৫	১৫৬	৪৮৪	৬৫৫
১৯৭০	১৭	১৬২	৫২৮	৭০৭
১৯৭১	২০	১৭০	৫৭০	৭৬০

এই পরিসংখ্যান থেকে সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে না, কারণ Registrar of Newspaper-এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত হয় কেবলমাত্র রেজেষ্ট্রিকৃত পত্র-পত্রিকা নিয়ে। বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত রেজেষ্ট্রিকৃত পত্র পত্রিকার চেয়ে অরেজেষ্ট্রিকৃতের সংখ্যা অনেক বেশি, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং সব মিলিয়ে বাঙলা ভাষায়-প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা গর্ব করার মত। অথচ পত্রিকা জগতে শিশু-

মৃত্যুর হার খুব বেশী। পত্র পত্রিকার-জন্মহার ও মৃত্যুহার দুটোই বাড়তির পথে। জন্মলগ্নের পর নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে একটা বছর বেঁচে আছে এমন পত্রিকার সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। প্রতি বৎসর বাঙলা ভাষায় অসংখ্য নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই দীর্ঘজীবি হতে পারছে। কেন এমন হয়? অর্থনৈতিক দুর্দশা নিশ্চয়ই এর অন্যতম প্রধান কারণ। যে দেশে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মানুষের গড় পড়তা আয় দারিদ্রসীমার নীচে সে দেশে কোন সাহিত্য পত্রিকা বহুল প্রচারিত হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করার—এ আশা দুরাশা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ছাব্বিশ বছর পরও যে দেশে সাক্ষরতার হার শতকরা তিরিশের কোঠা ছাড়ায় নি, সে দেশে কোন ও গবেষণা-প্রধান সাহিত্য পত্রিকার বহুল প্রচার সম্ভব নয়।

কিন্তু এহ বাহ্য। মূল সমস্যা আরো গভীরে। একথা সর্বজনবিদিত যে, কোনও লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রচার সংখ্যা কখনই কমার্শিয়াল পত্রিকার মত স্ফীত-কায় হয় না। লিট্‌ল জার্নালের পাঠকগোষ্ঠি থাকে একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ। কবি ও লেখককূল এবং পাঠকগোষ্ঠি ভাববন্ধনের ঐক্যসূত্রে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ থাকে। লেখার সমালোচনা ও প্রতিসমালোচনার সুস্থ প্রতিবেশে যে সাহিত্যিক পরিমণ্ডল রচিত হয়, সেই পরিমণ্ডলই লিট্‌ল জার্নালের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতিশ্রুতি বহন করে। লিট্‌ল ম্যাগাজিন জাতিত্ব ও চরিত্রলক্ষণ হারিয়ে গোত্রান্তরিত না হ'লে কখনই বহুল প্রচারিত পত্রিকায় পরিণত হ'তে পারে না। কারণ, যে চটকদার ও সুলভ উপাদান বহুজনের মনোরঞ্জন করে তা কখনই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। সাহিত্যকে এক কাপ গরম ওভ্যালটিনের মত উত্তেজক, রম্য ও স্বাদু পানীয়ে পরিণত করার দায়িত্ব লিট্‌ল ম্যাগাজিন কখনই স্বীকার করে না।

সাধারণতঃ দেখা যায় শিক্ষিত বেকার চার পাঁচটি বাঙালী তরুণ চায়ের বা কফির আড্ডায় অথবা ক্লাবে-বৈঠকখানায় একত্র হলেই তাদের মধ্যে একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এর পর প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পত্রিকার প্রথম কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হল। প্রধানতঃ এই জাতীয় পত্রিকার প্রচার নির্ভর করে Push Sell-এর উপর। স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এই জাতীয় পত্রিকা কিনে পড়ার মত সারস্বত কর্মে উৎসাহী ব্যক্তির সংখ্যা আমাদের মধ্যে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থাগমের আশাও বিশেষ নেই। সেইজন্য অর্থকৃচ্ছ্রতাহেতু উদ্যোক্তাদের উৎসাহ উদ্দীপনার ভাঁটা পড়তে থাকে। এর পরও

জোড়াতালি দিয়ে হয়তো আরো কয়েকটি সংখ্যা বের হ'ল। ইতিমধ্যে হয়তো উদ্যোক্তাদের কারো কারো চাকরী হয়ে গেছে কি অন্যত্র কোন জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছেন। অতএব অনিবার্যভাবেই উক্ত পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেল। পত্রিকাজগতে আরো একটি শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটল।

দুর্বল ও অক্ষম কবি লেখকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদেও অনেক সময় লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জন্ম হয়। কোন রকমে একটা পত্রিকা বের করতে পারলে সম্পাদক হিসাবে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। সম্পাদক তক্‌মাধারী কোন কোন ব্যক্তি বড় বড় পত্রিকার নামী লেখকদের খাসদরবারে প্রবেশের অনুমতি পান। Establishment-আশ্রিত লেখক কবি মালিক, মুরুব্বী প্রভৃতিদের সঙ্গে lobbying এর সুযোগ লাভ করতে পারেন। ঐ সব লেখক কবিদের লেখা পত্রিকায় ছাপিয়ে ব্যক্তিগত পরিচয়ের পথ সুগম হয়। পরস্পর পরস্পরের পিঠ চাপ্‌ড়ানি তৈলনিষিক্ত পথে প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা সহজতর :'য়ে ওঠে। কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি সমাজের সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আজও নি:শেষ হয়নি। সুতরাং যে কোন উপায়ে একটি পত্রিকা বের ক'রে রাতারাতি সাহিত্যিক বা সাহিত্যসেবী হয়ে ওঠার প্রলোভন অনেকের কাছেই দুর্নিবার হয়ে উঠতে পারে।

শুধুমাত্র মুনাফার আশায় কাগজ বের করা হয় এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কিছু অবসর ও বিজ্ঞাপন দাতা সংস্থার উপর মহলে কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এমন কোন লোকের মাথায় কেবল মাত্র লাভের খাতিরেই কাগজ বের করার পরিকল্পনা এল। নামী দামী কিছু লেখকের নিকৃষ্ট লেখা, মনোহারী অঙ্গসজ্জা ও সিনেমা নট নটিদের অন্তরঙ্গ ভঙ্গিমার কিছু ছবি ছাপিয়ে বের করা হল কোন শারদীয়া সংখ্যা। বাড়তি পাওনা হিসাবে রইল যৌন বিজ্ঞানের ছদ্ম আবরণে ঢাকা চটুল ও সচিত্র যৌন বিষয়ক প্রবন্ধ। পত্রিকা বের করে কোন অন্তরতম সাহিত্যিক কি সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে চরিতার্থ না হলে ক্ষতি নেই। পত্রিকা বিক্রী না হলেও কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু লেখককুলকে সম্মান দক্ষিণা দেবার কোন দায় নেই অতএব কাগজ মুদ্রণ প্রভৃতির খরচ বাদ দিয়ে বিজ্ঞাপন বাবদ যে টাকা পাওয়া গেল তার ষোল আনাই লাভের ঘরে জমা পড়ল। অল্প কিছু বিনিয়োগে এবং প্রায় বিনাশ্রমে কিছু অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা হ'ল। এইভাবে নিছক অর্থোপার্জনের তাগিদে কিছু সাহিত্য ব্যবসায়ী পত্রিকা বের করেন। প্রধানতঃ পূজা সংখ্যা হিসাবেই এই জাতীয় পত্রিকাগুলি আত্মপ্রকাশ করে।

বলা বাহুল্য, যে পত্রিকা প্রকাশের পিছনে রয়েছে ব্যক্তিস্বার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহ অথবা অর্থোপার্জনের তাগিদ, সে পত্রিকা কখনই বিশুদ্ধ সাহিত্য সেবার মহান আদর্শের বাহন হতে পারে না। এইভাবে অধিকাংশ পত্রিকার আদর্শহীনতার অন্ধকারে জন্ম হচ্ছে ফলে পত্রিকা জগতে এত ব্যাপকহারে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। বছর বছর বাঙলা ভাষায় এত পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, আবার যথানিয়মে মৃত্যু বরণ করছে। কিন্তু সাহিত্যের দরকারে কোন স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে পারছে না। উত্তরসূরীদের জন্য রেখে যেতে পারছে না কোন মহৎ উত্তরাধিকার। ইদানিং কালে কত শত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন পত্রিকাকে ঘিরে গড়ে উঠল না কোন ক্ষমতাবান সাহিত্যিকগোষ্ঠী। বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, সবুজ পত্র, ভারতী, বিচিত্রা, কল্লোল, কালি-কলম দূরস্থান। পরিচয়, পূর্বাশা কি অগ্রণীর মত শক্তিমাণ সারস্বত গোষ্ঠীর আবির্ভাব হল না বিগত তিন দশকেও। অথচ বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্য সাধনা নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। বাঙলা ছোট গল্প ফর্ম ও বিষয় বস্তুর বিচারে বিশ্বের দরবারে উচ্চ আসনের দাবীদার। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে বাঙলা আধুনিক কবিতা সার্থক পরিণতির পথে অভিসারী। তা সত্বেও কেন এমন হয়। মনে হয়, কোন সুষ্ঠু সর্বসমর্পিত সাহিত্যিক আদর্শ না থাকার ফলেই পত্র পত্রিকার জগতে মৃত্যুহার এত বেশি। অবশ্য এর বিপরীত চিত্র যে নেই এমন নয়। মনোপলি প্রেসের বানিজ্যিক স্বার্থের করাল গ্রাসে যখন এদেশের বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃজনের প্রেরণা লুপ্তপ্রায়, অধিকাংশ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সাহিত্যসেবী Establishment-এর ভজনা করে খ্যাতি-বিত্ত লাভের জন্য ধাবমান তখনও এমন কিছু আদর্শ নিষ্ঠ লেখক সম্পাদক আছেন, যাঁরা লোকচক্ষুর অগোচরে নীরবে সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন, নগর কলকাতাতে ত নিশ্চয়ই, মফঃস্বল শহর এমনকি, সুদূর পল্লীগ্রামের নিভৃততম কোণ থেকেও এমন কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যেগুলি নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল-মাত্র শুদ্ধতম সাহিত্যসেবার আদর্শ নিয়েই দীর্ঘজীবি হয়ে আছে এবং নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। অবশ্য এদের সংখ্যা খুবই কম। নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে এদের অস্তিত্বও আজ বিপন্ন। পাঠক শ্রেণীর উদাসীনতা, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের উন্নাসিকতা; সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বিজ্ঞাপনদাতাদের অমনোযোগিতা কাগজের ক্রমবর্ধমান মূল্যহার, সবার উপরে কমার্শিয়াল পত্র-পত্রিকার সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা এদের চলার পথের নিত্য পাথেয়। স্বঃতপ্রবৃত্ত হয়ে সামান্য কিছু মূল্য দিয়ে এইসব আদর্শনিষ্ঠ পত্রিকা কিনে পড়ার মত পাঠক

আমাদের দেশে কতজন আছেন জানিনা। রচনার শব্দ অথবা লাইন মেপে যে লেখকদের সম্মান দক্ষিণা নির্ণয় হয়, সেই সব লেখকরা লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে উপেক্ষা ও অনাদরের চোখে দেখবেন, এর মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। কিন্তু মাঝারি স্তরের প্রতিষ্ঠিত লেখকদেরও এইসব পত্র-পত্রিকার প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ পায় তা রীতিমত বেদনাদায়ক।

উৎকৃষ্ট মানের রচনাই যে কোন পত্রিকার পরম অন্বিষ্ট। তবু কিন্তু রচনা নয়—বিজ্ঞাপনের ভিতরই সব কাগজের বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি থাকে। কোন পত্রিকার কাগজ, মুদ্রণ-বাঁধাই ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ হবার মত সর্বনিম্ন পৌণপৌনিক আয়ের গ্যারান্টি না থাকলে কখনই সে পত্রিকা টিকে থাকতে পারে না। এই সর্বনিম্ন আয়ের উৎস নিঃসন্দেহে বিজ্ঞাপন। কিন্তু আমাদের দেশে এই বিজ্ঞাপন জগতের অবস্থাটা কি রকম? সাধারণতঃ বড় বড় পণ্য উৎপাদক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্র এবং বৃহৎ প্রচার সংখ্যার commercial পত্র-পত্রিকা ছাড়া অন্যত্র বিজ্ঞাপন দেন না। এই বিজ্ঞাপন জগতেও মনোপলি প্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য। সুতরাং লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সঙ্গতি-হীন; আদর্শসম্বল নিষ্ঠাবান তরুণ সম্পাদক-মালিকের সেখানে কতটুকু প্রবেশাধিকার থাকতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। উৎপাদিত পণ্যের প্রচারই যেখানে একমাত্র লক্ষ্য—সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণের কোনও দায় নেই; সেখানে এর বিপরীত কিছুই আশা করা যায় না। আর লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পক্ষে 'লোমনাশক সাবান', অথবা নগ্ন নারীদেহ শোভিত 'ব্রা'র বিজ্ঞাপন অঙ্গে ধারণ করাটা নিশ্চয়ই গৌরবের নয়। তাহ'লে বিজ্ঞাপনের জন্য লিট্‌ল ম্যাগাজিন নির্ভর করবে কার উপর? কে তাকে প্রানধারণের রসদ যোগাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী সংস্থা; সরকারী উদ্যোগ (Public Undertaking)। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও এমন কিছু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যাঁরা পণ্যের প্রচার ছাড়াও মর্যাদাব্যঞ্জক বিজ্ঞাপন (Prestige Campaign) করেন তারা। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠপোষণের দায়িত্ব এঁদের।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেটুকু সরকারী দাক্ষিণ্য পাওয়া যায় তাতেও কত বাধা-নিষেধের বেড়াজাল। পত্রপত্রিকা রেজেষ্ট্রিভুক্ত না হলে সরকারী-বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় না। অথচ ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন পত্রিকার রেজেষ্ট্রিকরণ কতটা জটিল ও বিলম্বিত পদ্ধতি। বিজ্ঞাপন দেবার সময় সরকার সংশ্লিষ্ট পত্রিকার জীবৎকাল (standing), রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সাহিত্য চিন্তাধারা বিচার করেন। কিন্তু অনেক

সময় অযোগ্য হাতে পড়ে অথবা রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে এই বিচার প্রহসনে পরিণত হয়। এর ফলে শুধু সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটিই নয়, সমূহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির আখের। সেইজন্য সাহিত্য সংস্কৃতির স্বার্থেই এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন বিতরণের ব্যাপারে সরকারী নিয়ম-নীতিকে আরো উদার হতে হবে। একটা সর্বনিম্ন নির্দিষ্ট সাহিত্যিক মান বজায় থাকলেই সেই পত্রপত্রিকাটি সরকারী বিজ্ঞাপন পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে রেজিষ্ট্রেশন, স্ট্যাণ্ডিং অথবা মতাদর্শ বিচারের শুচিবাই পরিহার করে একটা সুষ্ঠু সরকারী বিজ্ঞাপন নীতি নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেহেতু, শিক্ষা সংস্কৃতি রক্ষণের প্রধান দায়ভাগ দেশের সরকারের অতএব; এ দাবী অন্যায় ও অসংগত নয়। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা তাঁদের মুনাফা সংগ্রহ করেন দেশের সম্পদ ও শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে। সুতরাং দেশের শিক্ষা সংস্কৃতিকে রক্ষণের দায়িত্ব তাঁদের উপরও বর্তায়। বিজ্ঞাপনের ব্যয় বরাদ্দের একটা নির্দিষ্ট অংশ যাতে ছোট ছোট অবানিজ্যিক পত্র পত্রিকাকে দিতে তাঁরা বাধ্য থাকেন তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কোন আইন প্রণয়ন করা যায় কিনা সেটা সরকার ভেবে দেখতে পারেন।

বৈশ্যসভ্যতার এই অন্তিম প্রহরে মানব জীবনের অনেক শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পও ব্যবসায়ীর পণ্যে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের কিছু একচেটিয়া সাহিত্য-কারবারী সাহিত্য নিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। Establishment-ই এ ব্যাপারে অগ্রণী। এই কারণেই সাহিত্যে বিকৃত জীবনদর্শন, যৌনসর্বস্বতা, স্যাডিজিম্ প্রভৃতির এত ফলাও কারবার। জীবন ও সমাজ সম্পর্কে অসুস্থ ও অবক্ষয়ী মতাদর্শ প্রচার করে দেশের উদ্‌ভ্রান্ত যুবশক্তিকে সর্বাত্মক উৎসন্নের পথে পাঠিয়ে মুনাফা লুণ্ঠনের ব্যাপক প্রচেষ্টায় এরা তৎপর। এহেন অবস্থায় দেশের প্রতিটি সৎ ও বিবেকবান সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমীকে গভীরভাবে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। বুঝতে হবে বণিক বৃত্তির সঙ্গে আপোস করে নয়—সৎ সাহিত্যাদর্শ সম্বল করে সুস্থ, বলিষ্ঠ ও জীবননিষ্ঠ সাহিত্য প্রচার করেই এই সমূহ বিনষ্টিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব এর জন্য চাই সৎ ও নির্ভেজাল সাহিত্য। আর সেই সৎ ও নির্ভেজাল সাহিত্যের পরম আধার হল লিট্‌ল জার্নাল।

তথ্যের জন্য কবি ও গ্রন্থাগার কর্মী শ্রী নচিকেতা ভরদ্বাজের কাছে ঋণী।

নাট্যস্মৃতি

ধনঞ্জয় বৈরাগী

দেখতে দেখতে পঁচিশ বছর হয়ে গেল। মানে নাটক নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষার কথা বলছি। এখনকার সঙ্গে তখনকার দিনের কত তফাৎ। এখন যেমন পাড়ায় পাড়ায় একাধিক নাট্য গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, আমাদের ছাত্রাবস্থায় পাড়ায় পাড়ায় ছিল খেলাধুলোর ক্লাব। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন। খেলার মাঠের অভাব ছিল না। তখন এ শহরে এত বাড়ী ওঠেনি। সব পাড়াতেই অনেকগুলি করে ফাঁকা জমি পড়ে থাকত। এই জমিতে নিয়মিত খেলা হত। যে মরশুমের যে খেলা। আবার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। এক পাড়ার ক্লাব অন্য পাড়ায় খেলে শীল্ড জিতে হৈ হৈ করে ফিরে আসত।

এই কথাগুলো এইজন্যে বলছি কারণ আজকালকার ছেলেদের কাছে এসব শুনতে আশ্চর্য লাগবে। কারণ এরা জন্মে থেকে ফাঁকা বলতে শুধু গড়ের মাঠই দেখেছে, খেলাধুলোর কোন সুযোগই পায়নি বলতে গেলে। মাঠ নেই তো খেলবে কোথায়? হরতালের দিন ফাঁকা রাস্তায় ইঁট পেতে এরা ক্রিকেট খেলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়।

আমরা যখন স্কুলের ছাত্র তখন থিয়েটার খুব কম দেখেছি। কারণ সে সময় শ্যামবাজারে পেশাদার মঞ্চ ছাড়া অন্য কোথাও থিয়েটার হত না। স্টার, রঙমহল, শ্রীরঙ্গম আর মির্নাভা। দুর্গাদাস, অহীন্দ্র চৌধুরী; নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, শিশির ভাদুড়ীর যুগ। থিয়েটার-এর কথা বাড়ীতে আলোচনাও বেশি হত না। তবু নিউ থিয়েটার্স এর সবাক ছবি চণ্ডীদাস, ভাগ্যচক্র, বিদ্যাপতি; মুক্তি এ সবের কথা হত এবং বাড়ীর লোকদের সঙ্গে হাফ টিকিটে ছবি দেখতেও গেছি। কিন্তু স্কুলে এইসব নিয়ে আলোচনা, নৈব, নৈব, চ।

সখের থিয়েটার এর আসর বসত কলেজ সোশ্যাল উপলক্ষে বছরে একবার। ঠিক পূজোর ছুটির আগে। রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা এই ধরনের নাটকগুলি অধ্যাপকরা পছন্দ করে দিতেন। অভিনয় হত ইউনিভার্সিটি ইনস্টি-

টিউটে। কলেজে পড়া দাদাদের সঙ্গে আমাদের মত স্কুলের ছাত্ররাও প্রবেশ পত্র পেতাম। বলা বাহুল্য ছেলেরা মেয়ে সেজে পার্ট করত, আর সেই নিয়ে হাসি ঠাট্টাই হত বেশি, নাটক কোনরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে শেষ হত।

কলকাতার যেসব বনেদী বাড়ীতে পারিবারিক দুর্গোৎসব হত; সেখানেও দু'এক রাত্রি নাটক অভিনয় হত। বেশির ভাগই প্রহসন, যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিরহ', অমৃতলালের 'খাসদখল' প্রভৃতি। সে সময় বাড়ীর যেসব কর্তা প্রবাসে থাকতেন, সপরিবারে উপস্থিত হতেন কলকাতার বাড়ীতে। পুজো উপলক্ষে এ ছিল বাৎসরিক পুণর্মিলনের উৎসব। আগে থেকে অনুষ্ঠান সূচী ঠিক থাকত না। কর্তারা যেমন মেজাজে থাকতেন, তারই উপর নির্ভর করত কোনদিন কি হবে। দু'দিনের মহলায় নাটক নাবান হত। প্রম্পটার এর গলাই শোনা যেত সবচেয়ে বেশি। নাটক শুরু হতে রাত দশটা, শেষ হত রাত তিনটে, চারটেয়। হৈ, হৈ, আনন্দ—নাটকের মাধ্যমে।

সে সময় এত ফ্লাটে থাকার চল হয়নি। বেশির ভাগ বাড়ীতেই বড় বড় উঠোন ছিল। সেখানেই চৌকি পেতে স্টেজ তৈরী করে অভিনয় হত। যেমন নির্মলচন্দ্রের বাড়ীতে হয়েছিল 'শনিবারের' বৈঠক। এর কারণ মঞ্চ ছিল না বললেই হয়। শ্যামবাজারের পেশাদার মঞ্চ আর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ছাড়া বিশেষ কোন মঞ্চ ছিল না। মাঝে মাঝে অবশ্য চ্যারিটি শো হত, স্থান ফার্স্ট এম্পায়ার [এখনকার রক্সি সিনেমা], পরে অবশ্য নিউ এম্পায়ার খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৫৫-র পর নিউ এম্পায়ারে রবিবার ও ছুটির দিন সকালবেলা লাগাতার থিয়েটার হত।

আগেকার দিনে চ্যারিটি শো আজকালকার মত এত বেশি এবং ঘন ঘন হত না বলে বেশ ভাল টাকা উঠত। শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের গানের আসর, রবীন্দ্রনাথের কোন নৃত্যনাট্য, এই সবেরই প্রচলন ছিল বেশি।

ফার্স্ট এম্পায়ার বা নিউ এম্পায়ারে ছবির বদলে সপ্তাহব্যাপী মঞ্চাভিনয় খুব বেশী হত না। মধু বসু সি, এ, পি মাধ্যমে আলিবাবা, বিদ্যুৎপর্ণা প্রভৃতি নাটক মাঝে মাঝে করেছিলেন। উদয়শঙ্কর এর নাচের অনুষ্ঠান হত: ৺পৃথ্বীরাজ কাপুর তাঁর দলবল নিয়ে অভিনয় করে গেছেন। আর হত ম্যাজিক শো। কার্টার দি গ্রেট চ্যাং এবং ৺পি, সি, সোরকার প্রায় এক মাস ধরে যাদুর খেলা দেখিয়েছেন। মার্কেটের সামনে পুরোন গ্লোব থিয়েটারেও এধরনের শো হত এবং মানিকতলার

ছায়া সিনেমাতেও। বিদেশী দল মাঝে মাঝে আসত নাচ গানের পশরা নিয়ে। তার নাম ছিল নন্ স্টপ রিভিউ।

আমাদের কলেজ জীবনে [১২৪৭-৪৮] মঞ্চের স্বাদ পেলাম সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এসে। এখানে বেশ বড় হল ভাল মঞ্চ। কিন্তু বাইরের কাউকে, বিশেষ করে বাংলা থিয়েটার এর জন্যে ব্যবহার করতে দেওয়া হত না। আরও এই জন্যে, যুদ্ধের সময় এখানে সৈনিকদের আনন্দ দেবার জন্যে নিয়মিত থিয়েটার করত এন্সা। সে সব নাটক দেখার সুযোগ আমাদের ছিল না। তবে শুনেছি ইংলণ্ডের নামী দামী অভিনেতারা সেসময় এই সেন্ট জেভিয়ার্স মঞ্চে অভিনয় করে গেছেন।

যাই হোক ফাদারদের সহযোগিতায় এত বড় একটা মঞ্চ হাতের কাছে পেয়ে নাটক করার নেশা আমাদের পেয়ে বসল। সবে তখন স্বাধীনতা এসেছে। নবীনদের মন আশা আকাঙ্খায় টগবগ করে ফুটছে। অতএব নিত্য নূতন নাটক কর।

কিন্তু নাটক কোথায়। লেখ নাটক। তড় বড় করে লেখা শুরু হয়ে গেল। আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টার নানা রসের একাঙ্ক নাটক।

মোটামুটি এই সময় জিওফ্রি কেণ্ডেল সপরিবারে সেক্সপীরিয়ানা নামে সেক্সপীয়ারের নাটক তুপুরে বিকেলে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে মঞ্চস্থ করতে লাগল ছাত্রদের জন্যে। উৎপল দত্ত প্রমুখ কিছু ছাত্র ঐ দলের হয়ে ছোট খাট পার্ট করার জন্যে যোগও দিল। ফলে ছাত্রদের মধ্যে নাটকের উৎসাহ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। নাটক দেখছি। নিজেরা লিখছি। অভিনয় করছি। কলেজের ছাত্র তাই পেশাদার মঞ্চ দেখার ছাড়পত্রও পেয়েছি। শিশির কুমারের নূতন ধরনের প্রযোজনা 'তুঃখীর ইমান', 'পরিচয়'। বিশ্বনাথ ভাতুড়ী ও মলিনা দেবীর অনবদ্য অভিনয় শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' ও 'বিজয়া' নাটকে।

তখনও কলেজের থিয়েটারে ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে অভিনয় করার অনুমতি ছিল না। কিন্তু আমাদের মাথায় ভূত চাপল আন্তর্কলেজীয় নাটক করতে হবে। লেখা হল তু'খানা নাটক। একটায় শুধু পুরুষ চরিত্র, অন্যটায় শুধু মেয়ে। আমরা তখন ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র, ১৯৪৭ সাল। কলেজে কলেজে প্রচার পত্র বিলি করা হল। দেখা করা হল প্রিন্সিপালদের সঙ্গে। ক্রমে ছাত্র ছাত্রী এল। আমাদের কলেজ ছাড়া প্রেসিডেন্সি, আশুতোষ, স্কটিশচার্চ, লরেটো প্রভৃতি কলেজ থেকে। নিয়মিত মহলা চলল। মঞ্চস্থ হল সেন্ট জেভিয়ার্স মঞ্চে তখনকার দিনের

রাজ্যপাল স্বর্গীয় রাজাগোপালাচারী এবং উপাচার্য ৺প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপস্থিতিতে। যতদূর মনে আছে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বন্যা ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে অবশ্য ভারতীয় গণ নাট্যের নাটক প্রযোজনা আরম্ভ হয়ে গেছে। তবে সেখানে ঢুকতে গেলে রাজনীতির ছাড়পত্রের দরকার ছিল। আমাদের মত যারা রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলাম না, তাদের পক্ষে গণ নাট্যে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

বলতে গেলে ঐ আন্তর্কলেজীয় নাটকের পর থেকেই নাট্য গোষ্ঠী গড়ে তোলার আকাঙ্খা প্রবল ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। স্থায়ী দল হল. নাম জাতীয় নাট্য পরিষদ। স্থান আমার মামার বাড়ী, অজানা, এলগিন রোড। সেখানে ড্রয়িংরুমের সঙ্গে একটা ক্ষুদে মঞ্চ ছিল, [এখনও আছে।] সেখানে নামতে লাগল ছোট ছোট নাটিকা। উৎপলরা তখন লিট্‌ল থিয়েটার নাম দিয়ে ইংরাজী নাটক নামাচ্ছে। ঐ ক্ষুদে মঞ্চতে জুলিয়াস সীজারের অংশ অভিনয় করে গেল। মোটামুটি এই সময় তাপস সেন দিল্লী থেকে কলকাতায় আসে। নিউ এম্পায়ারে তার ছায়া নাটক ভুষুণ্ডীর মাঠে। তখন থেকে তার সঙ্গে পরিচয়। ঐ ক্ষুদে মঞ্চতে সাধারণ আলোর শেড নিয়ে চাঁদের ইল্যুশান সৃষ্টি তাপস সেনের প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এর পরেই বোধ হয় ১৯৫০ সাল। নিউ এম্পায়ারে পর পর তিনটি রবিবার সকালে বহুরূপীর প্রথম নাট্যোৎসব। তিনটি নাটক, পথিক, উলুখাগড়া, চার অধ্যায়।

নিঃসন্দেহে নাট্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্ঠী থিয়েটার এর ভূমিকার এ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।
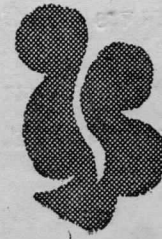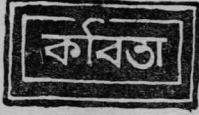
মৃগী রোগের গল্প

কেদার ভাদুড়ী

আম্মাজান, আমি ওকে ··· এনে দাও ··· একটুখানি দেখব
আমি বলছি তোমাদের এরপরে সব কথা শুনব
আম্মাজান, আমি ওকে ··· এনে দাও ··· একটিবার দেখব
উঃ ··· মা, আম্মা, তোমরা কত ··· হায় আল্লা, ক্রুর হতে পার

না, ওটা কি ? ট্যাবলেট ? রেখে দাও, খাবনা কিছুতে
কি হয়েছে ? ··· কে বলেছে ··· কে এসেছে ··· ডাক্তারেরা কেন ?
ওরা কিছু বোঝে নাকো বলে দাও চলে যাক ওরা
আম্মাজান, আমি ওকে ··· এনে দাও ··· একটুখানি দেখব

আমি বলছি এরপরে তোমাদের সব কথা শুনব
সাধি করব সাধি, ঘর করব ঘর, রান্নাবান্না সব
বছরে পোয়াতী হব পুজো দেব পীর ঠাকুরের
আম্মাজান, আমি ওকে ··· এনে দাও ··· একটিবার দেখব

আমি বলছি তারপরে তোমাদের সব কথা শুনব
উঃ ··· মা, আম্মা, তোমরা কত ··· হায় আল্লা, ক্রুর হতে পার।

ধ্বনি

দিলীপ রায়

হরিধ্বনিটা শুনতে ভালো লাগতে পারে কীর্তনের সম্ভ্রান্ত আসরে,
নৈশরাত্রে মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে খাটিয়ায় নাচাতে নাচাতে
যে সব অসভ্য যুবক দল হল্লা করতে পারে, মুখর ইয়ার্কিতে,
তারা, স্তব্ধ রাত্রির নিঃশব্দতা খান খান করে ভেঙ্গে চূরে ঐ
তাড়ি খেয়ে মাস্তানের দল, মড়াটাকে নিয়ে যেন নাচাতে নাচাতে
লাফাতে লাফাতে অঢেল ইয়ার্কিতে শ্মশানের দিকে ধায় ;
তারা যেন তোমারো আমারো মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে হাজির,
দিবসে রাত্রিতে ; শমন পাঠায় দুত, কেড়ে নিতে অমূল্য জীবন
তোমার, আমার, প্রিয়জনের।
হয়তো তখনো তুমি যুবতী সঙ্গিনীর বুকে মুখ রেখে আরামে
নিদ্রাগত ; চন্দন সাবানের সুন্দর ঘ্রাণ, আর সেন্টএর মিষ্টি সৌরভ।
চুলে কুন্তলে দীর্ঘ কেশরাশি, ছড়িয়ে পড়েছে বালিশের চারিধারে,—
হয়তো তখনো জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পাবে আলস্যে
একফালি আকাশে অসংখ্য তারা—আলিঙ্গন শিথিল
হ'য়ে যাবে নাকি সেই সন্ধিক্ষণে, মুহূর্তে ভয়ঙ্কর ? যখন শুনতে পাবে
কাতর শ্লোগান তুমি, অশ্লীল মদ্যপায়ী জড়িত কণ্ঠের উচ্চ চীৎকারে
ধমনীতে তোমার টাটকা রক্ত কিছুক্ষণ হিম শীতল
হবে না কি শুনে ঐ বিকট আওয়াজ 'বল হরি, হরি বোল ?'
পুণঃ পুণঃ আঘাতে প্রবল, প্রায় মাইকের ডাক,—
বধির করবে না কি কান ? কম্পিত হবে না তব প্রাণ ?

একা

স্বদেশ রঞ্জন দত্ত

থাকা যাবে না কোথাও, আলো নেই ডাহা অন্ধকার।

হাকাহাকি হুটোপুটি ভাগাভাগি খেয়োখেয়ি
পাখিদের দলে
আকাশে দখল নিয়ে ভাগাভাগি রাগারাগি
এর-বাসা ভাঙাভাঙি
ডিম ছোড়াছুড়ি এর-ওর নখ-ঠোঁটে বুক ছেঁড়াছিঁড়ি

থাকা যাবে না কোথাও
আলো নেই ডাহা অন্ধকার।

মাছেদের কেউ কারো বাড়ির উঠোন
মাড়াবে না।
এ-ওর গায়ের গন্ধে মুখ ফিরিয়ে রাখেন
এ-ওর বাচ্চাকে গিলে ফ্যালে টুপটাপ;

মানুষের পাড়ায় দেখেছি কেউ মাছ রাঘব বোয়াল
কেউ বাজপাখি
কেউ বুনো জঙ্গী শেয়াল
মানুষের মাথা চেটে খায়।

শাদা মেঘ ব্লটিঙ পেপার

অজিত হাজরা

এসো কন্যা, বসো কন্যা, এইখানে মন দিয়ে বসো
হাওয়া খাও কন্যা, ফ্যান খুলে ফুরফুরে হাওয়া
তারপর বুঝে নাও এই ঘর তোমার সংসার
গুরু আছে জন আছে ভালবাসা তাও খুঁজে পাবে

মালাগাঁথা জানো নাকি? তাহলে তো হয়েছে ভালই
চিঠি তুলে ফাইলে গাঁথো, এই নাও একরাশ চিঠি
হয়ে গেলে জল নাও কুলারের সুশীতল জল
হাওয়া খাও জল খাও টকঝাল দুপুরে ক্যান্টিনে

এসো কন্যা, বসো কন্যা, এইখানে চোখ পেতে বসো
ঘরের ভেতরে দেখ শাদা মেঘ ব্লটিঙ পেপার
পিনের কুশনে দেখ তারাজ্বলা রাতের আকাশ
এই সব কোথা পাবে? পাবে কোথা নিজ রোজগার?

কী করো, কী করো কন্যা! তাকায়োনা জানালার বাহিরে
সব খাঁটি করে দেবে আকাশের নীল যাদুকর

বাড়ী যাব এই বেলা

ভাস্কর চৌধুরী

ওগো যাদুকর, থামাও তোমার খেলা।
তোমার বাঁশীর রামধনু সুরজালে
কেন যে আমায় জড়ালে এবং মজালে ?
দিন শেষে দেখি কত কাজে অবহেলা
করে বসে আছি, বাড়ি যাব এই বেলা

দেখেছি তোমার বহুরূপী কত খেলা,
নেচেছি অনেক ও বাঁশীর সুরে সুরে
পুতুলের মত ; বল আর কত দূরে
নিয়ে যাবে তুমি, ফুরিয়ে এল যে মেলা ;
কত কাজ বাকী—বাড়ি যাব এই বেলা।

ওগো বাজীকর অনেক খেলেছি খেলা।
এখন আকাশ ক্লান্ত গোধুলি মেখে,
অচিরে আবার রাত্রিতে নেবে ঢেকে,
থাম এইবার, ভেঙ্গে দাও মায়া মেলা,
ক্লান্ত আমিও শেষ কর সব খেলা ;
বাড়ি ফিরে যাব—ছুটি দাও এই বেলা।

তখন মধ্য দুপুর

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ঐ খানে এক পুকুর ছিল, ফটিক জলের পুকুর।
হঠাৎ দেখি, উধাও সেটি,
তখন মধ্য-দুপুর।

আজব কাণ্ড! এমন কথা কাকেই-বা আর বলি—
জল দিয়ে যাও, ষোড়শী গো,
পেতেছি অঞ্জলি !

গোপালের রুজি রোজগার

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

এমনিতে স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট তীক্ষ্ণ, তবু অভিলাষ আর একবার ঝালিয়ে নিতে চাইল। গত দুদিন ধরে সে সমানে টাইম টেব্‌ল্ মুখস্থ করিয়েছে তার বার বছরের ছেলে গোপালকে, মুখস্থ করা বক্তৃতাটা বার বার শুনেছে রেকর্ডের মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাতে কোথাও না আটকে যায়। এখন জনাকীর্ণ প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সদ্য সবুজ হওয়া সিগনালের দিকে তাকিয়ে অভিলাষ জিজ্ঞেস করল, "বলত গোপাল, এখন কোন লোকাল আসছে ?"

ছোট গোপাল বগলে করে একটা অপেক্ষাকৃত বড় কাঁচের বয়াম কোনরকমে সামলাচ্ছে। সেটা কমলালেবুর কোয়ার মত দেখতে লজেন্সে প্রায় ভর্তি। গোপালের পরণে ধোয়া পরিস্কার হাফ প্যান্ট হাফ সার্ট, পায়ে হাওয়াই স্যাণ্ডেল, মাথার চুল পরিপাটি আঁচড়ান। বেরোনোর আগে প্রমদা বাঁ হাতে করে ছেলের থুতনি তুলে ধরে ডানহাতে চিরুনি দিয়ে সযত্নে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে স্বামীর দিকে কটাক্ষ হেনে কণ্ঠস্বরে আক্ষেপ ফুটিয়ে বলেছে, "বলিহারি তোমাকে। লেখাপড়া ছাড়িয়ে এই দুধের ছেলেকে নিয়ে ঘানিতে জুড়ে দিতে চললে।"

খেঁকিয়ে উঠেছে অভিলাষ, "চুপ। একেবারে চুপ। মেলা ঘ্যানর ঘ্যানর কর না। মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের মত থাকবে। দুনিয়ার হাল চাল বোঝ কিছু। একদিন বেরোও না লাইনে। দেখবে গোপাল ত গোপাল—ওর অর্দ্ধেক বয়সী ছেলেরা কেমন দুহাতে পয়সা কামাচ্ছে। আর লেখাপড়া। লেখাপড়া শিখে একজন ত কত সুসারই করলে—"

খোঁটাটা বড় ছেলে গোবিন্দকে লক্ষ্য করে। যেন প্রমদারই দোষ। সে যে হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে তিন চার বছর ধরে চাকরীর চেষ্টায় হন্যে হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাপের ব্যবসার লাইনে ঢুকতে চাইল না—সে যেন প্রমদারই পরামর্শে। নাক মুখ সিঁটকে গোবিন্দ বলেছিল, "ঐ ট্রেনে ঘুরে ঘুরে হকারি—কখনও লজেন্স কখনও দাদের মলম বা চানাচুর—ও আমার দ্বারা হবে না—"

ক্ষেপে গিয়েছিল অভিলাষ, "কেন হবে না রে হারামজাদা! তোর বাপ যদি চিরকাল এই করে তোদের খাওয়াতে পরাতে পারে, লেখাপড়া শেখাতে পারে—"

মুখ বেঁকিয়ে হেসেছিল গোবিন্দ, "এই করার জন্য ত লেখাপড়া শেখাও নি—"

"বেরিয়ে যা। বেরিয়ে যা হতভাগা। চোখের সুমুখ থেকে দূর হয়ে যা। একশবার মানছি, হাজার বার মানছি. তোকে লেখাপড়া শিখিয়ে গু খেয়েছি আমি। এই বাজারে নিত্য দুবেলা চারটে প্রাণীর মুখের গ্রাস জোটাতে হাড় কালি হয়ে যাচ্ছে আমার, আর উনি ভারী লাট সায়েবের নাতি এয়েছেন—"

আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় গোবিন্দ গৃহত্যাগ করেছিল। কদিন খুব কান্নাকাটি করল প্রমদা, স্বামীর কাছে অনুযোগ করল, "এবারে খোঁজ খবর নাও ছেলেটার।"

উত্তরে ঠোঁট উলটেছে অভিলাষ, "কোথায় আর যাবে। গিয়ে থাকবেই বা কদিন। কে রোজ চারবেলা ভুজ্যি জোগাবে। পেটে টান ধরলে আপনি চলে আসবে ঠিক।"

কিন্তু আসেনি। শংকিত অভিলাষ ভিতরে ভিতরে সব হাসপাতালে খোঁজ খবর করেছে, ট্রেনে কাটা পড়া বেওয়ারিস লাসগুলোর ছবি দেখেছে হাওড়া শেয়ালদা ষ্টেশনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে; কোথায় কোন হদিশ না পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে মনে মনে। ভেবেছে যাকগে, এই ভাবে যদি ছেলেটা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে সেটা শাপে বর হবে। এদিকে প্রমদার কান্নাকাটিও কমে এসেছে। তা থেকে মনে মনে আন্দাজ করে নিয়েছে অভিলাষ নিশ্চয়ই গোপনে গোপনে মায়ে ছেলেতে একটা মিটমাট হয়ে গেছে। সে আর কতক্ষণ থাকে বাড়িতে। সেই সকাল থেকে রাত নটা দশটা পর্যন্ত আপ ডাউন লোকাল ট্রেনে ট্রেনেই তার ঘর বাড়ি ঘোরা ফেরা। এর মধ্যে যদি গোবিন্দ মাঝে মাঝে এসে তার মার সঙ্গে দেখা করে যায় তাহলে অভিলাষ তা আর জানছে কি করে।

তখন অভিলাষ মনে মনে বড় ছেলের বেলায় যে ভুলটা করেছিল ছোট ছেলের বেলায় সেটা শুধরে নিতে চেয়েছে। খুব আশা করেছিল ছেলেদের জীবন যেন তার নিজের জীবনের হুবহু নকল না হয়। এই লোকাল ট্রেনে ঘুরে ঘুরে হকারি, অনির্দিষ্ট আয়, কদিন অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকলে অনটন অনশনের হাঁ-মুখের সামনে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপে দিনগুলো। কেউ ভদ্রলোক বলে ভাবে না, রোদে পুড়ে জলে ভিজে চেহারাতেও এসে যায় এক ধরণের কাঠিন্য ও রুক্ষতা। বড়

ছেলেকে লেখাপড়া শেখাল কষ্টসৃষ্ট করে, আশা ছিল সে একটা চাকরী বাকরী করবে যা কিনা মাস গেলে একটা স্থির ও নির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চয়তা এনে দেবে জীবনে। কিন্তু দেখা গেল সে আশাটা দুরাশা মাত্র। চাকরী পরশমণির মত দুর্লভ। ওদিকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করা ছেলের হকারিতে অরুচি। এখন অভিলাষের মনে হয় খুব বড় ভুল করেছিল সে।

সেই ভুলটা যাতে আর ছোট ছেলের বেলাতে না ঘটে অভিলাষ তাই রাত্রে গোপালকে ডেকে বলেছিল, "এই গোপাল, তুই সামনের লক্ষীবার থেকে আমার সঙ্গে লাইনে বেরোবি—"

শুনে প্রমদা আঁৎকে উঠেছিল, "কি বলছ তুমি? ঐটুকু ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে লাইনে বেরোবে কি!"

"আলবাৎ বেরোবে।—" তারপর গোপালের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিরে পারবিনে তুই?"

"হুঁ—" গোপাল একপাশে মাথা হেলিয়ে সায় দিয়েছিল। আসলে অভি-লাষের কথা শুনেই একটা আনন্দের হিল্লোল খেলে গিয়েছিল গোপালের মনে। তার শিশু কল্পনায় মনে হয় সারাদিন ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে বেড়ান, কাঁধে ঝোলাঝুলি, ট্রেনের যাত্রীদের কাছে এটা সেটা বিক্রী করা—এর মত রোমাঞ্চকর সুখ আর আনন্দের কাজ আর দ্বিতীয় নেই। এই রোজ রোজ স্কুলে যাওয়া পড়া মুখস্থ করা, পড়া বলতে ভুল হলে মাষ্টারদের চোখ রাঙানি—একঘেয়ে জীবনের বাইরে সে যেন এক মুক্ত জীবন। ট্রেনে চেপে চলে যাও দূর দূরান্তের ষ্টেশনে ষ্টেশনে, ফেরৎ ট্রেন ধরে ফের ফিরে এস। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ আপ ডাউন কোন দিকেই কোন ট্রেন না থাকলে কোন নির্জন অচেনা ছোট ষ্টেশনের ছায়াঘেরা শেডের তলায় বসে বসে দূরে লাইন যেখানে বেঁকে গেছে সেদিকে তাকিয়ে থাকা, অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলে দেখা যায় থির থির করে কেমন রোদ কাঁপছে—। এসব ভাবতেই গোপালের বুকের ভিতরটা শির শির করে ওঠে।

গোবিন্দ যখন হকারি করতে না চেয়ে বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটি ঝগড়া করত গোপালের তখন মনে হত দাদাটা ভারী বোকা। এতবড় একটা মজার কাজ হাতে পেয়ে ও করতে চাইছে না। তাকে কেন বলে না অভিলাষ! বললেই সে তার বই-পত্র রেখে একছুটে চলে যায় ষ্টেশনে, উঠে পড়ে প্রথম ট্রেনটাতেই, তার কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা হাতব্যাগ, কামরা ভর্তি মানুষজনের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে সে বলছে, "এইযে দাদারা। আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এক

আশ্চর্য জিনিষ। জীবনে আপনারা অনেক কিছু দেখেছেন শুনেছেন, তবু বুক ঠুকে বলতে পারি আজ যা এনেছি আপনাদের জন্য—"

সিগন্যালের রক্ত চক্ষু প্রসন্ন সবুজ হয়ে যেতেই এধারে ওধারে ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য হকাররা কাছাকাছি হয়ে প্লাটফর্মের ধারে চলে এল। গোপাল দুচোখে অথৈ বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগল তাদেরকে। সকলের সঙ্গেই রয়েছে তাদের পশরা। চিনেবাদাম, চানাচুর, ধূপকাঠি, ঝালমুড়ি, লজেন্সই রয়েছে চার পাঁচ-জনের কাছে, চিরুণী, সেফটিপিন, ফাউন্টেন পেন—কি না বিক্রী হয় ট্রেনে। দাদের মলম, দাঁতের মাজন, ভাস্কর লবন, হাত কাটা তেল আরো হরেক রকমের চিজ।

গোপালকেও তাকিয়ে দেখছিল অনেকে। জনা কয়েক একেবারে কাছে চলে এসে হেসে জিজ্ঞেস করল, "কি অভিলাষ দা। ছেলেকেও নামিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত ?"

"হ্যাঁ ভাই। একা একা আর টানতে পারছিনে। একটা ঠেকনো না হলে চলছে না আর।"

"আজকেই প্রথম ?"

"হ্যাঁ। লক্ষীবার ভাল দিন দেখে লাগিয়ে দিলাম।"

একজন বলল, "অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে নামটা লিখিয়ে দিয়েছ ত ?"

অভিলাষ বলল, "লেখাইনি এখনো। আমারই ছেলে ত। ও কি আর আটকে থাকবে।"

বলতে বলতেই হুড়মুড়িয়ে ট্রেন এসে পড়ল। অনেকক্ষণ কোন ট্রেন ছিল না। ফলে খুব ভিড়। প্রত্যেক কামরা থেকে উপচে ওঠা মানুষ হ্যাণ্ডেল ধরে বাইরে ঝুলছে। গোপাল ভয়ে ভয়ে বলল, "ও বাবা। বড্ড ভিড় যে—"

"এই দেখ। বোকা ছেলে—" সস্নেহে বলল অভিলাষ, "ভিড়ই ত চাই আমাদের। যত ভিড় হবে ততই মালের কাটতি হবে। নে নে। উঠে পড়—"

ভিড় কাটিয়ে অভ্যস্ত কৌশলে সামনের কামরার দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল অভিলাষ, পিছনে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল গোপালকে। গোপালের বগলে কাচের বয়ম, চারপাশে লম্বা লম্বা মানুষগুলো গাছের মত উঠে গেছে উপরে। অন্ধকার ঠাসাঠাসি ঘাম দুর্গন্ধ—। যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল গোপালের।

কামরার অনেকটা ভিতরে ঢুকে গিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল। গোপালের হাত ছেড়ে দিয়ে অভিলাষ বলল, "নে। ধর—"

ধরবে কি, গোপালের এখন গলা শুকিয়ে কাঠ, মুখের মধ্যে জিভটা সম্পূর্ণ অসার, দুদিন ধরে মুখস্থ করা মহলা দেয়া ছোট সুন্দর বক্তৃতাটি স্মৃতি থেকে একেবারে লোপাট। সে অসহায় ভয় ভয় চোখে অভিলাষের দিকে তাকিয়ে রইল।

অভিলাষ ফিস ফিস করে মুখ ঝামটা দিল; "হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিস কি। সুরু কর—"

ঠোঁট নাড়ল গোপাল, কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না। গরমে ক্লান্তিতে জীর্ণ হয়ে যাওয়া যাত্রীরা মড়া ছাগলের চোখের মত নিরুত্তাপ নিস্পৃহ চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে গোপালের দিকে। কারো কোন আগ্রহ নেই তার সম্পর্কে, কেন এসেছে সে কি বেচতে চায় তাও জানতে চায় না কেউ। তবু যেন গোপালের মনে হচ্ছিল এতগুলো বিরুদ্ধ মানুষের সামনা সামনি এর আগে কোনোদিন সে হয় নি।

"দে। আমায় দে—" রাগত ভাবে হ্যাঁচকা টানে লজেন্সের বয়মটা গোপালের হাত থেকে নিয়ে নিল অভিলাষ, তারপর অভ্যস্ত সাধা গলায় সুরু করল," "ভদ্র-মহোদয়গণ। আপনাদের কাছে কটা কথা বলতে এসেছিলাম। যেদিন থেকে লাইনে ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হল সেদিন থেকেই আপনাদের একটা বিশেষ অসুবিধে পোহাতে হচ্ছে। অসুবিধেটা হল ট্রেনে পানীয় জলের কোনো বন্দোবস্ত নেই। অথচ আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দীর্ঘ ট্রেন জার্নিতে পানীয় জল অতি আবশ্যক। আপনারা যারা এই মুহূর্তে প্রচণ্ড গরমে জলতৃষ্ণায় কাতর তাদের জলতৃষ্ণা নিবারণের একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি বলে দাবী করছি। আমার সঙ্গে এই যে কমলালেবু লজেন্সগুলো দেখছেন এগুলো জলতৃষ্ণা নিবারণে বিশেষ কার্যকরী। স্বাদে-গন্ধে আসল কমলালেবুর মত, এর একটি কোয়া মুখে ফেললেই সব অবসাদ গ্লানি প্রবল জলতৃষ্ণা নিমেষে দূর হয়ে গিয়ে আপনার শরীর মন চাঙ্গা ও ঝরঝরে হয়ে উঠবে। যাতে সকলেই সংগ্রহ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এর দাম ও বেশী করা হয় নি। একটি পাঁচ, তিনটি একত্রে দশ, ডজন চল্লিশ পয়সা। এখন আপনাদের ডজন ডজন নিতে বলছি না, একটি বা তিনটি সংগ্রহ করুন। যদি ভাল লাগে মন চায় পরে অধিক পরিমানে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমাকেই

আপনারা খুঁজে বেড়াবেন। আসুন, কাকে দেব কমলালেবু লজেন্স, জলতৃষ্ণা নিবারক। একটি পাঁচ, একত্রে তিনটি দশ পয়সা—"

বক্তৃতার শেষের দিকেই যাত্রীদের মধ্যে অল্প নড়াচড়া দেখা গিয়েছিল। কেউ কেউ হাত বাড়িয়ে দশ পয়সার করে লজেন্স কিনল। বিক্রী হল মন্দ নয়। এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ঐ জলতৃষ্ণা নিবারণের প্রতিশ্রুতি কাজ করল খানিকটা। মনে মনে হাকল অভিলাষ। একেই বলে হকারি। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতাটাও পালটাতে হয়, মানুষের মন বুঝে ছাড়তে হয় নতুন নতুন কথা। নইলে টিয়াপাখির মত একই বুকনি বার বার আউড়ে গেলে কি যাত্রীরা ভোলে কখনও!

গাড়ির গতি ধীর হয়ে আসছিল। অর্থাৎ সামনে ষ্টেশন। অভিলাষ তাড়া দিল, "নে—চল চল। পরের ষ্টেশনে কামরা বদলাতে হবে।"

আবার সেই ভিড় ঠেলে দরজার মুখে আসা। গাড়ি যখন প্লাটফর্মে ঢুকছে হঠাৎ গোপাল বলল, "এবারে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও বাবা। আমি ঠিক পারব"

অবজ্ঞাভরে ছেলেকে দেখল অভিলাষ, "ধুস। তোর মুখে বলে কথাই ফোটে না।"

"না বাবা। তুমি না থাকলেই পারব। তোমার সামনে পারি না—"

অভিলাষের দুচোখে বিস্ময় ঘন হয়ে উঠল, "কেন রে?"

"তুমি থাকলে আমার ভারী লজ্জা করে।"

সামান্য দ্বিধার পর অভিলাষ গোপালকে একা ছেড়ে দিয়েছিল, "দেখিস বাবা। সাবধানে কাজ করিস। চলন্ত গাড়িতে ওঠানামা করিস নে।"

অভিলাষ চলে গেলে চকিতের জন্য গোপালের মনে হয়েছিল তার চারপাশে জগৎটা যেন হঠাৎ খুব বড় আর বিশাল হয়ে গেল। এত বড় যে সে যেন এর কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু সে অনুভূতিটা খুবই সাময়িক। পলকের মধ্যে সে আবার তার হারানো আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠল গোপাল। যে কাজ করতে চেয়েছে সে এতদিন, যে কাজকে মনে হয়েছে পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাল সেই কাজ করতে পারার সুযোগ এসেছে আজ। বগলের মধ্যে লজেন্সের বয়মটাকে সজোরে আঁকড়ে গোপাল ভিড়ে ঠাসা কামরাটার মধ্যে গলে গেল ঠেলে ঠুলে।

প্রথমে সামান্য সংকোচ, মিহি গলারস্বর কেঁপে যেতে লাগল, দুখানা বেঞ্চির পরের লোকও তার মুখস্থ বক্তৃতার প্রথম গোটা দুই বাক্য ঠিকঠাক শুনতে পেল না। কিন্তু বলতে বলতেই সাবলীল হয়ে উঠল গোপাল। তার চিকন কণ্ঠস্বর ক্রমেই বাঁশীর সুরের মত চাঁছা হয়ে উঠল। একটু পরেই কামরার তাবৎ যাত্রী দুচোখে বিস্ময় আর কৌতুহল নিয়ে এই সদ্য কিশোর কিন্তু সপ্রতিভ ফেরিওয়ালাটির দিকে তাকিয়ে রইল। গোপালের কথা বলার ভঙ্গী হাতনাড়া কণ্ঠস্বরের ওঠানামা সব দেখে শুনে মনে হচ্ছিল সে যেন এক পাকা ফেরিওয়ালা, বহুদিন ধরে রত এই ব্যবসায়ে।

অনেকেই কিনল লজেন্স। প্রায় সকলেই দশ পয়সায় তিনটে করে। যারা কিনল হয়ত তাদের মনে লজেন্স খাওয়ার বাসনার চেয়ে বেশী ছিল এই সুদর্শন বালকটির প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা। যার পায়ে হাওয়াই স্যাণ্ডেল, হাফপ্যান্টের ভিতর গুঁজে দেওয়া সার্ট, কপালে শ্বেতচন্দনের টিপ, যার মা বেরুনোর আগে বাঁহাতে চিবুক ধরে ডানহাতে চিরুনি দিয়ে পরিপাটি আঁচড়ে দিয়েছে মাথার চুল—এই বালকটির চেহারায় এক ধরনের লাবন্য আর লালিত্য মাখান, মুখে অপার সরলতা, দুচোখের দৃষ্টি নিষ্পাপ, যা আর কয়েকদিন পরেই ভোরের শিশিরের মত উপে যাবে, কারন জীবন অতি কঠিন ও নির্মম, সংঘর্ষ আর সংঘাতের মাধ্যমে সব কিছুকেই কঠিন রুক্ষ আর ঘা-সহ করে নেয় প্রথমে—।

দুএকজন অতি নরম প্রকৃতির যাত্রী গোপালকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম কি খোকা?"

"গোপাল। গোপালচন্দ্র দাস।"

"কতদিন নেমেছ এই লাইনে?"

"আজকেই।"

অনেকেই অবাক হল; "আজকেই? আজকেই প্রথম.."

উপরে নীচে মাথা নাড়ল গোপাল।

"এই বয়সেই এই লাইনে কেন?"

গোপাল চুপ করে রইল।

"স্কুলে পড় না?"

"পড়তাম বাবা ছাড়িয়ে দিয়েছে।"

যাত্রীদের চোখেমুখে আবার বিস্ময়, "কেন?"

গোপাল বলল, "বাবার একার আয়ে সংসার চলে না ত, তাই—"

"কি করেন তোমার বাবা ?"

বাবাও এই লাইনে হকারি করে।"

গোপালের এই কথায় কামরার যাত্রীদের মধ্যে একধরণের একটা গুঞ্জন দেখা দিল। যে যার পার্শ্ববর্ত্তী যাত্রীর সঙ্গে দেশের বর্তমান দুরবস্থা, অর্থনৈতিক অসাম্য, সামাজিক অবিচার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় গভীরভাবে মগ্ন হয়ে গেল। সকলে গোপালের প্রতি সদয় সহানুভূতিশীল কিন্তু গোপালত মাত্র একজন নয় একক ব্যাতিক্রমের মত। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এমনি অজস্র গোপাল যারা অকালেই নামতে বাধ্য হচ্ছে কঠিন জীবন সংগ্রামে, নির্মমভাবে বঞ্চিত হচ্ছে বয়সোচিত প্রাপ্য থেকে, শিক্ষা থেকে, উপযুক্ত আহার ও পুষ্টি থেকে। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য একটা সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালান দরকার। হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে, নয় সশস্ত্র বিপ্লবই হল একমাত্র পন্থা। যাত্রীদের মধ্যে এ বিষয়ে মত পার্থক্য দেখা দিল ফলে আবহাওয়া কিঞ্চিত উষ্ণ হয়ে উঠল। গুঞ্জন থেকে তর্কাতর্কিটা ক্রমে হাতাহাতিতে পর্যবসিত হয়েছিল কিনা গোপাল জানে না, কেননা তার আগেই পরবর্ত্তী ষ্টেশনে এসে যাওয়ায় সে কামরা থেকে নেমে গিয়েছিল।

ক্রমেই আপন সাফল্যে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল গোপাল। এ যেন লজেন্স ফিরির ছলে এক ধরণের খেলা। নিজের খেয়াল খুশীমত যতক্ষণ ইচ্ছে এই খেলা খেলা যায়। কেউ নিষেধ করার নেই শাসন করার নেই। উঠে পড় যে কোনো একটা ট্রেনে ষ্টেশনে ষ্টেশনে কামরা পালটাও, একটু গলা ছেড়ে হাঁকলেই কিছু না কিছু বিক্রি—কাজটা খুব ভাল লাগছিল গোপালের। বগল থেকে বার করে এনে লজেন্স ভর্ত্তি বয়মটা চোখের সামনে ধরে পরখ করে দেখল সে। যতই বয়মটা খালি হয়ে আসছে ততই তার কোমড়ের কাছে বাঁধা ছোট্ট থলিটা ভারী হয়ে উঠছে খুচরো পয়সায়। মোটামুটি হিসেব করে দেখল গোপাল ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই সে প্রায় টাকা তিনেকের বিক্রি করে ফেলেছে। এতে কত কত লাভ হয়েছে জানে না গোপাল, কারন লাভ লোকসানের হিসেব খতানর দায়িত্ব অভিলাষের, সে শুধু বিক্রির সব পয়সা তুলে দেবে অভিলাষের হাতে।

নিজের মধ্যেই মগ্ন ছিল গোপাল, ফলে লক্ষ্য করে নি কখন থেকে যেন গোটা তিনেক ছেলে, সব কজনই ওর থেকে বড়, তার পিছন নিয়েছে। তাদের চেহারা পোড় খাওয়া চোয়ারে, দুজনের পরনে এখনও হাফপ্যান্ট আর একজনের ছিটের পাৎলুন। ওদের হাতেও লজেন্সের বয়ম। কিন্তু ওরা কেউই ফিরি করছে না

লজেন্স, শুধু কামরা থেকে কামরায় গোপালকে অনুসরন করে যাচ্ছে ছায়ার মত, আর মধ্যে মধ্যে তিনজনের চোখে চোখে ইসারার বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। গোপাল এসব কিছুই দেখে নি। দেখার কথাও নয়, কারণ তার নিষ্কলুষ শিশু কল্পনা তাকে অজ্ঞ ও অন্ধ করে রেখেছিল—

দুপুর দুটো নাগাত ছোট আর নির্জন একটা ষ্টেশনে গোপাল ট্রেন থেকে নামল। এই ট্রেনের আগুপিছু প্রায় সব কামরাগুলোই তার ঘোরা হয়ে গেছে। সুতরাং আর এগিয়ে গিয়ে লাভ নেই। অপরিচিত শান্ত নিরীহ ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ট্রেনটাকে ষ্টেশনে ছেড়ে চলে যেতে দেখল, তারপর হিসেব করতে লাগল এর পরে ফের কখন ট্রেন আছে।

হিসেব করতে গিয়ে একটু মুস্কিলে পড়ল গোপাল। মুখস্থ টাইম টেবল মনে মনে আউড়ে দেখল প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আপ ডাউন কোনো দিকেই কোনো গাড়ি নেই। অর্থাৎ এখন প্রায় ঘণ্টাখানেক তাকে এই জনহীন ছোট ষ্টেশনটিতে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। এখন বুঝতে পারল গোপাল কেন শেষের দিকে ঐ ছেড়ে যাওয়া ট্রেনে হকারের কোনো ভিড় ছিল না। অস্পষ্টভাবে এই প্রথম গোপাল অভিজ্ঞতার মর্ম বুঝল।

অগত্যা গোপাল, লজেন্সের বয়ম বগলে, মন্থর পায়ে শেডের তলে স্বল্পপরিসর ছায়াটুকুর দিকে এগোতে লাগল। ধারে কাছে লোকজন নেই কোনো, শুধু একটা নেড়ি কুত্তা দুদিকে পা টান করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। শেডের তলে গোটা দুই প্রাচীন কাঠের বেঞ্চি পড়ে আছে ভাঙ্গাচোরা অবস্থায়। কাছাকাছি গিয়ে সে দেখতে পেল একটা মানুষ, পরনে ঘন নীল রঙের হাফ সার্ট আর হাফ প্যান্ট, একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রয়েছে। ঘুমোচ্ছে সেও।

ঠিক এই সময় সেই তিনজন যেন শূন্য থেকে অবয়ব ধারন করে গোপালকে ঘিরে ফেলল। এতক্ষণ ওরা অদূরস্থ টিনের গুদাম ঘরটার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ত্রস্ত চোখে গোপাল তাকিয়ে দেখল ওদের তিনজনের চোখেই ঘৃণা রাগ নৃশংসতা।

পাৎলুন পরা বড় ছেলেটা কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করল, "এই। তোর নাম কি ?"

ভয়ে ভয়ে গোপাল বলল, "গোপাল।"

"ই—স্। গোপাল !—" ভেংচে উঠল ছেলেটা, "তা গোপাল ত হকারি করতে এয়েছিস কেন ? শালা বেন্দাবনে গিয়ে বাঁশী বাজিয়ে মামির সঙ্গে কেলি করগে যা না।"

গোপাল দেখল ক্রমেই ঘেরটা ছোট হয়ে আসছে আর ওরা তিনজন এগিয়ে

আসছে কাছে। ওদের হাতের মুঠোগুলো যেন একটা অসুখের আক্ষেপে খালি খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, ঠোঁট দুটো গুটিয়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কষের দাঁতগুলো পর্যন্ত।

হঠাৎ গোপাল কি করছে না বুঝেই প্রান বাঁচানর তাগিদে দুজনের মাঝখান দিয়ে গলে গিয়ে একটা পলাতক খরগোসের মত খুব দ্রুত ছুটতে লাগল প্লাটফর্মের উপর দিয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ডালকুত্তার মত লম্বা লম্বা পায়ে পশ্চাদ্ধাবন করল ওরা গোপাল অনেক ছোট, তার বগলে লজেন্সের বয়ম—সে একটু ছুটেই হাঁফিয়ে পড়ল, আড় চোখে তাকিয়ে দেখল ওরা এর মধ্যেই প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। কি করবে দিশা না পেয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেলল সে।

গোপাল প্লাটফর্মের ধার ঘেঁষে ছুটছিল। পিছন থেকে বাড়ান একখানা লম্বা পা ওর দু পায়ের মধ্যে আটকে গেল আর ছুটন্ত গোপাল হঠাৎ লাফিয়ে উঠে একটা তীরের মত গোত্তা খেয়ে গিয়ে পড়ল লাইনের উপর। বগল থেকে লজেন্সের বয়মটা ছিটকে গেল। লাইনের লোহার উপর পড়ে ঠন ঠনাৎ শব্দ করে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বয়মটা আর লজেন্সগুলো ছড়িয়ে গেল দু লাইনের ভিতরে বাইরে। লাইনের পাথরের উপর পড়ে গোপালের দুটো হাঁটুই ছড়ে গেল আর কপাল কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেল মুখ। দুই কনুইএর উপর শরীর তুলে মুখ ঘুরিয়ে সে তার আততায়ীদের দেখতে চাইল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না কেন না কপাল থেকে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরে পড়ে তার চোখের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে ওরা তিনজনই টপাটপ লাইনের উপর লাফিয়ে নেমেছে। প্রায় অন্ধ গোপাল যখন কোনো রকমে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে বসেছে ওরা একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ল তার উপর। এবারে গোপাল চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল এবং ওরা তিনজনই চেপে বসল তার বুকের উপর। তারপর সুরু হল অজস্র কিল আর ঘুষি। বৃষ্টির ধারার মত। এতক্ষণে একজনের মুখ থেকে কথা শোনা গেল, "শালা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। সকাল থেকে এক পয়সা বিক্রি নেই। সব টেনে নিচ্ছে একা। আমাদের রুটিতে হাত দিতে এয়েছ শালা। হাত যদি ভেঙ্গে না দিয়েছি ত—"

প্রহারে জর্জরিত গোপালের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তার কবুতরের মত ছোট বুকটুকুতে তিন তিনটে মানুষের ভার বহনের সামর্থ ছিল না। চোখের সামনে একটা অন্ধকার ভারী কালো পর্দা কেবল সামনে পিছনে দুলতে লাগল, ঝিমঝিম করে উঠল মাথার মধ্যে। এর মধ্যেই সে অনুভব করল একখানা শক্ত রুক্ষ হাত তার কোমরের সঙ্গে আঁট করে বাঁধা গেঁজেটাকে নিয়ে টানাটানি করছে। ওর

মধ্যেই রয়েছে তার সারাদিনের বিক্রি বাবদ একরাশ খুচরো পয়সা। কষ্টে যন্ত্রণায় অস্থির আত্মরক্ষার তাগিদে বলীয়ান ছোট্ট গোপাল তখন নিজের ক্ষীণ শরীরটুকুর মধ্যে অসুরের শক্তি অনুভব করল। হঠাৎ সে চিৎ অবস্থা থেকে পাশ ফিরতে চেয়ে দুমড়ে ফেলল শরীরটাকে আর বুকের উপর চেপে ধরে বসে থাকা ছেলে তিনটে বেমক্কা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লাইনের পাথরের উপর। চকিতে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল গোপাল, ভাবল আবার ছুটবে লাইন ধরে জোরে। কিন্তু তার আগেই আবছা ভাবে দেখতে পেল সেই ছেলে তিনটে আবার তার দিকে ছুটে আসছে, একজন নীচু হয়ে লাইন থেকে একখণ্ড পাথর তুলে নিল হাতে। তখন হতবুদ্ধি মরিয়া গোপালের মুখ দিয়ে শুধু একটা চিৎকার বিকট আর্তনাদ হয়ে বেরিয়ে এল "আ—আ—আ আ—আ" সেই চীৎকার যেন সামনে পিছনে ছুটে যাওয়া এক জোড়া ইস্পাতের লাইন ও মাথার উপরে সমানে টানা বিদ্যুতের তার বেয়ে বেয়ে চকিতে ছড়িয়ে পড়ল কাছে দূরে সর্বত্র।

হঠাৎ প্লাটফর্মের উপর থেকে ভেসে আসা একটা পরুষ রুক্ষ কণ্ঠস্বরে সকলেই একসঙ্গে চমকে উঠল, "এ্যাও। কাহে সোর মচাতা। কেয়া হোগিয়া ইধার ?"

সকলে একসঙ্গে তাকিয়ে দেখল প্লাটফর্মের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সেই মানুষটা যে বেঞ্চিতে শুয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পরণে নীলরঙের হাফ প্যাণ্ট আর হাফ সার্ট, বলিষ্ঠ পুরুষালি চেহারা।

নীল পোষাকধারী একনজর তাকিয়েই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। হেঁড়ে গলায় বলল, "আরে এ ভুতিয়া কে বাপ ! তিন আদমি মিলঝুল কর এক লৌণ্ডে কো মারতা। শরম নাহি তুমহারা—"

প্রখর রৌদ্রে যেন এক টুকরো ছায়ার সন্ধান পেল গোপাল। সে একদৌড়ে চলে এল লোকটার পায়ের কাছে, উপর দিকে মুখ তুলে কাতর নয়নে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এক পলক দেখেই লোকটা নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে গোপালের বাহু দুটো ধরে শূন্যে দুলিয়ে তাকে প্লাটফর্মের উপর তুলে নিল, "ডরো মৎ বেটা। আভি তুমকো কই মারনে নেহি সেকেগা—" তারপর লোকটা ছেলে তিনটের উদ্দেশ্যে হেঁকে উঠল, "ভাগ যাও, আভি ভাগ যাও ইধার সে। ফিন দেখেগা ত হাড্ডি তোর দেগা তুমকো শালা লোগ—"

ইতিমধ্যেই ছেলে তিনটি গুটি গুটি পেছিয়ে যাচ্ছিল।

লোকটা রেলেরই কর্মচারী। সে গোপালকে ষ্টেশনের সঞ্চিত জলাধারের কাছে নিয়ে গেল, "আরি ব্বাস। শালা লোগ বহুৎ মারা তুমকো। কাহে মারা ?"

গোপাল কারণ জানে না।

"তুম পছান্তা উস লোগ কো ?"

গোপাল চেনেও না কাউকে।

"তুম ইধার আয়া কেইসে ?"

গোপাল বলল। লজেন্স ফিরি করতে করতে চলে এসেছে এতদূর। ওরাও লজেন্স ফিরি করে লাইনে। আজকেই তার প্রথম। কাজেই কাউকেই চেনে না সে।

সব শুনে লোকটা গম্ভীরভাবে বলল, "আভি সমঝা। তুম উসকো রোটিকা হিস্সাদার বন গিয়া না, ইস লিয়ে উসকো গোসা আ গিয়া।"

সে যত্নে ও নিপুন হাতে গোপালের কাটা জায়গাগুলো ধুয়ে পরিস্কার করে দিল। এতক্ষণে ব্যথা বোধটা ফিরে এল গোপালের। জল লেগে কাটা জায়গা-গুলো কন কন করতে লাগল। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর থেকে তুলো ব্যাণ্ডেজ আর ডেটলের শিশি নিয়ে এল লোকটা। যন্ত্রনায় গোপালের চোখে জল এসে গিয়েছিল। লোকটা বলল, "রোও মৎ বেটা। দাবাই লাগা দিয়া যায় ত সব ঠিক হো যায়—"

খুব সাবধানে আর সযত্নে সে গোপালের ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলোতে ডেটল লাগিয়ে দিল, তারপর তুলো দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল ফেট্টির মত জড়িয়ে। গোপাল শিউরে শিউরে উঠছিল, তাই তাকে অন্যমনস্ক করার জন্য লোকটা বলল, "তুম ইতনা ছোটা লৌণ্ডা হ্যায়। লিখা পড়া কা কাম নেহি করতা ? ইস্কুল নেহি যাতা ?"

স্কুলে যেত গোপাল। এই কাজের জন্য স্কুল ছেড়ে দিয়েছে।

"মেরা বাৎ শুনো বেটা। ইয়ে কাম আভি তুমহারা লিয়ে নেহি। ছোড় দেও এহি কাম। ইস্কুল মে লৌট যাও। পড়া লিখা শিখ লেও আউর বন যাও কই জজ মাজিষ্টর—"

তখন গোপালের চোখের সামনে চলচ্ছবির মত ফুটে উঠেছিল তার ছেড়ে আসা স্কুলের বিভিন্ন দৃশ্য। সারি সারি বেঞ্চিতে পর পর বসে আছে ছেলেরা, উঁচু পাটাতনের উপর মাষ্টারের চেয়ার টেবিল। চেয়ারে বসে ভূগোলের স্যার বুড়ো বনমালী বাবু ঢুলছেন, আর ছেলেরা নিজেদের মধ্যে খাতা লেনদেন করে কাটাকুটি খেলে যাচ্ছে, ফিস ফাস করে হাসা-হাসি, দুরন্ত ছেলে দয়াল চুপি সারে উঠে গিয়ে ব্লাকবোর্ডে চক দিয়ে একটা রাক্ষসের ছবি এঁকে তলায় লিখে দিয়েছে

—ভূগোল স্যার। তারপরই ড্রিলের ক্লাস। ড্রিল স্যার সুধাংশুবাবু সবাইকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে স্কুলের সামনের ছোট মাঠটুকুতে। আরাম প্রস্তুত আরাম প্রস্তুত সামনে চল এক দুই এক দুই এক—, তালে তালে পা ফেলে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়া, বাঁয়ে ঘোরো এক দুই এক দুই এক—দয়াল বসে পড়েছে ধুলোর উপর, বড্ড পেট কামড়াচ্ছে স্যার ইটটু বাইরে যাব স্যার—

গোপালের ছোট বুকটুকু কাঁপিয়ে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বাইরে বেরিয়ে এল।

নীল পোষাকধারী লোকটা গোপালকে টেনে তুলে দিল ; "সিধা ঘর চলা যাও বেটা। আউর মান লেও হামারা বাৎ। ওয়াপস্ যাও ইস্কুল মে। ইয়াদ রাখো কি পড়া লিখা কা কিস্মৎ কভি না কমতি হোতা—"

অভিলাষ গোপালকে খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে যাচ্ছিল। কোথায় যে হারিয়ে গেল ছেলেটা কে জানে। প্রথম দিকে খানিকক্ষণ নজরে রেখেছিল, আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখছিল গোপালের ওঠা নামা বিক্রিবাটার দিকে। দেখে বেশ খুশীও হয়েছিল তার কাজ কর্মে সপ্রতিভতায় তৎপরতায়। তারপর একসময় নিজের ব্যবসার ধান্ধায় অভিলাষ আর নজর রাখতে পারে নি গোপালের দিকে, আর সেই ফাঁকে গোপাল যেন বেমালুম কর্পুরের মত উবে গেল। মনে মনে চিন্তিত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল অভিলাষ, প্রমদার অসন্তুষ্ট মুখখানা চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছিল। ভগবান না করুন, যদি ভাল মন্দ তেমন কিছু হয়ে যায় গোপালের প্রমদার সামনে গিয়ে কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবে ভেবে দিশা পাচ্ছিল না সে।

অবশেষে গোপালকে দেখতে পেল অভিলাষ নিজেদের ষ্টেশনেই। ষ্টেশনের শেষ প্রান্তে যে বকুল গাছটা তার তলায় বাঁধান চাতালে সে বসে আছে চুপচাপ অন্যমনস্কভাবে। কাছাকাছি হতেই দারুণ চমকে উঠল অভিলাষ। গোপালের কপালে দুই হাঁটুতে ফেট্টি বাঁধা, বা কনুইতেও তুলো লাগান। এক দৌড়ে গোপালের কাছে পৌঁছে গেল অভিলাষ, ব্যাকুল উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল, "কি, কি হয়েছে রে গোপাল ?"

বাপকে দেখে গোপালের চোখে মুখে কোন ভাবান্তর হল না। নির্লিপ্ত স্বরে বলল,—"আমায় মেরেছে—"

"কে ? কে মেরেছে ?"

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন হকার জুটে গেছে চারপাশে। সকলেরই চোখে মুখে কৌতুহল। সকলেই অভিলাষের প্রশ্নটাকে পুনরাবৃত্তি করল। কে মেরেছে ?

গোপাল নাম বলতে পারল না। শুধু চেহারার বর্ণনা দিল। আর বলল তারাও লজেন্স ফিরি করে। সব শুনে দাঁতের মাজনের নিমাই বলল, "এ নিশ্চয়ই ন্যাপলার কাজ। ছোঁড়াটা বড্ড মারকুটে—"

দাঁতে দাঁত চেপে অভিলাষ বলল, "এর একটা বিহিত করতেই হবে"

হঠাৎ ঝাল মুড়ি কেষ্ট বলল, "কিন্তু অভিলাষ দা এর ত বিহিত হবে না—"

"কেন ?"

"তুমি ত ইউনিয়ন অফিসে ছেলের নাম লেখাওনি এখনও।"

অভিলাষ রেগে উঠল, "লেখাইনি ত লেখাইনি। তাই বলে আমার ছেলের গায়ে হাত—"

তর্ক জুড়ে দিল কেষ্টও, "তোমার ছেলে ত কি ! লাট সাহেবের নাতি নাকি ?"

ব্যস। বচসা বেঁধে গেল জোর। একদল অভিলাষের পক্ষে দাঁড়াল। ঐ টুকু ছেলে বিশেষতঃ সে যখন আমাদের দলের একজনেরই ছেলে তাকে অমন নির্মমভাবে মারাটা কোনো রকমেই মেনে নেয়া যায় না। অপর দলের মুখপাত্র কেষ্ট। তাদের বক্তব্য কেউ যদি বেমক্কা এসে লাইনে ভিড়ে যেতে চায় তাহলে তাকে হটাতেই হবে। দরকার হলে মারধোর করে ও। তা সে যেই হোক আর যার ছেলেই হোক না—

হয়ত আর একটা মারামারি বেঁধে যেত এখানেও। কিন্তু এর মধ্যে গাড়ি এসে যেতেই জড়ো হওয়া হকাররা যে যার পসরা নিয়ে ট্রেনে উঠে গেল। ট্রেন ছেড়ে যেতেই ষ্টেশন একেবারে জনশূন্য।

অভিলাষ ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখল গোপালের দুচোখে জল ভরে উঠেছে। টসটস করে ঝরে ঝরে পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে বুকের কাছে জামা। নরম গলায় অভিলাষ বলল, "কি হয়েছে রে গোপাল ? কাঁদছিস কেন ?"

পাশাপাশি মাথা ঝাঁকাল গোপাল। অস্ফুটে বলল, "কিছু না।"

অভিলাষ একটু চুপ করে রইল। গোপাল কেঁদেই যাচ্ছে। আবার নরম গলায় অভিলাষ বলল, "কষ্ট হচ্ছে খুব ? কাটা জায়গায় যন্ত্রনা হচ্ছে ?"

ফের পাশাপাশি মাথা ঝাঁকাল গোপাল। না। জলে ভরা দুচোখ তুলে বাপকে দেখল সে। তারপর কান্না জড়ান গলায় ফিসফিস করে বলল, "স্কুলের জন্য আমার ভী-ষণ মন কেমন করছে।"

—০—

প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে ক্ষণকাল

সত্যেন্দ্র আচার্য

অতনুকে পেয়ে যেন একেবারে স্বর্গের চাঁদ হাতে পেল সর্বনাথ। অতনু বেরোবে বলে তৈরী হচ্ছিল। অবাক গলায় বলল, তুই ?

সর্বনাথ শব্দ না করে হাসল। অতনু ঘুরে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল। হাত বাড়িয়ে সর্বনাথের দিকে আরেকটু এগিয়ে এসে বলল, এমন অসময়ে ? সর্বনাথ ধপাস করে প্রথমে বিছানার ওপর বসল, পরে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, যা বাব্বা, অত কথার একসঙ্গে জবাব দেব কি করে ? চোখের ইঙ্গিতে বসতে বলল প্রথমে, তারপর শব্দ করে বলল, আরে বস না ?

কেমন হকচকিয়ে অতনু সর্বনাথকে দেখছিল। সর্বনাথ পর পর তিন তিনটে কাঠি খরচ করে তবে সিগারেট ধরাল। ঘড়ি দেখল। সিগারেট থেকে খানিকটা ধোঁয়া গলার ভেতর চালান করে দিয়ে বলল, তোকে হঠাৎ মনে পড়ল।

ব্বা ! অতনু জিভটা ঠোঁটের কাছে এনে শব্দ করল একটা। মনে পড়ল ?

সর্বনাথ সিগারেটের ধোঁয়া এবার বাইরের হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে বলল, খুব বাজে বাজে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে অতনু।

তবু তো কাটছে তোর, আমার তো কাটছেই না। বাপধন আবার বিলেত পাঠাবে বলছে। বলছি, তাড়াতাড়ি কর বাবা। কিন্তু মুখেই। দুর শালা, এদেশের জল হাওয়ায় পেটে এ্যামিবা ধরে গেল। শিবানন্দটা তবু একটা চাকরী পেয়ে গেল। জাহাজে জাহাজে ঘুরছে। মন্দ কি ! মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সুমিতাকে মনে পড়ে। অতনু এবার একটা বড় করে নিঃশ্বাস নিল।

একটা সমস্যায় পড়েছি। সর্বনাথ এবার ছড়ানো দেহটা বিছানার ওপর থেকে তুলে সোজা হয়ে বসল। সমাধানের জন্য তোর কাছে এলাম।

অতনু বড় বড় চোখ করে তাকাল। ওসব দার্শনিক তত্বটত্ব আমার জন্যে নয়। সমস্যার সমাধান-টমাধান চাওতো বাপধনকে ডেকে দিচ্ছি। সারাদিন ধরে বোঝাবেখন। জান কয়লা করে ছাড়বে। তার চেয়ে চল মাল খেয়ে আসি।

এবারে নিজে একটা সিগারেট ধরাল। ঘাড় ফিরিয়ে নিচু গলায় বলল, নতুন কোন মালটালের খবর আছে ?

তবু কোন কথা বলল না সর্বনাথ।

প্রেম ট্রেম করছ নাকি ? অতনু আলতো ধাক্কা দিল সর্বনাথের কাঁধে। কেমন যেন হিসেবের বাইরে চলে যাচ্ছ আজকাল।

কী মনে হয় ? সর্বনাথ এবার তাকাল। আরাম করে বসে পা নাচাল।

আমি কিছু ভাবিনা। কিছু মনে করিনা। আর প্রেম-ট্রেম-এর কথায় শিবানন্দকেই মনে পড়ে বেশী। সুমিতাটা বিট্রে করল মাইরী।

শুনেছি। খুব নির্বিকার জবাব দিল সর্বনাথ।

কতটুকু জানিস ? শুনেছিস ? অতনু কেমন উত্তেজিত হল। কেমন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল। শেষের দিনগুলো তুই জানিস না। শুনিস নি ? ক্ষণকাল চুপ করে বসে থেকে বলল, শহরের সব যুবতীরা আজকাল বড্ড বেশী সতী হয়ে যাচ্ছে, নারে ?

খুব অলসভাবে তাকাল সর্বনাথ। জানি। বলল, আশ্চর্য এ সমাজটা মাইরি। শালা পকেট ফাঁকা তো তুলসীতলায় মোমের বাতি জালিয়ে মেয়েরা ওমনি সতী। শিবানন্দর পয়সা থাকলে সুমিতা লটকে যেত। বেকারী প্রেমে ভিজতে একটু দেরী লাগে। অর্থপূর্ণ হাসল সর্বনাথ।

আমি হলে গুলি করতাম। অতনু আরো গম্ভীর গলায় বলল। শিবাটা নিতান্ত ভদ্রলোক, যুতসই সিপাই হলে ঠিক মেরে দিত। অতনুও ঠোঁট বেঁকিয়ে সর্বনাথের মত হাসল।

বাইরে শীতল হাওয়া দিচ্ছিল। এখন কেমন শীত শীত করল বলে উঠে গিয়ে নিজে হাতে পাখার গতিটা একটু কমিয়ে দিল সর্বনাথ। দিয়ে বলল, মাল কড়ি কিছু আছে পকেটে ?

কেন ? অতনু বলল।

সন্ধ্যা নামছিল। রাস্তার নিয়ন আলো জলে উঠেছিল কখন। পাশের বাড়ি-গুলো থেকে এবং রাস্তার কিছু আলোর রেখা মিশ্রিতভাবে এ ঘরে যতটুকু এসেছে, সেই আলোয় সব কিছু অত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। অস্পষ্ট সেই আলোর ভেতর অতনু একটা ঠ্যাং টেবিলের ওপর তুলে দিল। সিগারেটটাকে ছাইদানির ভেতর দুমড়ে দুমড়ে নিবোতে গিয়ে আঙুলে ছাই লেগে গেল। ফুঁ দিয়ে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে অতনু বলল, তাহলে বেরুনো যাক চল।

দুজনে বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসল, সর্বনাথ চুপচাপ বসে থাকল। কোন কথা বলছিল না। সন্ধ্যা এখন আর তরল নেই। গাঢ়। শীতের ভাব আরো ঘন। আজ সারাদিন ধরে কেমন হাওয়া। ঠিক ঝোড়ো হাওয়ার মত না হলেও তবু সেই হাওয়ায় শীত শীত করে। অথচ কেমন ভাল লাগছিল। সেই হাওয়ার ভেতর দিয়ে ঝড়ের বেগে ড্রাইভ করছিল অতনু। গাড়ির গতি কখনো বাড়িয়ে কখনো কমিয়ে চৌরঙ্গীর দিকে এগোচ্ছিল। একটা বাঁক দিয়ে আলতো ধাক্কা দিল অতনু। কী রে এতক্ষণ ধরে কী ভাবছিলি ?

সর্বনাথের যেন সম্বিত ফিরে এল। না, কিছু না।

সুমিতার কথা ?

সর্বনাথ-এর জবাব দিতে যেন একটু দেরী হয়ে গেল। তারপর বাইরে থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে গাড়ির ভেতরে তাকাল। আচ্ছা, তোর মনে আছে, সুমিতার সঙ্গে আমাদের কখন পরিচয় হয়েছিল ?

আছে। খুব ছোট্ট করে জবাব দিল অতনু। তারপর হর্ন বাজিয়ে রাস্তার লোক সরাল। সরিয়ে বলল, কফি হাউসে তুই বসেছিলি আমার সঙ্গে। এমন সময় ঢুকলো শিবানন্দ, সঙ্গে সুমিতা। কিনা বল, তাই না ?

প্রথম আলাপেই তুই বলেছিলি, আচ্ছা, আপনি কখনো শান্তিনিকেতনে গেছেন ?

কেন বলুনতো ? সুমিতা হেসেছিল।

বলুন না ? তুই বলেছিলি।

দুবার।

তুই তাকিয়েছিলি আমার দিকে। তারপর বলেছিলি, দেখেছেন, আমাদের কী মিল দুজনের ? আমিও দুবার।

শিবানন্দ হাসছিল। আমার বেশ এখনো মনে আছে। সেদিনের বিল শিবানন্দই দিয়েছিল। তাই না ? অতনু সর্বনাথের দিকে তাকাল।

ঠিক। ওরা এবার গলা মিলিয়ে দুজনে হাসল। হঠাৎ গাড়ি পার্ক করিয়ে অতনু বলল, চল।

সর্বনাথ আজ প্রথম এ বাড়িতে। দরজার ওপরে আঙুল ছুঁইয়ে কল বেল টিপল অতনু। সর্বনাথ ইতি উতি করে বলল, স্বর্গের খুব কাছাকাছি আমরা এসে পড়েছি, না ?

অতনু কলবেল থেকে আঙুল তুলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। এই সেই দরজা।

স্বর্গদ্বার খুলে প্রহরী সামনে দাঁড়াতেই অতনু হাসল। হেসে বলল, মেমসাব আছে?

জী।

অতনু ভেতরে এল। স্বর্গে প্রবেশ করল ওরা। সর্বনাথ পেছনে পেছনে গেল অতনুর।

সুদৃশ্য ড্রইংরুম মল্লিকা সেনের। খদ্দেরের পছন্দ অনুসারে নাম পাল্টান মল্লিকা সেন। কারো কাছে লক্ষ্মীবাঈ, কেউ তাকে ডার্লিং, লম্বা জুলপি আর বেল বটের খদ্দের হলে মল্লিকার নাম, মিলি সেন। বাইরে থেকে সর্বনাথ প্রথমে একটা এক্সরে চেম্বার কি স্টুডিও ভেবেছিল। অতনু ভেতরে গিয়ে সোফায় বসল। আয়া ধরণের একটা ছুঁড়িকে দেখে ইসারা করে হাসল অতনু। হেসে বলল, মেমসাহেবকে সেলাম দাও। সর্বনাথ তখনো দাঁড়িয়েছিল। অতনু বলল, কিরে, বস না?

মিলি সেনের ড্রইং রুম। মেঝেয় দামী কার্পেট। বিদেশী চিত্রকরের ছবি দুদিকের দেয়ালে। ছৌনাচের মুখোসের মত একটা মুখোস দরজার ঠিক ওপরে। সোফার উল্টোদিকে বুক কেস। নানা ধরণের বই দেশী-বিদেশী। কিছু তাজা ফুলের গুচ্ছ। কিছু আলগা ফুল জাপানী প্রথায় সাজানো। বাঁদিকের দরজার পাশে একটা সুদৃশ্য আলমারী। ভর্তি পুতুল। নানা ধরণের। সর্বনাথ উঠে গিয়ে বুককেসের সামনে দাঁড়িয়ে বইগুলো দেখল। দেখে প্রায় অবাক হয়েই বলল, এত বই?

হুঁ। অতনু একটা ইংরাজী মাসিকের পাতা ওল্টাল।

আমরা এখন স্বর্গের কোন ডিপার্টমেন্টে বলত অতনু?

কি জানি? অন্যমনস্কে উত্তর দিল অতনু। পত্রিকাটা বন্ধ করল।

গডেস অব লার্নিং-এর ডিপার্টমেণ্ট। চতুর্দিকে জ্ঞানভাণ্ড।

তা ঠিক। অতনু বলল। ভাঁড় একেবারে জ্ঞানে উপচে পড়ছে।

সত্যিকারের জ্ঞান লাভ আমাদের কবে হবে বলত? সর্বনাথের কথায় অতনু হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু মল্লিকা সেন ঘরে ঢুকল। সর্বনাথের উচ্ছ্বাস নিবে গেল। অতনু হেসে পরিচয় করিয়ে দিল সর্বনাথের সঙ্গে। হাসি হাসি মুখে সর্বনাথ নমস্কার করল।

নমস্কারের ভঙ্গিতে হেসে ফেলল মল্লিকা। সর্বনাথ বলল, আপনি এত বই পড়েন?

কোথায় আর সময় পাই বলুন? কিছু কিছু পড়ি। মল্লিকা সেন অন্তরঙ্গ গলায় কথা বলল।

তাকাল সর্বনাথ। আশ্চর্য সুন্দর চেহারা এবং এই স্নিগ্ধ চেহারাটা যেন অজস্র মেয়ের ভেতর থেকে অতি সহজে চিহ্নিত করা চলে। বড় শান্ত দুটো চোখ। সমস্ত মুখাবয়বে একটা কেমন প্রশান্তি এবং সেই প্রশান্তিকে কেমন যেন একটা কোমলতা, সন্ধ্যাকাশের মত একটা নিরুপম লাবণ্য স্পর্শ করে আছে। এক একটা শরীর আছে বড় কেমন উগ্র, কেমন স্পর্ধিতভাব। লোভ হয় কিন্তু প্রাণ যেন সাড়া দেয় না। কিন্তু এ শরীর সম্পূর্ণ বিপরীত। বড় যেন কাছের হতে ইচ্ছা করে।

অতনু এবার উঠে গিয়ে একটা নাচের রেকর্ড চাপিয়ে দিল প্লেয়ারে। সর্বনাথ চোখ দুটোর ভেতরে তখনো তাকিয়েছিল। বলল, এত দামী আর এত ভাল ভাল বই?

স্মিত হাসল মল্লিকা সেন। শব্দ হল না।

রাত বড় হচ্ছিল। হাওয়ায় মেঘ দাঁড়াচ্ছিল না। তারায় আকাশ ভরেছে। শীতের ভাব এ ঘরে অত বোঝা যাচ্ছিল না।

সর্বনাথ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখ বুজলো। আশ্চর্য দুটো চোখ মল্লিকার। পরিণত বুক সিল্কের শাড়িতে বড় স্পষ্ট। ঠোঁটের ওপর স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে আছে। হাসির আড়ালে লাবণ্য আর লাবণ্য। এবং এ সব নিয়ে সুনিপুন কোন স্থপতি শিল্প রচনা করলে যেন একটা নিপুণ সৌধ। নিপুণ কোন শিল্পীর তৈরী। তাকালে একটা নির্মলভাব জাগে। পাতকের ইচ্ছা যেন মন থেকে দূর হয়ে যায়। সর্বনাথ বেশ কিছুক্ষণ চোখের ভেতর তাকিয়ে থেকে বলল, এত আপনি পড়েন?

না।

তবে? সর্বনাথ যেন লজ্জা পেল। তবে? কেন রেখেছেন?

এই ওপরের ঘর থেকে মল্লিকা তাকিয়ে ছিল বাইরে। মল্লিকা হেসে বলল, সে যখন আসে তখন ভালবাসার অর্থ খোঁজে বইগুলো খুলে খুলে। সারারাত মদ গেলে আর পাগলের মত বইগুলো হাতড়ায়। চীৎকার করে। ভোরের দিকে হয়ত ঘুমিয়ে পড়ে। মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ে। সকালে আবার জাহাজে ফিরে যায়। জাহাজ চলে যায় দূরে। আমাকে ছেড়ে চলে যায় দেশান্তরে। ঘুরে বেড়ায় বন্দরে বন্দরে।

সর্বনাথ স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। অতনু রেকর্ড বদলে বদলে বাজাচ্ছিল। মল্লিকা বলল, জানেন, এক একদিন এই জানালা দিয়ে গড়ের মাঠ ডিঙ্গিয়ে গঙ্গার দিকে

তাকাই। জাহাজের সাইরেন শুনি। ভাবি, অই বুঝি আসছে। কিন্তু না।

সর্বনাথ স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। রেকর্ড বদলে বদলে বাজাচ্ছিল অতনু। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মল্লিকা বলল কিন্তু আসে। আমার সেই মৌন প্রতীক্ষা যখন শেষ হয় তখন বড় নীরবে এসে সামনে দাঁড়ায়। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে না। তারপর শিশুর মত আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করে, ভালবাসার অর্থ জান মল্লিকা।

না।

ভালবাসা মরে না।

আমি তাকালে বলে, ভালবাসা সর্বকালের। এই পৃথিবী দেখতে দেখতে একদিন মরে যাবে। কিন্তু ভালবাসা মরে না। চিরকালের। রাতের সব তারাই দিনের আলোয় ঢাকা থাকে মল্লিকা।

চমকালো সর্বনাথ। ঠিক এমন কথা বলল শিবানন্দ। সুমিতা ঝাঁঝাল গলায় বলত, আবার এসেছ তুমি ?

নীরবে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত শিবানন্দ। তারপর ওকে স্পর্শ করলে আরো কঠোর হত সুমিতা, কেন আসো ?

তোমাকে দেখতে।

কী আছে দেখার।

জানিনা।

সব কিছুর একটা সীমা আছে শিবানন্দ।

তুমি ভালবাসার অর্থ বোধ হয় জানোনা সুমিতা। শিবানন্দ ছিটকে সরে আসত।

তাতে তোমার বেদনার কারণ হতে পারে, কিন্তু আমার তাতে কিছু যায় আসে না।

ভালবাসা মরে না।

এ সব প্রলাপের জন্য আমি নই। এত বাজে সময় আমার জন্য খরচ না করে একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করতে তো পার। তোমার মগজটা তোমার জন্মসূত্রে পাওয়া। ওতে আমার কোন হাত নেই। আর এস না।

এই পৃথিবী দেখতে দেখতে একদিন মরে যাবে। কিন্তু—

তুমি আসবে ?

রাতের সব তারাই দিনের আলোয় ঢাকা থাকে সুমিতা। মরেনা।

এক সময় মল্লিকা চোখের জল মুছে ও ঘরে চলে গেলে রেকর্ড বাজানো বন্ধ করল অতনু। তারপর একটু হেসে অতনু ওঘরে চলে গেলে সর্বনাথ কোলের ওপর একটা বই তুলে নিল। ভালবাসার অর্থ খুঁজল। সে দেখছিল একটা জাহাজ। প্রকাণ্ড একটা জাহাজের ভেতর মাস্তলে হেলান দিয়ে একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। নক্ষত্র খচিত আকাশ। আলোর মালায় নদীর জল সাদা। রূপালী জ্যোৎস্নার রং নিয়েছে। সেই জলের ভেতর মগ্ন চৈতন্যে সে কী যেন খুঁজছে। হঠাৎ জাহাজটা এসে দাঁড়াল মাঝ দরিয়ায় একটা প্রবাল দ্বীপের গা ঘেঁসে। রক্তের রঙে জমাটবাঁধা প্রবালের কীট এই দ্বীপ গড়ে তুলেছে। যুবক এই দ্বীপের ওপর পা রেখে হাঁকল, কে আছো—

সেই স্বর প্রতিধ্বনিত হল। ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে যুবকের চারপাশে সেই স্বর কাঁপল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আরে সর্বনাথ না ?

হঠাৎ জাহাজের সাইরেনে সম্বিৎ ফিরে এল সর্বনাথের। হঠাৎ বাইরে তাকাল সর্বনাথ। ব্যালকনি থেকে গড়ের মাঠের ওপারে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে মল্লিকা। বইটা কোলের ওপর থেকে নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল। একটা অক্ষরও পড়া হয়নি তার। কিন্তু তাতে কি! দীর্ঘদিন অদেখা প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে তবুতো ক্ষণকাল দেখা হয়ে গেল প্রবাল দ্বীপের ওপর সর্বনাথের।
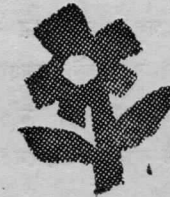
দরজার ওপাশেই ওরা

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

এই ভর দুপুরে কে যেন এলো। দরজায় খুট খুট করে বার কয়েক শব্দ হল। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আসতে পারে, তাতে আমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না, কিন্তু মুহূর্তের জন্য ভীষণ গা ছম ছম করে উঠল। কে হতে পারে এই অসময়ে!

রাণী আজ দুপুরের শো'তে ছবি দেখতে গেছে। সঙ্গে টুটুলকেও নিয়ে গেছে। আমারও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিনকালের কথা ভেবে আমি থেকে গিয়েছিলাম। গত রোববার নিচের ফ্লাটে যা জঘণ্য একটা ঘটনা ঘটল তা মনে পড়লেই গা হিম হয়ে আসে। নিচের ফ্ল্যাটে মন্দিরা নামে একটা মেয়ে থাকে। মন্দিরা আর মন্দিরার মা বাবা। মন্দিরা কচি খুকিটি নয়, এবার পার্ট ওআন দিয়েছে। বেশ বুদ্ধি শুদ্ধি রাখে মন্দিরা। ওর মা বাবা ওর ওপর বেশ ভরসাও করতে পারেন। ওকে তাই একা রেখে সেদিন ওর মা বাবা দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। রাতে ওরা ফিরে এসে দেখলেন, দরজা জানালা সব খোলা। মন্দিরা অচৈতন্য হয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। আর ঘরের মালা মালি সব জিনিসপত্র উধাও। কে বা কারা যে এমন ঘটনা ঘটাল কে জানে। আর, সব চেয়ে বড় আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে, আমরা ঠিক মন্দিরাদের ওপরের ফ্ল্যাটেই থাকি, অথচ আমরা এত বড় একটা ডাকাতির বিন্দুমাত্র টের পাইনি। ডাকাতরা যেন সম্মোহনী মন্ত্র জানে। এত বড় এই বাড়িটাকে পুরোপুরি সম্মোহন করে নিজেদের কাজ হাসিল করে চলে গেল। মন্দিরার বাবা বেশ কয়েকদিন থানায় দৌড়াদৌড়ি করলেন, কিন্তু থানা অনেকটা ভগবানের মতো, সামান্য ফুস আর বাতাসায় আজকাল আর গা নাড়া দেন না। মন্দিরার বাবা সামান্য মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ, কালো টাকা ওর একটি কানাকড়িও নেই। ফলে ব্যাপারটা বোধ হয় ঐখানেই ইতি হয়ে গেল।

যাই হোক এই সব সাত পাঁচ ভেবেই রাণীকে আমি বলেছিলাম, তোমরা দুজনেই যাও। আমি বরং একটু ঘুমিয়ে নিই।

রাণী টুটুলকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি দরজার খিল তুলে দিয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিলাম। দুপুরে খবরের কাগজে ঘুমের অষুধ মেশান থাকে। আমার একটু ভাত ঘুম এসেছিল। আর ঠিক এমন সময় ঐ শব্দ। কে আসতে পারে এখন! আমি দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আর একবার শব্দ না হলে সোফা ছেড়ে উঠব না ভেবে নিলাম।

কিন্তু দরজার ওপাশে লোকটা এখন কে! হয়তো দরজা খুললেই দেখা যাবে কদাকার চেহারার একটা ডাকাত। একাও থাকতে পারে, আবার দলবল নিয়েও আসতে পারে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বুকের ওপর একটা কালো রঙের পিস্তল টিস্তল জাতীয় কিছু তুলে ধরবে। আমি চেঁচাবারও সময় পাবো না। আমি যদি প্রতিবাদ না করি হয়তো আমাকে প্রাণে মারবে না। ঘরের সমস্ত জিনিস পত্র একে একে বার করে নিয়ে চলে যাবে। তারপর রাণী আর টুটুল এসে যখন এই দৃশ্য দেখবে তখন কপাল চাপড়ানো ছাড়া কিছুই করার থাকবে না আমাদের।

দরজায় আবার খুট খুট করে শব্দ হল। বাইরে এখন যে, সে ইচ্ছে করলে দরজায় ঘুষি কিংবা লাথিও ছুড়ে মারতে পারত। কিন্তু খুব শালীন ভাবে সে আঙ্গুলের টোকা দিয়ে জানাচ্ছে সে সেরকম কিছুই করতে চায় না। ভদ্রভাবেই সে দেখা করতে চায়!

তা হলে কে হতে পারে! এমনও তো হতে পারে বাইরে এখন দরজার ওপাশে যে দাঁড়িয়ে আছে সে এক রূপসী মহিলা। সে কোন না কোন সূত্রে রাণীর সঙ্গে পরিচিতা। হয়তো রাণীর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে। ছুটির দিনে এই দুপুরেই যেন নিশ্চিন্ত সময় বলে ভেবে নিয়েছে ও। এ রকম একজন মহিলাকে এখন দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখাটা যে অভদ্রতা হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। আমার উচিত আর সময় নষ্ট না করে এক্ষুনি ওকে ঘরে এনে এই সোফার ওপর বসানো।

কিন্তু না, কোন মহিলাই যে দরজার ওপাশে এসে দাঁড়িয়ে আছেন এখন, এ ব্যাপারেও তেমন নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। ফলে আরও কিছুক্ষণ আমি অপেক্ষা করলাম। তৃতীয়বার শব্দ হলে এবার আমি ছুটে গিয়ে দরজা খুলব। যেই এসে থাক, এবার আমি দরজা খুলে তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াব। দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

অনেকক্ষণ বোধহয় কেটে গেল। কিন্তু আর কোন সাড়া শব্দ শোনা গেল না।

দরজায় আর কোন শব্দ হচ্ছে না দেখে এবার আমার খারাপ লাগতে শুরু করল। তবে কি দরজার বাইরে সে অপেক্ষা করে করে চলে গেল। যদি কোন মহিলাই এসে থাকেন, তাকে ঐ ভাবে তাড়িয়ে দেওয়াটা কি উচিত হল আমার।

আর অপেক্ষা করা যায় না, উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। আমার অনুমান কোনটাই খাটল না। না কোন কদাকার চেহারার ডাকাত, না কোন সুন্দরী রূপসী মহিলা। কেউ নেই। যে এসেছিল সে হয়তো আমার কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে চলে গেছে। সে হয়তো এই দুপুর রোদে হেঁটে এসে ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের আশায় অপেক্ষা করে করে চলে গেছে। নিজেকে আমার বেশ কিছুটা অপরাধী বলে মনে হতে লাগল।

আসলে আমি বোধ হয় একটু বেশি মাত্রায় ভিতু, ভয় থেকেই এরকম একটা ছেলেমানুষী করে ফেললাম। যে এসেছিল সে হয়তো খুব প্রয়োজনেই এসেছিল। প্রয়োজনটা দু তরফেই হতে পারে, হয়তো সে আমাদের প্রয়োজনেই এসেছিল। আবার সে তার নিজের প্রয়োজনেও আসতে পারে! যে জন্যই সে আসুক, এ রকম ভাবে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি শুনলে রাণী খুব রাগ করবে। রাণীকে আমি বোঝাতে পারব না যে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এই এত বড় কলকাতা শহরটা সম্পর্কে রাণীর ধারণা খুব কম। রাণী চাকরী করে না। পথে ঘাটে খুব বেশি একটা ঘুরে বেড়াবারও দরকার হয় না ওর। ও বুঝবে না কলকাতার মানুষ-গুলো আর ঠিক আগের মতো সেই মানুষগুলোই নেই। খুন রাহাজানি ছিনতাই আজকাল জল ভাতের মতো ব্যাপার হয়ে গেছে। আমাদের অফিসের রাধারমণ বাবুর ঘড়িটা পরশু দিন যে ছিনতাই হয়ে গেল, এ ঘটনা রাণী গল্পের মতো শুনতে ভালবাসে। রাণী কিছুতেই অনুভব করতে পারবে না, রাধারমণবাবুকে যখন প্রকাশ্য রাস্তায় দুপাশ থেকে দুটি ছেলে এসে ফিস ফিস করে বলে, শুনছেন, ঘড়িটা খুলে দিন, আর পকেটে যে টাকাকটি আছে দিয়ে দিন, তখন রাধারমণবাবুর কি মনের অবস্থা। রাধারমণবাবু নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করেন। ধূমপান টান একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না। ইংরেজ আমলে স্বদেশী ক্লাব গড়ে লাঠি খেলা ছোড়া খেলা ইত্যাদি ছেলে মেয়েদের শেখাতেন। সেই রাধারমণ বাবুকেও প্রাণের ভয়ে হাত ঘড়িটা খুলে দিতে হয়। পকেট থেকে টাকা পয়সা সব কিছু দিয়ে নিঃস্ব হয়ে বাড়ি এসে গুম হয়ে বসে থাকতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে গাজোয়ারী খাটে না। বিশেষ করে আমার মতো লোকের পক্ষে তো নয়ই। তা সে রাণী যাই ভাবুক আমার কিছুই করার নেই এ ক্ষেত্রে।

ভাবলাম এনিয়ে আর মাথা ঘামাব না। দরজাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। কিন্তু দরজা বন্ধ করতে গিয়েই আমার নজরে পড়ল ভাঙা কয়েকটুকরো কাচের চুড়ি সিঁড়ির কাছে পড়ে আছে। রাণীরা যখন সিনেমা গেল, তখন কি ওগুলো ছিল ওখানে! মনে করতে পারলাম না। তা ছাড়া রাণী কোনদিন কাচের চুড়ি পরে না। ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরো নিয়ে টুটুল যে ঐ সিঁড়ির কাছে বসে খেলা করবে তাও হতে পারে না। তাহলে নির্ঘাৎ কেউ এসে চুড়িগুলো ওখানে রেখে চলে গেছে। হয়তো কোন বাচ্চা ভিখিরি টিখিরি হবে। ওদের কাছে ঐ চুড়িগুলোর অনেক দাম। হয়তো ভিক্ষে টিক্ষে চাইবার জন্য উপরে উঠে এসেছিল। ভিক্ষে না পেয়ে চলে যাবার সময় ওগুলো ভুলে ফেলে রেখে গেছে। আহা, ভিখিরি মেয়েটার খেলার জিনিষগুলো এভাবে হারিয়ে যাওয়ায় মেয়েটা নিশ্চই কাঁদছে।

আমি সিঁড়ির দিকটা একবার দেখে এলাম। কিছুই নেই ওখানে। তারপর উঠে এসে দরজায় খিল এঁটে আবার ঘরের ভিতর চলে এলাম। দুপুরের ঘুম পুরোটাই এখন চটে গেছে। এ অবস্থায় আবার খবরের কাগজ নিয়ে বসতেও ভালো লাগছিল না। কাগজের খবরগুলো সত্যি সত্যি যে বাস্তবে ঘটে গেছে তা ভাবতেই কেবল ভালো লাগে। কেমন রহস্য গল্প পড়ার মতো একটা আমেজ থাকে। কিন্তু একবার রহস্যটুকু ধরতে পারলেই আর চার্ম থাকে না।

তবু কাগজ নিয়েই বসলাম। সোফায় পিঠ রাখলাম, সেন্টার টেবিলে পা রাখলাম। তারপর কাগজটা চোখের সামনে তুলে রেখেও মনে হল, কাগজের অক্ষরগুলোর দিকে চোখ নেই। শিয়ালদা স্টেশনে পরশুদিন যেতে হয়েছিল আমাকে। ভুখা আর ভিখিরিতে আবার ছেয়ে গেছে শিয়ালদা। ভিখিরিগুলো কলকাতার বাইরে এতকাল কোথায় যে গা ঢাকা দিয়ে ছিল কেউ জানে না। হঠাৎ সব মাছ উজানর মতো উজিয়ে কলকাতার দিকে ছুটতে শুরু করেছে। এ নিয়ে খবরের কাগজে কি সুন্দর একটা স্টোরি পড়েছিলাম কয়েকদিন আগে। ভিখিরিদের নিয়ে কি একটা নাটক যেন বাজার মাত করেছিল কয়েক মাস আগে। ভিখিরিদের নিয়ে এই ধরণের মজা করতে খারাপ লাগে না কারো কারো।

কিন্তু আবার চমকে উঠতে হল, আবার সেই খুট খুট করে শব্দ। সেই আগের মতই শব্দ। আবার যেন কে এল! কে এল! নাহ্, এবার আর হাত ছাড়া করব না লোকটাকে যেই হোক। ঝটপট করে উঠে কাগজটা ছুঁড়ে ফেললাম। তারপর লাফিয়ে দরজার দিকে এগোতে গিয়ে মনে হল, শব্দটা এদিকে নয়। ঐ

বাথরুমের দিক থেকে আসছে। কি আশ্চর্য ! ও দিক দিয়ে তো কারো পক্ষেই আসা সম্ভব নয়। তবে কি বাথরুমের মধ্যে কেউ লুকিয়ে বসে আছে। লুকিয়েই যদি বসে থাকবে তবে খুট খুট করে শব্দ তুলে আমাকেই বা ডাকবে কেন !

বাথরুমের দিক থেকেই শব্দটা এল কি! না ভুল শুনলাম। ফলে আর একবার শব্দটার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গতি কি! ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়েই রইলাম। তবে কি এ সব আমার মনেরই ভুল। একা একা ঘরে বসে আছি বলেই কি এসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

নাহ, বাথরুমটা দেখে আসা ভালো। ভয়ে ভয়ে বাথরুমের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললাম। কেউ নেই। কেউ ছিল না এখানে। কারো পক্ষেই এখানে থাকা সম্ভব নয়।

তবে কি শব্দটা দরজার দিকেই হয়েছিল। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে এবার সদর দরজাটা এসে খুলে ফেললাম। নাহ, এখানেও কেউ নেই। সেই আগের বারের মতই ফাঁকা। কিন্তু কি আশ্চর্য শব্দটা যা শুনলাম তা কি আমার মনের ভুল।

ঠিক আছে এবার আর দরজা বন্ধ করব না খোলাই রেখে দেব। দরজা খুলে রেখে আবার এসে সোফায় বসলাম।

এখানে বসলে দরজা দিয়ে বাইরে সিঁড়ির খানিকটা দেখা যায়। কেউ যদি উপরে উঠে আসে সরাসরি আমার চোখে পড়বে। অতএব এটাই ভাল হল। সেন্টার টেবিলে পা তুলে দিয়ে আবার অপেক্ষা। দরজার দিকেই চোখ। কিন্তু আবার কিছুটা চমকে উঠতে হল। সিঁড়ির পাশে কাপড়ের পুটলির মতো কি যেন একটা পড়ে আছে। কি ওটা! এতক্ষণ আমার চোখেই পরে নি। আগের বার তো ও জিনিসটা আমার চোখে পড়ে নি। তবে! আবার উঠতে হল। দরজার কাছে এগোলাম। নাহ, ভুল! স্রেফ ভুল দেখছি এবার, কাপড়ের পুটলি নয়। এক টুকরো কাগজ। অদ্ভুত ভাবে ওটা সিঁড়ির গায়ে লেগে আছে। দূর থেকে দেখলে ওটাকে কাপড়ের পুটলি বলে ভুল হওয়াটা অসম্ভব নয়। কাগজের টুকরোটা হয়তো নিচ থেকে উড়তে উড়তে উপরে উঠে এসেছে। ভাগ্যিস কাগজটাই উড়ে এসেছে। যদি কোন কাপড়ের পুটলিই হত ওটা! আর সেই পুটলির ভেতর থেকে এমন কিছু যদি দেখা যেত যাতে চিৎকার করে ওঠা ছাড়া আর কোন গতি থাকত না, তা হলে।

নাহ, দরজাটা বন্ধ করেই দেওয়া ভালো। দরজায় আবার খিল তুলে দিয়ে

ভিতরে এলাম। টেবিলের কাছে এগোলাম। টেবিলের ওপর কলম, ঘড়ি; ঘড়িতে এখন চারটে বাজতে কিছু বাকি। রাণী আর টুটুল এখন সিনেমার পর্দায় বিভোর হয়ে আছে। ভুলেও এখন ওদের বাড়ির কথা মনে পড়ছে না। অথচ ছুটির দিনের এই দুপুরটায় কত খারাপ খারাপ কথা মাথায় এসে ভিড় করছে আমার।

ওপাশের জানালাটা খুলে দেওয়া যায় এখন। রোদের তেজ কমে আসছে। এগিয়ে জানালাটা খুললাম। কিছুটা রোদ এখনো অবশিষ্ট ছিল, আছড়ে পড়ল ঘরে, তবে তেমন কিছু বেশি নয়। পর্দা তুলে বাইরে তাকালাম। বাইরে, ওকি! রাস্তায় গিসগিস করছে মানুষ। মানুষ না জন্তু ওগুলো! কানি কুনি পরা ভিখারিদের মতো বেশভুষা। অবিকল ভিখিরি। হাঁ, ভিখিরিই। অথচ একটা ভিক্ষুক আর একটার কাছে ভিক্ষে চাইছে। রঙচটা কুৎসিত আকারের দুটি একটি গাড়ি চলছে। গাড়ি চালাচ্ছে ভিক্ষুকের মতোই পোষাক পরা লোক, ভিখিরিই। সোয়ারী ভিক্ষুক। ওরই মধ্যে আবার চটকদার শুকনো মুখ করা মেয়ে ভিখিরি। এত ভিক্ষুক এলো কোথা থেকে! তবে কি শিয়ালদা, ক্যানিং, বজবজ সব লাইন উপচিয়ে ভিখিরি আসছে। ভিখিরিদের দখলে চলে গেল নাকি কলকাতাটা!

বেশিক্ষণ তাকান গেল না, পর্দাটা ফেলে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। ভিখিরিদের বেশিক্ষণ দেখারও কিছু থাকে না। তা ছাড়া ভীষণ বিমর্ষ হয়ে যেতে হয়। এই বিকেলবেলা অহেতুক আর মন খারাপ করতে ইচ্ছে হল না। আবার টেবিলের কাছে এলাম। সময় যেন এক জায়গায় হঠাৎ এগিয়ে এসে আটকে গেছে আর নড়তে চাইছে না। ঘড়ির দিকেই তাকিয়ে ছিলাম, আর ঠিক এ সময়ই আবার।

আবার সেই খুট খুট করে শব্দ। এবার আর ভুল শোনার কথা নয়, স্পষ্ট শুনলাম সামনের দরজাতেই কে যেন টোকা মারছে। এবার আর লোকটাকে হাত ছাড়া করা যায় না। দ্রুত এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলাম, কে ?

দরজা খুলে দিয়ে যাকে দেখলাম তাকে এর আগে কোনদিন দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। ময়লা একটা শাড়ি পরে আছে, কিন্তু ভিখিরিদের মতো অতো ময়লা নয়। চোখে মুখে কেমন এক ত্রাস। মেয়েদের বয়স চট করে বোঝা যায় না, তবু এক নজরে মনে হল আমাদের চেয়ে বড়। অনেক বড়ই হবে। জোর

করে যৌবন ধরে রাখার চেষ্টায় নামতে হয়েছে ওকে। হয়তো এমনও হতে পারে ও আমার মায়ের বয়সী।

কাকে চাই ? আমি প্রশ্ন করলাম।

মহিলাটি শুকনো মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, একটু আশ্রয়! রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারছি না বাবা। দয়া করে একটু যদি—

মানে! কি হয়েছে রাস্তায় ?

মহিলাটি সিঁড়ির দিকে তাকালেন, ওরা টের পায়নি তাই। টের পেলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসত। রাস্তা দিয়ে একদম চলতে দিচ্ছে না ওরা।

কারা! কারা চলতে দিচ্ছে না ?

ভিখিরি। সমস্ত পথ ঘাট ভিখিরিতে ভরে গেছে। এতকাল ধরে কোথায় যে এরা বেঁচে ছিল কে জানে! আমাকে এখন দরজা থেকে তাড়িয়ে দিও না বাবা। ওরা আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে।

মহিলার দু চোখ জুড়ে যে ভয় ঘুরপাক খাচ্ছে বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তাই বলে অচেনা অজানা একজন মহিলাকে ঘরে এনে বসাব! রাণী মুখে কিছু না বললেও মনে মনে রুষ্ট হবে। নির্ঘাৎ ও বিরক্ত হবে। তবু ভদ্রমহিলাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। বললাম, আসুন, ভিতরে আসুন।

মহিলাটি ভিতরে এসে বসলেন। দরজা বন্ধ করে দিলে হত না।

বন্ধ করে দিলাম দরজা। দিয়ে ভদ্রমহিলার মুখোমুখি এসে বসলাম। বলুন, কি হয়েছে এবার বলুন।

ভদ্রমহিলা তাঁর নোংরা কাপড়ের আঁচল তুলে মুখ মুছলেন। কি আশ্চর্য! এখনো তোমাকে বলতে হবে, কি হয়েছে। কলকাতায় থাক না বুঝি! ঘর থেকে পথে বেরও না!

বললাম, জানালা খুলে দেখেছি রাস্তায় ভিখিরি ভরে গেছে।

হ্যাঁ বাবা, গলি ঘুজি কোথাও বাদ নেই, ভিখিরি আর ভিখিরি। কে কাকে আর ভিক্ষে দেবে। সবাই খেয়োখেয়ি করছে। রক্তারক্তি কাণ্ড হচ্ছে রাস্তায়।

তার মানে যারা ঘর থেকে এখন বাইরে গেছে তারা ফিরবে কি করে! জানেন, আমার স্ত্রী আর মেয়ে সিনেমা গেছে।

ভদ্রমহিলা মলিন একটু হাসলেন, ভিখিরিদের সন্তুষ্ট করতে পারলে ঠিক ফিরে আসবে। এমন দিনে অবশ্য সিনেমা পাঠিয়ে ভালো কর নি বাবা।

ভদ্রমহিলাকে অত্যন্ত আপনজন মনে হচ্ছিল এখন। মনে হচ্ছিল আমার

মায়ের বয়সী মহিলাটি অবিকল আমার মা। আমার মায়ের স্মৃতি বড় ক্ষীণ। কিন্তু মায়ের মত এই মহিলাটিকে আপাতত আশ্রয় দিতে পেরে আমার খারাপ লাগছিল না। মহিলাটি সম্পর্কে আরো অনেক কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছিল। বললাম, কোথায় থাকেন আপনি ? জেনে শুনে আপনিই বা পথে বেরুলেন কেন ?

আমি! হাসলেন উনি। সাধে কি আর বেরই। তোমার বয়সী আমার একটা ছেলে! ছেলেটার দু দিন ধরে খোঁজ পাচ্ছি না বাবা। খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। দুপুরের পর থেকেই রাস্তাঘাট যে এমন খারাপ হয়ে যাবে কে জানত। এসব জানলে কে বেরুত।

কি করে আপনার ছেলে ?

কি যে করে কিছু কি ছাই জানি। তবে যত সব ছোটলোক ইতর ভিখিরিদের সঙ্গে বেশ মিশে যেতে পারে। দেখে আমার কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে হয়। কত বোঝাই, বোঝেনা। ভিখিরিদের একবার মাথায় তুললে কি সর্বনাশ হতে পারে নিজের চোখে আজ তা দেখলাম। তুমিই বলো আমার পেটের ছেলে বলেই না এই অসময়ে আমাকে পথে বেরুতে হল। আর ভিখিরিদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই ছুটতে ছুটতে এখানে। তবু বাবা তুমি আমাকে ঘরে এনে বসালে।

ভদ্রমহিলার দিকে অপলক আমি তাকিয়ে ছিলাম। চোখদুটো এখন অনেকখানি শান্ত। অনেকখানি উত্তেজনা যেন কমাতে পেরেছেন উনি। আমি সরে এসে আর একবার জানালার কাছে দাঁড়ালাম। পর্দার ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। ভদ্রমহিলা মিথ্যে বলেন নি, ভিখিরিরা ঘর বাড়ি দোকান পাট ভাঙচুর করছে এখন। কি বিভৎস। ঐ তো দুটো তিনটে লোক প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে ওপাশে। রাণী ফিরবে কি করে! টুটুল!

ভদ্রমহিলা ম্লান এক টুকরো হাসলেন, আমি জানি তুমি তোমার মেয়ের কথা ভাবছ। তোমার স্ত্রীর কথা। ভেব না, যারা ফিরবার ঠিক ফিরে আসবে। ঠিক ফিরে আসবে ওরা।

জানালার পাশ থেকে আবার সরে এলাম। ভীষণ বুক কাঁপছে আমার। নিজের জন্য যত না, তার চেয়ে বেশি যে ওদের জন্য এ মুহূর্তে তা বুঝতে পারছিলাম। এই ভিখিরিদের মধ্যে কি করে এরপর বেঁচে থাকব। কি করে অফিস করব রোজ। রাণীর জন্য একটা ফ্রিজ কেনার কথা হয়েছিল, কি করে সেই ফ্রিজ নিয়ে ঘরে এসে পৌঁছব। যেভাবে ওরা ভাঙচুর করছে চারপাশে। হায় কি কুক্ষণেই আজ রাণীকে সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছিলাম।

ভদ্রমহিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, একগ্লাস জল খাওয়াবে বাবা ! বড্ড তেষ্টা !

আমি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলাম, নিশ্চয়ই আপনি বসুন আমি নিয়ে আসছি।

পাশের ঘরে আমি চলে এলাম। কুজো থেকে যত্ন করে ঢেলে একগ্লাস জল ভরলাম। শুধু জলই। জল ছাড়া দেবার মতো আর কিছু খুঁজে পেলাম না। জল নিয়ে এ ঘরে এলাম।

এই নিন। রাণী থাকলে চা-টা খাওয়ান যেত। কিন্তু—

ভদ্রমহিলা এক নিশ্বাসে জলটুকু গিলে ফেললেন। কি ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল ওর, ঐ জল খাওয়ার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়।

জলটুকু নিঃশেষ করে ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন, না বাবা চলি। এরপর সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর ফেরাই যাবে না।

যাবেন ! কিছুটা আমি ইতস্তত করলাম।

ভদ্রমহিলা দাঁড়ালেন না। দরজা খুলে পা ঠুকেঠুকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন।

আবার আমি একা হয়ে গেলাম। এবার একা হয়ে যাওয়ায় গা ছম ছম করে উঠল। দরজাটা তাই আবার বন্ধ করে দিলাম। জানলাটাও খুলে রাখা উচিত নয় এখন। খোলা জানালার দিকে ভিখিরিদের চোখ পড়লে উত্তেজনা ওদের বাড়তে পারে। নাহ্, ওটাকে বন্ধ করে দেওয়াই উচিত। এগিয়ে এসে জানলাটাও বন্ধ করে দিলাম। ওপাশে বাথরুমের দিকটা অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। বাথরুমের দরজাটাও ভেজান আছে। চারপাশ থেকে সব কটি দরজা সব কটি জানলা এখন বন্ধ। টুক করে আলোটা জেলে নিতে হল। রাতের মতো পরিবেশ হয়ে গেল ঘরের ভিতরে। কটা বাজে !

কটা বাজে জানবার জন্য টেবিলের দিকে এগোলাম। আর এ সময়ই আবার আমাকে চমকে উঠতে হল। আমার ঘড়ি ! ঘড়ি কলম আর কয়েকটা টাকা ছিল এখানে ! তবে কি ভদ্রমহিলাই ওগুলো যাবার সময় সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আশ্চর্য, কিছুক্ষণ আগে ঐ ভদ্রমহিলাকেই আমি মায়ের জায়গায় কল্পনা করে নিয়েছিলাম। তবে কি ঐ রাস্তার হাজার হাজার ভিখিরিদের মধ্যে একজন ছদ্মবেশ ধরে এতক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করে গেলেন।

ইস, কি বোকামিই না করেছি। ঝট করে ঐ মহিলাকে অত বিশ্বাস করে ফেলাই একদম উচিত হয়নি আমার।

এপাশে ওপাশে ঘরের আনাচে কানাচে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, না জিনিসগুলো

কোথাও নেই। হতাশায় আর বিরক্তিতে আবার সোফায় এসে গা এলিয়ে বসতে হল। সেণ্টার টেবিলে পা তুলে দিলাম। তারপর কপালের পাশে হাত চেপে গুম হয়ে রইলাম।

আর ঠিক এ সময় আবার সেই শব্দ। না, রাণী নয়। রাণী কখনো এভাবে শব্দ করে না দরজায়। রাণীর দরজা ঠুকবার ভঙ্গিটা আমার চেনা। তাছাড়া রাণী এলে টুটুলের গলা পাওয়া যেত নির্ঘাৎ। কে তবে ! কে এলো আবার ! শক্ত হয়ে উঠে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ওকি বাথরুমের দিকেও সেই শব্দ। তবে কি বাথরুমে কেউ আগে ভাগে সত্যি সত্যি গা লুকিয়ে বসে আছে ! তখন ভালো করে বাথরুমটা আমার দেখে নেওয়া উচিত ছিল !

পাশের ঘরে কে যেন হাঁটা চলা করছে না ! তবে কি ভিখিরিগুলো রাস্তা থেকে এখন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে। তবে কি পেছন দিককার জলের পাইপ বেয়ে বেয়ে ওরা উঠে আসছে। তবে কি !

হ্যাঁ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি রাস্তার দিককার বন্ধ জানলাটায়ও ঠুক ঠুক করে শব্দ হচ্ছে। কে শব্দ করছে ওখানে ! তবে কি অনুমান আমার ভুল নয়। তবে কি এখনই ঘরের সর্বস্ব লুটতরাজ করে নিয়ে যাবে ওরা।

ভয়ে চোখ বুজলাম। দরজা খুলে বাইরে বেরুলে এখন কেবল ভিখিরি ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় চোখে পড়বে না। হিংস্র নরখাদকের মতো চেহারা নিয়েছে ভিখিরিগুলো। সংখ্যায় রাতারাতি ওরা এত বেড়ে গেল কি করে। শিয়ালদা ক্যানিং বজবজ সব লাইন উজার করে ভিখিরিগুলো কলকাতায় এসে আছড়ে পড়ছে কেন ! কেন এমনভাবে নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার দিনগুলো ওরা কেড়ে নিতে চাইছে।

চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু গলায় কোন স্বর নেই আমার। রাণী আর টুটুলকে এমন দিনে কেন সিনেমা পাঠালাম ! নিজের ওপরই ক্ষোভ জমছিলো আমার। অথচ কিছুই করার ছিল না। কিছুই করার নেই এখন। চারপাশে কেবল শব্দ। চারপাশে কেবল ইঙ্গিত, দেখ দেখ দেখ ! দরজা খুলে, জানালা খুলে খোলা শহরটার দিকে একবার চোখ মেলে তাকাও। দেখ ভিখিরিরা কেমন করে সব ভাঙছে, কেমন করে সব ভাঙবে।

—o—

মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে দেখা

অভ্র রায়

শান্তনু এদিকে দরজার কাছে। শক্ত হাতে রড ধরে কামরার বাইরের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। চলন্ত ট্রেনের ঝাঁকুনিতে তার শরীরটা টগবগ করে নাচছে।

মঞ্জুশ্রী ওদিকে জানালার পাশে। হাতের ওপর মুখ রেখে বাইরের দিকে দেখছে। ইচ্ছে করলে সে শান্তনুকে ওখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পারে। কিন্তু দেখছে না। উদাসীন ভঙ্গিতে বাইরের গাছপালা আকাশের দিকে একটা অলস দৃষ্টি মেলে চুপচাপ বসে আছে। বাতাসের ঝাপটায় তার ঢেউ তোলা চুলগুলো আরও ফুলে উঠছে। ভেঙ্গেও পড়ছে দু এক গোছা ছোট্ট কপালের ওপর। তার শরীরে এক ঝিম ঝিম কাঁপুনি। মাথাটা দুলছে। আর দুলতে থাকা দেহটার পাশ দিয়ে বাইরের ইলেকট্রিক পোস্টগুলো, গাছ-গাছালি, ডাউন ট্রেন সব হুস্ হুস্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। শান্তনু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে মাঝে মাঝে এক একবার বিপজ্জনকভাবে মুখটা বাড়িয়ে ধরে। কিন্তু মঞ্জুশ্রী যেন দেখেও দেখতে পায় না। তেমনি এক নির্বিকার নিশ্চুপ ভঙ্গি।

এটা শুধু একদিনের ব্যাপার নয়। দিনের পর দিন ঘটনাটা প্রায় একই রকম ভাবে ঘটে যায়। মঞ্জুশ্রী আগের কোন একটা স্টেশন থেকে ওঠে। হাতে বই খাতা, ভ্যানিটি ব্যাগ। ট্রেনটা এসে পৌঁছোয় দশটা পঞ্চাশ নাগাদ। সাড়ে দশটার ট্রেন। শান্তনু অবশ্য অনেক আগে থেকেই অপেক্ষা করে। তারপর ট্রেনটা ইন করতে থাকলেই ও মঞ্জুশ্রীকে দেখতে পায়। দেখতে পেয়েই এগিয়ে আসে। দু একদিন হয়ত চোখাচোখি হয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুশ্রী যেন ভীষণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়। ধরা পড়ে যাওয়া বড় বড় চোখ দুটো তখন কেমন তির তির করে কাঁপতে থাকে। খুব ভীতু আর লাজুক একটা ভঙ্গি। এখনো কী ছেলেমানুষ! শান্তনু খুব মজা পেয়ে মনে মনে হাসে।

গাড়িটা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ততক্ষণ আর কোন দিকেই তাকায় না সে। তেমনি শান্ত গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। চারিদিকের হৈ হট্টগোল চিৎকারের কোন কিছুই যেন স্পর্শ করে না তাকে।

অবশেষে শেয়ালদা সাউথ স্টেশনের প্লাটফর্মে এসে গাড়িটা থেমে দাঁড়ায় এক সময়। মঞ্জুশ্রী নামে তখন। কালো রঙের ব্যালেরিনা পরা ফর্সা দুখানা পা টুক করে একটা লাফ মেরে প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে। তার দু পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে মানুষের ঢেউ। মঞ্জুশ্রী কোন দিকে লক্ষ্য করে না। টাল সামলে নিয়ে একেবারে সটান চলতে সুরু করে। শান্তনু পাশাপাশি হাঁটে, কতদিন একেবারে কাছাকাছি। তবুও সে যেন দেখতে পায় না।

কিন্তু এই শেষ নয়। আরও একবার দেখা হয় দুজনের। সেটা আরও আশ্চর্য। কলেজের পর সমস্ত বিকেল এক বন্ধুর পেট্রল-পাম্পের দোকানে গল্প গুজব আর আড্ডা সেরে সন্ধ্যের পর শান্তনু উঠে যায় ট্যুইশনী করতে। মঞ্জুশ্রীও সেই একই বাড়িতে পড়ায়। শান্তনুর ছাত্রের ছোট দুই বোনকে সে পড়াতে আসে। একই বাড়িতে পরপর দুজনের যাতায়াত। শান্তনু যখন আসে তখন ওর পড়ানো শেষ হয়। এবং মাঝে মাঝে বাড়ির সামনের গলিটায় প্রায়ই মুখোমুখি দুজনের দেখা হয়ে যায়।

ঘটনাটা যে একেবারে আকস্মিক তা নয়। শান্তনু মোটামুটি সময়টা হিসেব করেই গলিতে ঢোকে। দু একদিন মোড়ের মাথায় দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চোরাচোখে গলির দিকে নজরও রাখে। তাকিয়ে দেখে মঞ্জুশ্রী আসছে কি না। তারপর ওকে দেখতে পেলেই খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে যায়।

গলিটা খুব সরু। পাশাপাশি খুব কষ্ট করেই দুজন মানুষ হাঁটতে পারে। দুদিকে পাঁচিল টানা কানাগলি। ওপর থেকে একটা মাত্র মিটমিটে আলো গলা বাড়িয়ে একটুখানি জায়গা উজ্জ্বল করে রেখেছে। ঠিক এইখানটায় কখনো কখনো পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মঞ্জুশ্রী চোখ তুলে তাকায়। চোখের মণি দুটো যেন একটু নড়ে চড়ে ওঠে। ম্লান আলোটার মত অবাস্তব এক চিলতে হাসি যেন দেখা যায় মুখে। শান্তনু ঘাবড়ে যায়। বুকের মধ্যে কোথাও ধ্বক করে ওঠে যেন। মঞ্জুশ্রী কি বুঝতে পারে তার দেখা করার এই কৌশলটা? শান্তনু হাসে, 'শেষ হল আপনার?' মঞ্জুশ্রী আলতো করে ঘাড়টা দুলিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায়।

রোজ মনে মনে অনেক কিছু ভেবে এলেও আর কিছুই বলতে পারে না শান্তনু। মঞ্জুশ্রীর চোখের দিকেই তাকালেই কেমন নার্ভাস লাগে। ঝাপসা আলোর নিচেয় সব কিছু যেন ঝাপসা হয়ে যায় তার। নিজেকেই কেমন অদ্ভুত লাগে তখন। বুকের মধ্যে শিরশির করা এক অনুভূতি অনেকক্ষণ ধরে আচ্ছন্ন করে রাখে তাকে।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস—এখানেও দিনগুলো অনেকটা যেন একই-

ভাবে গড়িয়ে চলে। শান্তনু প্রায় প্রতিদিনই একটা কথা বলার কথা ভাবে। কিন্তু বলা হয় না। মঞ্জুশ্রী যেতে যেতে চোখ তুলে তাকায়, হাসে। কিন্তু থেমে দাঁড়ায় না কখনো।

মাত্র পাঁচটি বছর। একটা গোটা জীবনের কাছে এই সময়ের মূল্য আর কতটুকু? তবু এই সামান্য সময়ের মধ্যেই শান্তনুর জীবনের অনেক কিছুই বদলে যায়। কলেজ জীবনের কত জল্পনা কল্পনা আর উচ্চাশার অবসান ঘটিয়ে শান্তনু অবশেষে এক অখ্যাত মার্চেন্ট অফিসের কর্মী এখন। চাকরিটার নাকি ভবিষ্যৎ ভাল। লেগে থাকতে পারলে একদিন বড় কিছু একটা হয়েও যেতে পারে। অবশ্য যারা বহুদিন ধরে লেগে আছে তাদের দেখে খুব একটা ভরসা পায় না শান্তনু।

তবু সে আর সবকিছু ছেড়ে এই নতুন জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। অসহ্য খাটুনি সারা দিন ধরে। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত মাথা তোলবার অবকাশ নেই। বিকেলে অফিস থেকে বেরোবার পরও মাথার মধ্যে অফিসটা ঘোঁট পাকিয়ে জড়িয়ে থাকে যেন। এলোমেলো খানিকটা ঘুরে তখন সময় কাটায় সে। কোনদিন সিনেমা দেখে। কোনদিন খানিকটা আড্ডা দেয়। আবার কোনদিন বা কিছুই না করে চুপচাপ বসে থাকে। মাঝে মাঝে মঞ্জুশ্রীর কথা মনে পড়ে। খুব মনে পড়ে। তার সঙ্গে আর দেখা হয় না। দেখা হবার কথাও অবশ্য নয়। তাদের সেই রুটটা অনেকদিন হল পাল্টে গেছে।

তার ঘরের একদিকে একখানা পুরোনো ক্যালেণ্ডার। বছর ফুরিয়ে যাবার পরও এটাকে সে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। ছবিটা অবশ্য এমন কিছুই নয়। নীল পটের ওপর জল রঙে আঁকা একটি মেয়ের মুখ। কিন্তু এই মুখটার সঙ্গেই যেন মঞ্জুশ্রীর একটা ভীষণ মিল খুঁজে পায় শান্তনু। ছোট্ট কপাল, ঢেউ তোলা চুল, সরু চিবুক, প্রতিমার মত টানা চোখ। টল টলে চোখে উদাস দৃষ্টি, এমন কি কপালের টিপটা পর্যন্ত মিলে যায়। ছবিটার দিকে চুপচাপ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কেমন অদ্ভুত লাগে। মঞ্জুশ্রীর মুখটা যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পায় সে। গাড়ি ছুটছে তীব্র বেগে। জানালার কাছে একটা চৌকোনা ফ্রেমের মধ্যে তার মুখ। তার শরীরে এক ঝিম ঝিম কাঁপুনি। মাথাটা তুলছে। সিটি বাজছে ট্রেনের। জানালার বাইরে ডাউন ট্রেন, ইলেকট্রিক পোস্ট, গাছগাছালি হুস্ হুস্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। মঞ্জুশ্রী কিছুই দেখছে না......

অথবা সেই কুয়াশার মত ঝাপসা আলোর নিচে হেঁটে আসছে মঞ্জুশ্রী। শান্তনু থেমে দাঁড়ায়। কিছু একটা বলতে গিয়েও কথা খুঁজে পায় না। মঞ্জুশ্রীর মুখে মৃদু হাসি। এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ দেহে মনে। স্বপ্নের মত দৃশ্যগুলো এক এক করে ভেসে উঠতে থাকে যেন।

এক একদিন কল্পনায় অনেকক্ষণ ধরে মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে পথ হাঁটে সে। যেন খুব পাশাপাশি অনেকদূর পর্যন্ত হেঁটে যাচ্ছে তারা। কথা বলছে দুজনে। যে সব কথাগুলো বলতে পারত, সেই সব কথা। মনে মনে কথাগুলো সাজিয়ে মঞ্জুশ্রীর একটা কাল্পনিক উত্তরও অনুমান করে। তার জবাবটাও ভাবে। অনেকক্ষণ ধরে চলে সেই কাল্পনিক সংলাপ আর রোমাঞ্চকর ভ্রমণ। এ এক স্বপ্নের মতো খেলা! অথচ খুবই ব্যক্তিগত গোপন এক নেশা। যা ঘরে ফেরা সন্ধ্যায় শান্তনুকে এক অদ্ভুত আকর্ষণে টানে। মনের মধ্যে এখনো সেই পুরনো সময়টা কোথাও থেমে আছে। দরজা খুললেই সেটা এক অলৌকিক দৃশ্যের মত চোখের সামনে বয়ে যায়।

মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে আর একবার কখনো নিশ্চয়ই দেখা হবে। অনেকদিন এমন মনে হয়। হয়তো তখনো সে তেমনি তাকে চিনতে চাইবে না। তবু একবার ঠিক দেখা হবে। বারবার ভেবেছে শান্তনু। শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যিই দেখা হয়ে গেল তাদের। কিন্তু এমনভাবে দেখা হওয়ার কথা সে ভাবেনি।

টিফিনের সময় অফিস পাড়ার এক রেষ্টুরেন্টে ঢুকে হঠাৎ একদিন সে মঞ্জুশ্রীকে দেখল। চা খেতে খেতে গল্প করছে মঞ্জুশ্রী। একই সঙ্গে অনর্গল কথা বলে চলেছে তিনটে মেয়ে। বোস সাহেব,..মিত্তিরের সঙ্গে তপতীর বাড়াবাড়ি,..অফিস অর্ডার···ডেসপ্যাচের নন্দবাবুর সঙ্গে পারুল সেনের মাখামাখি..হেনার লিফট..। কথা বলতে বলতে তিনজনে একই সঙ্গে হাসছে। হাসতে হাসতে চেয়ারে এলিয়ে যাচ্ছে তিনটে শরীর।

মঞ্জুশ্রীকে এই প্রথম খুব জোরে কোন কথা বলতে শুনল শান্তনু। অসংকোচ হাসির শব্দও এই প্রথম। গলার স্বরটা যেন বড় কর্কশ। হাসিটাও কেমন বাচাল। মুখটাও আগের মত লাজুক নেই। একটা কঠিন কঠিন ভাব। বয়সের ছোপ লাগা চোয়াল দুটো জেগে উঠেছে ওপরে। চোখে মুখে একটা শুকনো রুক্ষ ছাপ। শরীরটাও আগের চেয়ে অনেক রোগা।

হঠাৎ চোখে পড়ল মঞ্জুশ্রী তাকে দেখছে। একেবারে সোজাসুজি। শান্তনু

যেন আড়ষ্ট হয়ে যায় একটু। বেরিয়ে যাবার মুখে সোজা তার টেবিলের দিকে এগিয়ে এল মঞ্জুশ্রী। একটু হাসল ঘাড় দুলিয়ে।

—ভালো আছেন ?

শান্তনু অবাক। এক দৃষ্টিতে সে মঞ্জুশ্রীর মুখের দিকে তাকায়। মুখে একটা নরম ভঙ্গি ফুটিয়ে আবার প্রশ্ন করে মঞ্জুশ্রী,

—আমায় চিনতে পারছেন তো ?

শান্তনু মৃদু হেসে এবার ঘাড় নাড়ে। ঠিকমত কোন কথা যোগায় না মুখে। মঞ্জুশ্রীকে এত ঘনিষ্ঠ হতে দেখে সে যেন বিমূঢ় হয়ে যায়। কী বলবে সে তাকে ? বুঝতে পারে না। এক সময় বার বার দেখা হওয়া সত্ত্বেও যার সঙ্গে কখনো পরিচয় হল না, এই কয়েক বছরের দূরত্বের পর সে কেন সহজেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে চায় ? হয়তো এর কোন ব্যাখ্যা নেই।

আবার প্রশ্ন করে মঞ্জুশ্রী—এখানে ?

—এখানেই।

মুখে সৌজন্যের হাসি ফুটিয়ে শান্তনু তার অফিসের নাম বলে। তারপর মঞ্জুশ্রীকে সামনের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে বলে—আপনি ?

—আমিও, দেখতেই তো পাচ্ছেন—বলেই পাশের একটা বড় সরকারী অফিসের দিকে আঙুল দেখাল সে।

মঞ্জুশ্রী বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার দিকে তাকিয়ে আর একবার হাসল। এইবার ও চলে যাবে। শান্তনু বুঝতে পেরেও আর বলার মত কিছু খুঁজে পায় না। মঞ্জুশ্রী দাঁড়াবার ভঙ্গি বদল করল।

—আপনি তো আর পড়াতে যান না এখন তাই না ?

—ন্ না, অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি সে সব। আপনি ? শান্তনু খুব সহজ-ভাবে তার দিকে তাকায়।

—আমি এখনো টিঁকে আছি। তাছাড়া আমরা আজকাল খুব কাছাকাছি উঠে এসেছি। কোন অসুবিধে হয় না।

কথা বলতে বলতে মঞ্জুশ্রী একবার ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো বন্ধুদের দিকে দেখল। ওরা পান কিনছে দোকান থেকে। শান্তনুর ইচ্ছে হল, একবার জিজ্ঞেস করে তারা কোথায় উঠে এসেছে। কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েও বেধে যায়। মঞ্জুশ্রী কী ভাববে কে জানে। তার চোখে আবার সেই উদাসীন ভঙ্গীটা দেখতে পায় সে।

—ওরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আজ চলি কেমন ?

কেমন যেন তার সম্মতি নেবার মত করে কথাটা বলে মঞ্জুশ্রী। তারপর উঁচু হিলের জুতোর ঠুক ঠুক শব্দ তুলে সোজা বেরিয়ে যায়। রাস্তায় নেমে আর একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। শান্তনু সেদিকে তাকিয়ে থেকে অনেকক্ষণ বসে বসে সিগারেট টানল।

সেদিন রাত্তিরে ঘরে ফিরে ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল শান্তনু। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে মুখটার কোথাও যেন একটা ক্লান্তির ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। মলিন হয়ে আসা রঙের মধ্যে এখন একটু রুক্ষতার আভাস। কাছে থেকে দেখলে চোয়ালের হাড় দুটোও বেশ স্পষ্ট। চোখ দুটো কেমন নিষ্প্রভ। শান্তনু যেন এতদিন খেয়াল করে দেখেনি এগুলো।

শেষ দেখা আরও চার বছর পরে। পুরীর সী বীচের এক সকালে। দেখেই বোঝা গেল মঞ্জুশ্রীর সদ্য বিয়ে হয়েছে। ভারি সুন্দর লাগল বৌ বৌ মঞ্জুশ্রীকে। সমস্ত চোখে মুখে একটা সতেজ স্নিগ্ধতা। সকালের নরম জাফরানী রোদ্দুর তার সারা শরীরে এক আশ্চর্য লাবণ্য ফুটিয়ে তুলছে। সমুদ্র সৈকতের সবচেয়ে রূপসী নারীর মত এক অহঙ্কারী ভঙ্গিতে সে হেঁটে আসছে। পায়ে জুতো নেই। নূপুর পরা টকটকে ফরসা দুখানা পা। কত লোকে তাকে দেখছে। কিন্তু মঞ্জুশ্রী কারো দিকে দেখছে না।

তুলনায় তার স্বামীকে এক বিশাল মুষ্টিযোদ্ধার মত মনে হল। ছ ফুটের মত লম্বা, পেটানো চেহারা। দু'গালে অজস্র বড় বড় ব্রণ। চওড়া কপাল। সামনের দিকে দু একটা চুল পাকা। লোকটাকে যেন পছন্দ করতে পারে না শান্তনু। অন্তত মঞ্জুশ্রীর স্বামী হিসেবে তো নয়ই। কিন্তু মঞ্জুশ্রীকে তো বেশ খুশি খুশিই লাগছে।

শান্তনু ভেবেছিল মঞ্জুশ্রী ওকে দেখতে পাবে না। কিংবা পেলেও আজ হয়তো আর কথা বলবে না। কিন্তু মঞ্জুশ্রী ওকে দেখল এবং খুব উৎফুল্ল হয়েই এগিয়ে এল।

—আরে, আপনি কবে এসেছেন ? ভালো তো ?

খুব চেনা জানা মেয়ের মত কথা বলতে শুরু করে মঞ্জুশ্রী। কোন উত্তর দেবার আগে শান্তনু ওর স্বামীর দিকে তাকাল। পরিচয় করিয়ে দেয় সে তার সঙ্গে। অজয় সান্যাল; ডেন্টিস্ট। মিঃ সান্যাল এতক্ষণ গালের ব্রণ টিপতে টিপতে শান্তনুকে জরিপ করছিলেন। পরিচয় পেয়েই দ্রুত হাত তুলে নমস্কার করলেন।

কি আশ্চর্য, তাই নাকি ? খুব খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, আসুন—

পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি।

—তার—পর ওখানেই আছেন তো ?—কেমন একটা টানা টানা সুরে প্রশ্ন করে মঞ্জুশ্রী।

—না চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। পেট্রল পাম্পের দোকান করেছি একটা। শান্তনু হাসল একটু।

—পেট্রল পাম্প কোথায় বলুন তো ?

শান্তনুর জবাবটা প্রায় লুফে নিলেন সান্যাল। তারপর ঠিকানা শুনেই উল্লাসের ভঙ্গিতে বললেন,

—আরে তাই নাকি ? ওটা তো আমার রুটেই পড়ে। যাক হানা দেওয়া যাবে মাঝে মাঝে। ভুরু তুলে বেশ ভরসা দেবার মত করে তার দিকে তাকালেন সান্যাল।

—ভীষণ আশ্চর্য মানুষ তো আপনি! কোন কিছুই বোধ হয় বেশীদিন ভাল লাগে না আপনার—

একটা অদ্ভুত অচেনা ভঙ্গিতে কথা বলে মঞ্জুশ্রী। তার চোখ দুটোকে যেন এই প্রথম রহস্যময় হয়ে উঠতে দেখল শান্তনু। মৃদু হেসে সে আবার প্রশ্ন করে,

—একা যে ? সঙ্গে কেউ নেই নাকি ?

—একাই। কটকে একটা কাজ ছিল, সেটা সেরে একবার এলাম এদিকে।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয় শান্তনু। একটু যেন বিব্রত বোধ করে সে প্রসঙ্গটায়। মিঃ সান্যালই বাঁচিয়ে দিলেন তাকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন, চলুন মশাই ওদিকটায় একটু ঘুরে আসি। যেতে যেতে গল্প করা যাবে এখন।

শান্তনুর দোকানে একদিন গাড়ি নিয়ে সত্যিই হাজির হলেন সান্যাল। তেল ভর্তি করে গাড়িটা ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনেছেন। ঠকেছেন না জিতেছেন সেটাই তিনি জানতে চান। তারপর,— আচ্ছা ভাই, আর একদিন আসা যাবে—বলে বিদায় নিলেন। শান্তনু ভেবেছিল,

একবার মঞ্জুশ্রীর কথা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু সান্যাল এ প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেলেন না।

আরও দু-একবার এলেন সান্যাল। তারপর একেবারে লম্বা ডুব। আর দেখা নেই। শান্তনুর বিশ্বাস ছিল একদিন হয়তো মঞ্জুশ্রীকে নিয়েই তার দোকানে হাজির হবেন সান্যাল। মনে মনে অনেকদিন প্রতীক্ষা করেছিল সে। কিন্তু তা ঘটল না। তার বদলে সান্যালের গাড়িতে অন্য একটি মেয়েকে দেখা গেল একদিন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ দেখতে পেল সে। খুব জমকালো পোষাক পরা একটি মেয়ে। ছোট ছোট চুল, চড়া রঙ লাগানো ঠোঁটে। একটু যেন অবাঙালী চেহারা। সান্যালের কী একটা রসিকতায় সে যেন তার গায়ের ওপরই লুটিয়ে পড়ছে। ভাল করে দেখবার আগেই গাড়িটা তার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

শান্তনু ভীষণ চমকে যায়। এত তাড়াতাড়ি এ রকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে তা সে কখনই ভাবেনি। মিঃ সান্যালকে অবশ্য তার প্রথম দিন থেকেই কেমন পছন্দ হয় নি। কিন্তু তাহলেও এমনটা কখনো আন্দাজ করতে পারা যায়নি। মঞ্জুশ্রীর জন্যে কিছু একটা করা দরকার। ভীষণ দুঃখের সময় এখন মঞ্জুশ্রীর। সে কি জানে সব কথা ? বুকের মধ্যে কেমন মোচড় খেয়ে যায় অদ্ভুত এক অনুভূতি। মঞ্জুশ্রীকে সব কথা জানিয়েও বা সে কি করতে পারে এখন ? হয়তো বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। মনে মনে তার ঘরের ছবিটার কথা একবার ভাবল শান্তনু। জল রঙে আঁকা সেই প্রতিমার মত মুখটা। সেটা এখনো তেমনি নিষ্পন্দ হয়ে আছে।

বেশ কয়েকমাস পরে আবার একদিন এলেন সান্যাল। চুলে আরও পাক ধরেছে। শরীরটা সমান মজবুত। একটু যেন গম্ভীর আগের চেয়ে। গাড়িতে তেল ভরা হয়ে গেলে শান্তনু এসে সামনে দাঁড়াল একবার। কথায় কথায় জানতে চাইল।

—তারপর কেমন আছেন আপনারা ? মিসেস সান্যাল ভালতো ?

কাঁধ তুলে মাথা ঝাঁকালেন সান্যাল—

ওহ্ হো! ভেরি সরি, রিয়েলি আই'ম সরি—আপনাকে ত দেয়াই হয়নি দুঃবাদটা। মঞ্জুশ্রী আর নেই! লাষ্ট জুনে ডেলিভারির সময় ও আমাদের ছেড়ে গেছে। চেষ্টার ত্রুটি করিনি, কিন্তু বাঁচানো গেল না। সবই ভাগ্য—।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে স্বগতোক্তি করতে লাগলেন সান্যাল—গত বছর

থেকেই আমার সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে। মঞ্জু চলে গেল, বাড়িতে চুরি হয়ে গেল দু দুবার, নিজের শরীরটাও ট্রাবল দিচ্ছে নানারকম ..

কী সহজে সান্যাল এক নিশ্বাসে সব কথাগুলো উচ্চারণ করছিলেন। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না শান্তনু। বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে ঠেলে উঠছে। কেমন অসাড় হয়ে আসে শরীরটা। মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। নিতান্তই পরিচিত একটি মেয়ের মৃত্যু সংবাদের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নয় এই খবরটা। তবু সে নিজেকে সামলাতে পারে না। একটা তীব্র জ্বালা ধরানো অনুভূতি যেন তার চোখে মুখে সামনে হুল ফুটিয়ে চলে।

সান্যাল গাড়ির বনেটে হাত রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঝকঝকে ধূসর রঙের বনেটের ওপর চওড়া লোমশ হাতে সিগারেট জ্বলছে তার লোমশ কব্জির পাশে শান্তনুর মুখের ছায়া। নিজের ছায়াটার দিকে তাকাল শান্তনু। ভাঙা চোরা একখানা বিষণ্ণ মুখ। দু চোখের গর্তে অন্ধকার। সান্যালের সিগারেট থেকে লম্বা ছাইয়ের দলা ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের ছায়া ভাসে বনেটে। সান্যাল কপাল কুঁচকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরলোকগত স্ত্রীর উদ্দেশ্যে হঠাৎ কয়েক মিনিটের নীরবতা পালন করেছেন যেন।

তারপর এক সময় পেট্রল ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল গাড়িটা। শান্তনু তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটার যাওয়া দেখল।

বাইরে গভীর রাত। শান্তনুর ঘুম আসছিল না আজ। সে চুপচাপ বসে বসে সিগারেট টানছিল। জলরঙের ছবিটা নির্বাক। প্রতিমার মত মুখ। ধুলোর প্রলেপ পড়ে পড়ে একটু যেন ঝাপসা। মাকড়শা জাল বুনতে আরম্ভ করেছে একপাশে। ছবিটার দিকে চোখ ফিরিয়ে হঠাৎ সে একটা নতুন আদল দেখতে পায় যেন। অবিকল সেই মুখ। যেন এই মুহূর্তে খোলস ছাড়িয়ে জেগে উঠল ছবিটা। শান্তনু চোখ বন্ধ করে ফেলল। সেই আগের চেহারাটা। তেমনি আছে। সেই স্নিগ্ধ, লাজুক, উদাসীন মুখ।

শান্তনুর মনে হতে থাকল তার চারপাশে সেই পুরোনো সময়টাই বুঝি জেগে উঠছে। কেমন এক অদ্ভুত আনন্দে হাল্কা হয়ে আসছিল তার মন। মঞ্জুশ্রী হয়তো আর নেই ! কিন্তু এই মুহূর্তে তার কাছে মঞ্জুশ্রীর বেঁচে থাকবার আর প্রয়োজনও নেই। মনে মনে তার মৃত্যুকেই যেন স্বাগত জানাল সে।

কপাট

সুধাংশু ঘোষ

তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে শীতের বেলা তাই হয়ত আমাদের খেলায় এমন তীব্র গতি এসেছে। ক্রমে আলো ফুরিয়ে যাবে, সন্ধ্যার ছায়ারা ঘনিয়ে আসবে চার দিক থেকে, তখনো আমাদের খেলা চলবে। অবশেষে সত্যি অন্ধকার নামলে খেলা বন্ধ। সময় কম, শীতের বিকেল ফুরিয়ে যাবে এখনই, তার আগেই বোঝাপড়া করে নিতে হবে। পৌষের বিকেলে ঠাণ্ডা বাতাস। তবু আমাদের জুলপি থেকে গাল বেয়ে ঘামের ঝুরি নেমেছে, শুধু নাক যথেষ্ট অক্সিজেন টানতে পারছে না, খ্যাপা ঘোড়ার মতন হাঁ করে ছুটছে সবাই, মুখ দিয়েও নিঃশ্বাস নিচ্ছে। জলকাদা মাখা একটা বাতিল টেনিস বল ওদের গোল থেকে নিমেষে আমাদের গোলের দিকে চলে আসছে। আমরা এখনো হারছি দুগোলে।

আকারে ছোট হলেও খেলার মাঠের মতন খানিকটা খোলা জায়গা। কোথাও অবশ্য ঘাস নেই, উদম ধুলো মাটি। চারপাশে বাড়ি। তার মধ্যে আমাদের তিনতলা বাড়িটা সব থেকে উঁচু। উত্তর দিকের একতলা বাড়িগুলোর টিনের চাল। সেই দিকেই মাঠের পাশে একটা টিউবওয়েল। তার জল বেয়ে বেয়ে চলে এসেছে প্রায় মাঠের মাঝখানে। সেই জলকাদা মেখে বাতিল টেনিস বলটা ভারী হয়েছে।

আমি আমাদের দলের গোলকীপার। তাই চার পাশ একটু দেখাটেখার অবকাশ পাচ্ছি। অন্যরা বিশ্বচরাচর ভুলেছে। শীতের বেলা, হাতে বেশী সময় নেই, শেষ বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

বাতিল টেনিস বল নিয়ে আমরা ফুটবল খেলছি, অথচ আমরা অনেকেই আর ছেলেমানুষ নই। দু দলেই এমন কয়েকজন আছে যাদের বয়েস পনেরোর এদিক ওদিক। তবে আমরা অনেকেই আর ছেলেমানুষ নই, পুরোপুরি যুবক। মাসখানেক হল ছোটদের সঙ্গে আমরা যুবকরা মেতেছি এই খেলায়, রোজ বিকেলে। ভোলাদার চায়ের দোকানে পুলিসের তাড়া খেয়ে আমরা এদিকে একটু গুটিয়ে এসেছি।

আমাদের দলের সব থেকে তেজী ঘোড়া আমার ছোট ভাই সুবীর। আমাদের সেণ্টার ফরওয়ার্ড। দু গোলে পিছিয়ে আছি আমরা। আমাদের তিনতলা বাড়ির ছাতের রেলিং থেকে, উত্তর দিকের বাড়িগুলোর টিনের চাল থেকে পিছলে যাচ্ছে শেষ বিকেলের আলো। খানিক পরে জলকাদা মাখা বলটা আর ভালো করে দেখা যাবে না। আমরা জানি, তার আগেই সুবীর গোল দুটো শোধ করে দেবে, আরো বাড়তি গোল দিয়ে জিতিয়ে দেবে আমাদের।

সুবীর তিন বছর আগে কলেজ ছেড়ে মিলিটারিতে চলে গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। সেখানে কি সব কাণ্ড করে আবার ফিরে এসে কলেজে ঢুকেছে। আমি বি-এ পাস করে চাকরি না পেয়ে আইন পড়ছি। সামনে শেষ পরীক্ষা। পাস করলে কোন দিন কালো কোট পরে আদালতে যাব ভাবলে অবিশ্বাস্য মনে হয়, হাসি পায়। আমার আর এক ভাই বি-এস-সি পাস করে ব্যবসা করছে। এই তিন ভাই খেলায় নেমেছি। দাদা শুধু খেলছে না। ব্যাঙ্কে চাকরি পাওয়ার পর আমাদের সঙ্গে মেশে না তেমন। তার বিয়ের কথা চলছে। বাবার চাকরী বিদেশী সওদাগরী অফিসে। আমরা চার ভাই পাড়ার চারটি রত্ন। মা'র আদরের ভাষায় চারটি দৈত্য। পাড়ার কারো বিপদ হলে সবার আগে আমাদের ডাক পড়ে, যে কোন উৎসবের আমরাই উদ্যোক্তা, অন্য ছেলেরা আমাদের ছায়া।

বেলা যে পড়ে এলো, এখনো গোল শোধ হয় নি। এবাড়ি-ওবাড়ীর ছাতে-বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা যুবকদের ছেলেমানুষি খেলা দেখছে। আমি পুব দিকের গোলে। বেশ খানিকক্ষণ শুধু দেখছি, বল আটকাতে ব্যস্ত নই, আমাদের দিকে চাপ কমে গেছে। মাঠের পশ্চিমে ওদের গোলে নাড়ু। আমাদের ফরওয়ার্ডেদের হামলায় পাগলা হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে নাড়ু কয়েকটা অবধারিত গোল বাঁচিয়েছে। তারিফ না করে পারি না।

আমাদের সেণ্টার ফরওয়ার্ড সুবীরের গোল করার একটা মোক্ষম কায়দা আছে। সব বাধা ডিঙিয়ে গোলকীপারের মুখোমুখী হতে পারলে বলটা আঙুলের খোঁচায় একটু শূন্যে ভাসিয়ে নেয়, তারপর মারে। ব্যাপারটা নিমেষে ঘটে যায়। বুলেটের গতি পায় বলটা। গোলকীপার ভয়ে সরে যায়। লাগলে দাঁত নাক চোখ সত্যি জখম হতে পারে! সুবীরের বিরোধী দলের গোলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে আমার কানের পাশে বুলেটের শিস আমি শুনেছি।

কোমরে হাত রেখে তেমন একটা মুহূর্তের অপেক্ষা করছিলাম। আমার ঘাম শুকিয়ে এসেছে। হাওয়ার একটা ঝাপটা এলো। বুঝতে পারলাম, শীতের

বিকেলেয় ঠাণ্ডা বাতাস। নাড়ুর পক্ষে কেমন অশুভ মনে হল সেই এলোমেলো হাওয়া। আমাদের সব থেকে তেজী ঘোড়াটা দেখলাম নাড়ুর দিকে উড়ে যাচ্ছে। বলটা মাথায় বুকে পায়ে সেঁটে নিয়ে সুবীর ডাইনে বাঁয়ে ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে সব বাধা পেরিয়ে একা নাড়ুর মুখোমুখি হল। আঙুলের খোঁচায় বলটাকে ফুটখানেক ওপরে ভাসিয়ে নিল, তারপর মারল। গোল ছেড়ে সরে গেল আতঙ্কিত নাড়ু।

পশ্চিমের গোলপোস্টের পিছনে একটা আকাশ-ছোঁয়া নারকেল গাছ, ধনুকের মতন বাঁকা। সেই গাছে ঠেসান দিয়ে একা ঝুটকি আমাদের খেলা দেখছিল। অন্য মেয়েরা বাড়ীর ছাতে অথবা বারান্দায়। ঝুটকি একা মাঠের মধ্যে নারকেল গাছে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে এত কাছ থেকে আমাদের খেলা দেখছিল। নাড়ু সরে যেতে বলটা বুলেটের বেগে ঝুটকির বুকের মাঝখানে গিয়ে লাগল। পুব দিকের গোলে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট দেখলাম, ঝুটকির বুকের ঠিক মাঝখানে জলকাদার গোল দাগ।

সুবীরের চিৎকার শুনলাম, 'অ্যাই ঝুটকি, এখান থেকে সরে যা।' খ্যাপা ঘোড়ার হ্রেষার মতন মনে হল।

ঝুটকি নড়ল না। নারকোল গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। বুকে আঘাতের প্রদর্শনী, মুখে কষ্টের ছায়া নেই। বরং সানন্দ স্বীকৃতির ভঙ্গি।

বাতিল টেনিস বল এমনিতে তেমন ভারী নয়। তবে আমাদের বলটা রোজ জলকাদা শুষে ওজন বাড়িয়ে নিয়েছে। মোটা চামড়ায়ও জোরে লাগলে জ্বালা করে। আমি গোলকিপার, আমি জানি।

ঝুটকি ছেলেমানুষ নয়। টিউবওয়েলটার লাগোয়া টিনের বাড়ীর পার্বতীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে, বয়েস অন্তত কুড়ি পেরিয়ে গেছে। দারুণ ফরসা, শরীরে স্বাস্থ্যের ঢল নেমেছে, তবে পুরু ঠোঁট, ভোঁতা নাক, বোকা বোকা মুখ। শৈশবে চুলের কোনো বিচিত্র বিন্যাসের জন্য পাড়ায় নাম হয়েছিল ঝুটকি।

ছোটদের সঙ্গে আমরা যুবকরা সম্প্রতি এই খেলায় মেতেছি। ফুটবল খেলার পোশাক নেই আমাদের কারো। কেউ আণ্ডারওয়্যার, কেউ পাজামা, কেউ ট্রাউজার্স হাঁটুর ওপর পর্যন্ত গুটিয়ে আমরা মাঠে নেমে যাই। কারো গেঞ্জি, কারো হাওয়াই শার্ট পরা, কারো খালি গা। কারো ধার করা হাফ প্যাণ্ট সেলাই বরাবর ফেঁসে যায়। লোমস বুকে ঘাম জমে, উরুদেশ বেয়ে ঘামের স্রোত নামে, পেশী ফুলে

ওঠে। লিকলিকে পেন্সিলের মতন খেলোয়াড় অবশ্যই আছে, যেমন আমাদের একতলার ভাড়াটেদের ছেলেটা, তবে আমরাও আছি, দস্যুরা। এত কাছে একা দাঁড়িয়ে কি খেলা দেখতে আসে ঝুটকি? কি ছ্যাখে?

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখানো ঝুটকির বাবা পার্বতীচরণের পেশা। এখন চোখে মোটেই দেখতে পান না, কোথাও যেতে পারেন না। দুচার জন ছাত্রছাত্রী আসে, রাগ-প্রধান গান শেখে। ঝুটকির ভাই মোহন কিছু কাজটাজ করে না। দিদির মতন ফরসা, লম্বা, ভালো স্বাস্থ্য, কিন্তু মাঝে মাঝেই হন্যে হয়ে যায়। দেয়ালে মাথা ঠুকে নিজের কপাল ফাটায়, নিজের রক্ত দেখার পর অন্যদের রক্ত দেখতে চায়। বালতি, দরজার হুড়কো ইত্যাদি দিয়ে বাড়ীর লোকদের মারে। তখন অমানুষিক শক্তি আসে তার গায়ে। মা'র আদরের দৈত্যদের ডাক পাড়ে। আমরা বাড়ি থাকলে দৌড়ে যাই, মোহনকে চেপে ধরি, একজন পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনে। ইঞ্জেকশন খেয়ে মোহন ঘুমোয়। পড়ে থাকে কয়েক ঘন্টা, যেন জ্যান্ত নয়, একটা লাশ।

অন্য সময়ে যখন ভালো থাকে, মোহনের খুব অহঙ্কার। তবলায় ঠেকা দিতে পারে, নিজেকে বলে বেতার শিল্পীর ছেলে। তিরিশ বছর আগে পার্বতীচরণ নাকি একবার রেডিওয় গান করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর নামের সঙ্গে বেতার-শিল্পী কথাটা সেঁটে গেছে।

মোহন আমাদের মাঠে ক্বচিৎ খেলতে নামে। আজ নামে নি।

ঝুটকিকে আমাদের বাড়িতে দেখা যায় যখন-তখন, নিতান্ত অসময়ে ও মা'র পিছনে ঘুরছে, কি সব আরজি রাখছে ফিসফিস করে। আচলের তলায় কিছু লুকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নেমে যেতে দেখেছি। তখন সামনে পড়ে গেলে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নেয়, চোখের দিকে তাকায় না, কথা বলে না। তখন ঝুটকিকে দুঃখী মনে হয় বলেই হয়ত ততটা আর বোকা বোকা লাগে না।

আজ সুবীর একটা গোল শোধ দেবার পরও আরো পনর-কুড়ি মিনিট খেলা হল। কিন্তু অন্য দিনের মতন সুবীরের শেষ সময়ের তেজ আজ দেখলাম না। গোলের কাছে গিয়েই কেমন ঢিলে হয়ে পড়ছে, বল কেড়ে নিচ্ছে ওদের খেলোয়াড়রা। আমরা এক গোলে হেরে গেলাম।

তখনো নারকেল গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে ঝুটকি দাঁড়িয়ে। পুব দিকের গোল থেকে দেখলাম, পশ্চিমের গোলপোস্টের পিছনে ঝুটকির শরীরের তীক্ষ্ণ প্রান্তরেখা আবছায়ায় ভাসছে।

কয়েকদিন খেলা তেমন জমল না। বড়দের ছেলেমানুষি নেশা কেটে যাচ্ছিল। তার মুল কারণ সুবীরের উৎসাহ কমতি। সুবীরই আমাদের এই খেলায় মাতিয়ে-ছিল। সে-ই পিছিয়ে গেল। তাছাড়া ভোলাদা আবার আমাদের ডাকছিল, আদর করে ডাকছিল তার চায়ের দোকানে। সুতরাং উদম ধুলোমাটির ছোট মাঠে শুধু ছোটরাই রয়ে গেল বাতিল টেনিস বল পেটাতে।

ভোলাদার চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে আমরাই রাজা। মাঝে আমরা একটু সরে গিয়েছিলাম। এর জন্য দায়ী ডিগডিগে গৌতম ছেলেটা। ছেলেটা বললে মানায় না, গৌতমের প্রায় আমার বয়েস। দেবাশিস সরখেল নামে একটা লোক আছে, খুব চালু। ঠিক আমাদের পাড়ার লোক নয়। আমাদের গলির বাইরে বড় রাস্তায় ফ্ল্যাটবাড়িতে ভাড়া থাকে। বছর পাঁচেক হল এদিকে এসেছে। তার বোনটা কলেজে পড়ত। বোনটার বিয়ে ঠিক হলে গৌতম গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজার কড়া নেড়ে সরাসরি সরখেলকে বলে এসেছিল, অন্য কোথাও বোনের বিয়ে দিলে বিয়ের রাত্তিরেই বোন বিধবা হবে। এই কাণ্ড করার আগে গৌতম আমাদের কাউকে কিছু বলে নি, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নি। গৌতম নিশ্চয়ই জানে, এসব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে আমরা থাকতে চাই না। পাড়ায় আর যাই হোক আমাদের সুনাম আছে। তাই হয়ত গৌতম একা গিয়ে ওই নাটক করে এসেছিল।

পরদিন থেকে পুলিসের দু তিনটে সাব ইন্সপেক্টর ভোলাদার দোকানে জমিয়ে বসল। এদিকের থানার কে নাকি সরখেলের দোস্ত। পুলিস আমাদের দিকে নজর রাখবার জন্য এসেছে বুঝেও পুলিস দেখেই আমরা সরে আসি নি। দুটো সাব ইন্সপেক্টর আমাদের ভয় দেখাতে পারে নি, বলাই বাহুল্য। গৌতমের ওপর আমরা বিরক্ত হয়েছিলাম। তাকে একটু কড়কে দিলাম। আমাদের আসল রাগ অথবা ক্ষোভ অথবা অভিমান ভোলাদার ওপর। পুলিস পেয়ে গিয়ে ভোলাদা আমাদের যেন ভুলেই গেল। সব সময় পুলিসের আরামের দিকে লক্ষ্য। আমাদের কোনো পাত্তা নেই। আমরা যেন উটকো লোক। বিকেলে ভোলাদার দোকানে একটা ফিস রোল তৈরী হয়। তেলাপিয়াফিয়া দিয়ে বানায় হয়ত। কিন্তু খেতে ভালো, আর খুব সস্তা। বাইরের লোক ভোলাদার দোকানে বিশেষ আসে না। একদিন বিকেলে আমরা একটাও ফিস রোল পেলাম না। ভোলাদা আহ্লাদে গলে গিয়ে জানাল, পুলিস সব ফিস রোল নিয়ে নিয়েছে। থানার মধ্যে কোয়ার্টার আছে।

ঘেন্নায় আমরা ভোলাদার দোকান বয়কট করেছিলাম, খেলায় মেতেছিলাম ছোটদের সঙ্গে।

সরখেলের বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আমাদের নেমন্তন্ন হয়নি। আমরা চাই-ও নি। মেয়েটা ড্যাং ড্যাং করে জব্বলপুরে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। গৌতম নিজের পকেট ফাঁক করে অন্যদের কাছ থেকে ভিক্ষে নিয়ে অবিরাম চারমিনার ফুকছে।

পুলিস সরে গেলে ভোলাদা আমাদের আদর করে ডাকল। বলল, 'তোরা আমার চিরকালের। তোরা না এলে দোকান তুলে দেব।' বেহায়া গৌতমটা ছাড়ল না, ফিরে এসে বেঞ্চিতে পা গুটিয়ে বসে ভোলাদাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'এদিকের থানার পুলিসদের পাগুলো হঠাৎ ফরসা হয়ে গেছে দেখলাম। পুলিসের পা চাটল কে রে ?'

ভোলাদা বুঝতে না পারার ভান করল।

ইতিমধ্যে সরস্বতী পুজোটা এসে গেল। সব দায়িত্ব আমাদের। চাঁদা তোলা, মাঠের আধখানা জুড়ে প্যাণ্ডেল বাঁধা। নাওয়া খাওয়ার সময় রইল না। আমরা জানি, শেষের সপ্তাহটা যেন উড়ে চলে যায়, ঝড়ো হাওয়ায় কাটা ঘুড়ির মতন। শেষ সপ্তাহটা ভোলাদা বেশী করে ফিস রোল ভাজছিল।

পুজোর দিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে খিচুড়ি হয়েছে। ঝুটকিদের আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন। বাবার সঙ্গে দাদা আগে খেয়ে নিয়েছে। ঝুটকি, মোহন, ঝুটকির ছোট দুই বোন আর আমরা তিন ভাই খেতে বসেছি আমাদের দোতলার রান্নাঘরের সামনের চওড়া বারান্দায়। ঝুটকির মা-বাবার খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদের বাড়িতে আজ রান্না হয় নি। ঝুটকি সকাল থেকে আমার মাকে সাহায্য করছে।

পুজো শেষ। সবার মেজাজ ভালো। খেতে বসে গল্পটল্প হচ্ছিল। ঝুটকি হঠাৎ একটা কথা বলে দারুণ চমক দিল। বোকা বোকা গলায় ঝুটকি বলল, 'মাসিমা, সেদিন খেলতে খেলতে সুধীর সবার সামনে আমাকে ঝুটকি বলল কেন ? আমাকে অরুনিমা বলতে পারতো না।'

ডেকচিতে হাতা ডুবিয়ে মা চুপ। সুধীর হাঁ করে আছে, মুখের দু ইঞ্চির মধ্যে গ্রাস।

মনে পড়ে গেল, ঝুটকির এমন একটা পোশাকী নাম আছে। বেতার-শিল্পী পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে অরুণিমা।

আরো একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। সুধীর বাতিল টেনিস বল মেরেছিল ঝুটকির বুকের মাঝখানে। সে তো দেড় মাস আগের ব্যাপার। আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই দাগ নিশ্চয়ই এতো দিন নেই, ধুয়ে মুছে গেছে। তাকিয়ে দেখলাম, ঝুটকি নিমেষের জন্য তার বুকের কপাট খুলে দিয়েছে। ওপরের দাগ মুছে গেলেও ভিতরে জলকাদার গোল দাগটা তখনো স্পষ্ট।

কীভাবে মানুষ মরে, বাঁচে

সমীর রক্ষিত

এক নজর দেখলে মনে হয় বুঝি ফুঁ দিলে উড়ে যাবে এমন মেয়ে আতা। উড়ু উড়ু চুল, কাঠি কাঠি হাত, লম্বা গলা আসলে কিন্তু রোগা না, হাড়ে মাংসে। আর সে অনুপাতে বুক পাছা ভারী। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে কিছু আনমনা আধখোলা চোখও চনমনিয়ে ওঠে।

যুব অফিসের সামনে দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে বাঁদিকে বাঁক নেয় আতা গলির মুখে ওদের বাড়ির দিকে।

'এ্যারেই কয় ফিগার।' যুব অফিসে বসে ছোট্না ভুড়ভুড়ি কাটার মত সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিলকের একটা ধমকের জন্য প্রতীক্ষা করে। সাধারণতঃ তিলক ক্ষেপে ওঠে, বলে—'শালা ঢ্যামনামি করবি না বলে দিচ্ছি, ওর পেছনে লাগবি তো পাছায় লাথ মারব।'

কিন্তু আজ তিলক কিছুই বলে না। মুহুর্মুহু চারমিনার ফোঁকে তিলক, তাকায় চলে যাওয়া আতার দিকে, সোজাসুজি না, আড়ে। অথচ আতাকে দেখামাত্র—সে যতদুর দিয়েই যাক আতা—দৌড়ে যাওয়াই নিয়ম তিলকের—দুপায়ে নয় তার দুচাকার সাইকেলে।

সাইকেলে বোঁ করে ছুটে গিয়ে পেছন থেকে অকারণে বেল বাজায় তিলক, শুধুই একবার যাতে পেছন ফিরে তাকায় আতা, তাতে প্রশ্রয় থাকুক বা ভ্রূকুটিই থাকুক; তাতেও যদি কাজ না হয় (সাধারণতঃ হয় না), তাহলে পাশে গিয়ে ব্রেক কষে, এক পা মাটিতে নামিয়ে দেয়, দাঁড়িয়ে বলে—'কীরে, এত দেমাক কিসের, কতক্ষণ বেল বাজাচ্ছি শুনতে পাস না নাকি?'

'শুনেছি, সে জন্যই তো সাইড দিয়েছি, চলে যা না। দাঁড়িয়েছিস কেন?'—আতা সাধারণতঃ এরকমই জবাব দিয়ে থাকে। রেগে গেলে তুই তোকারি করে।

'দাঁড়িয়েছি কেন জানিস না?' একটু অভিমান কিম্বা ক্ষোভ কিম্বা রাগের সঙ্গেই দুঠোঁটে হেসে বলে তিলক। বাকিটা, যেটা বলে না, উহ্য থাকে, সেটা হচ্ছে—'না দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।' আসলে 'না দাঁড়িয়ে' নয়, না এসে তিলক

থাকতে পারে না। ভালবাসা টাসা প্রেমট্রেম বলে যে সব শোনা কথা চাউড় আছে সেগুলো অনেকটা স্রেফ হাওয়ার মত, চোখে পড়ে না কোনদিন। হাতেও ধরা যায় না। তবে কিনা শরীরে মনে কখনো সখনো সুড়সুড়ি দেয় বটে।

কিন্তু আতার ওপর তিলকের টানটা যেন হাত দিয়ে ধরা যায়, চোখ দিয়ে দেখা যায়; শুধু কী তাই? তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবদি গায়ের প্রতিটা বিন্দু টান হয়ে ওঠে আতাকে দেখলে, না দেখলেও। ভাবতে গেলে তো আরো বেহুশ লাগে। যেমন নেশা করলে লাগে, সব অন্যরকম। অর্থাৎ আসলের মত না, তারচে ঢের বেশী খাপ্পাই। কী রকম যেন জড়ানো জড়ানো, মাখো মাখো। যেন ফুলটুসি আলোয় ঘেরা সবকিছু, ভীষণ আপন আপন। তখন হাতের পাতায় কিম্বা ঠোঁটের ডগায় ছুঁয়ে দিলে যেন বিদ্যুৎ খেলবে। আতা তার তেমনি আপন। খুব একলাএকলির।

ফলে আতার কাছে তিলক না এসে পারে না। পায়ে হেঁটে আসে, সাইকেলে চেপে আসে, স্বপ্নে তার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে হাঁটে গঙ্গার ধার দিয়ে।

একটা জ্যান্ত মুরগির ঘেঁটি ধরে হ্যাঁচকা টানে গলার নলীটা ছিঁড়ে ফেললে, যেমনি ফিন্‌কি দিয়ে তীর বেগে রক্ত ছোটে তেমনি করে আতার কাছে তার ছুটে যেতে মন চায়। কিন্তু আতা কেমন যেন বেয়াড়া, ডুবজল নদীর মত ভার ভারিক্কি। মেজাজটা কড়াও না আবার নরমও না। ঠিক কেমন বোঝা যায় না। খুব কাছেও এগুতে দেয় না, খুব দূরেও ঠেলে না।

শুধু নালী ছেঁড়া রক্ত যখন তীর বেগে ছোটে তখন দুহাতে খপ্ করে চেপে ধরে আতা। তখন আর ফিনকি দিয়ে ছোটা নয়, টপ টপ করে ঝরে পড়া। যত উৎসাহ নিয়ে তিলক যায় ততটা আস্কারা পায় না।

বুকের মধ্যে কেমন যেন মোচড় লাগে। ঠিক টপটপিয়ে রক্ত পড়ার মতই যন্ত্রণা।

মাঝে মাঝে মেজাজ খিঁচড়ে যায়—আমি শালা তিলক দাস সাধন সরকারের লেফ্‌টেনান্ট। যে সাধন সরকার থানা পুলিশ দারোগা ফারোগা কেয়ার করে না, যার সামনে দাঁড়িয়ে কোন বাপের ব্যাটার সাহস নেই বুক উঁচিয়ে কথা বলে, অখিল বাড়ুয্যের মত একটা ঢ্যাবনা লোককে যে এম এল-এ বানিয়ে দেয়, ইণ্ডিয়া ওয়ার্কস—মুষা কারখানার ইউনিয়ন ভাঙে যে ভরদুপুরে—তিরিশটা ঝাণ্ডাবাজকে হাসপাতালে পনেরোটাকে পরলোকে চালান দিয়েছে যে, পঞ্চাশটাকে পাড়া ছাড়া করেছে যে সাধন দা, তার রাইট হ্যাণ্ড আমি তিলক দাস। নিজেকেই তিলক মাঝেমধ্যে চটি দেখিয়ে বলে—'তুই শালা সেই তিলক দাস স্রেফ মেনিমুখো হয়ে

যাস অইটুকুন একটা মেয়ের কাছে। ছিঃ তিলে, ছিঃ।' পাড়া থেকে লোপাট করে দিতে পারে না নাকি সে ইচ্ছা করলে? ইচ্ছা যে করে না, তাও না, মন চায় ছিঁড়ে ফিড়ে ছেনেছুনে চটকে ছুঁড়ে দিতে। থুথুর মত।

তবু ঠিক মনপ্রাণ থেকে আসে না। সাধনদার সাকরেদি করলেও ঠিক সাধনদা হওয়া যায় না। আর আতার একটু হাসি মুখ দেখলেই সব রাগ জল হয়ে যায়। মনে হয় এর ভালবাসা পেলে জীবনটা কত ছিমছাম হয়ে যাবে। এবং হাজার হলেও তার বাপ জীবন দাস আগেকার দিনের আই-এ পাশ, কয়লাঘাট ষ্ট্রীটের রেল অফিসের চাকুরে, ফুল প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট পরে অফিস যায়। সে নিজেও হায়ার সেকেণ্ডারীটা টুকেমুকে যে করে হোক পাশ করেছে। চাকরীর জন্য হা-হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এর তার হাতে পায়ে ধরে তেলটেল দিতেও কোন কসুর হয় নি। কিন্তু চাকরী বাকরী যেন আতার চেয়েও অহংকারী। ধরা দেওয়া দূরের কথা, দেখাও দেয় না।

আর তখন সে নিজে ধরা পড়ল সাধনদার খাপে, তখন ইলেকশান এসে গেছে। সাধনদার হাতে গুচ্ছের টাকা আর মাল মশলা।

রবিদা ডেকে বলেছিল—'এসব কী করছ তিলক শেষপর্যন্ত লোচ্চাদের দলে ভিড়লে।'

'ওরা লাখ ছেলের চাকরী দেবে রবিদা, গরীবী হটাবে। তোমরা তো চাকরী বাকরী কিছুই দিলে না।' তিলক স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিল।

'ওরা চাকরী দেবে? গরীবী হটাবে? সব ভড়কি।' রবিদা বলছিল, পাশে দাঁড়িয়েছিল আতা। আতার সঙ্গে রবিদার মাখামাখি ছিল। সেই রবি সেনকে পাড়া ছাড়া করতে সাধন সরকারের দু ঘণ্টা লেগেছিল মাত্র। তাতে তিলকও ছিল। এক হাতে ছিল সাইকেলের চেন।

'তিলকদা আছে?'—আতা, একেবারে যুব অফিসের সামনে।

তিড়িং করে ছোট্‌না লাফিয়ে ওঠে— 'আছে। এ্যাই তিলে ডাকছে।'

তিলক আগেই দেখেছে। তবু চাড় লাগে না; বুকের মধ্যে টপটপ করে কী যেন ঝরে যায়। তবু চোখের সামনে ফের ফুলটুসি আলোর চেকনাই ফোটে। কেমন বেহুশ বেহুশ লাগে। নিজে থেকে কোনদিন ডাকেনি। আজ ডাকল।

'কীরে ব্যাপার কী?'—তিলক বারান্দায় দাঁড়ায়।

'বাড়িতে আসবে একটু?' আতার গলায় বিষ নেই আজ, মুখে হাসি।

রক্ত চিড়বিড়িয়ে ওঠে তিলকের বুকের বাঁদিকে—বলে, 'আসছি।' ছোটনাকে বলে—'সাধনদা এলে বলিস আতাদের বাড়ি আছি।'

ছোটনা বলে-'এখনি এসে পড়বে, সবাইকে থাকতে বলেছে।'

'আসুক'। বলে তিলক বেরিয়ে আসে।

সূর্য উবু হয়ে টলে পড়ছে বাড়িঘর গাছগাছালির ডগায়।

'ইণ্ডিয়া ফ্যানে লক আউট হচ্ছে শুনেছ?' —আতা পিচওঠা রাস্তার খোয়া মাড়িয়ে হাঁটে। আতা যেমন তাকে তুই তোকারি করে তেমনি তুমিটুমিও বলে।

'শুনেছি। আজ রাত্রে সব মাল পাচার করবে—ইউ পিতে কারখানা খুলবে।'

'তোমরা যে সব লোককে পিটিয়ে কারখানা ছাড়া করেছিলে তারা ছেলেমেয়ে নিয়ে এতদিন না খেয়ে ছিল, তার জায়গায় তোমরা চাকরীতে ঢুকেছিলে, এবার তোমাদের চাকরী গেল।'

'গেল। যতীনদার চাকরীও গেল।'

'বাবা-তো তোমাদের দয়ায় কাজ করছিল। নয়তো বাবার চাকরী তো আগেই যেত।'—আতা ডানদিকে বাঁক নিয়ে বাড়িতে ঢোকে।

আতার বাবাও লালঝাণ্ডার দলে ছিল। তার ওপরেও চড়াও হয়েছিল সাধন সরকার। তিলক হাতে পায়ে ধরে রুখেছে। সেই সুবাদেই আতার কাছাকাছি ঘেষার সুযোগ।

'তোমরা কী করবে এবারে?' আতা তিলককে ঘরে বসায়।

তিলক বলে—'কী করব। তিরিশ জনকে তাড়িয়ে আমাদের তিরিশজনের চাকরী হয়েছিল। এবার সবসুদ্ধ বেকার হলাম।'

কেন তোমাদের সরকার হাজার হাজার ছেলেকে ডি-আই-আর-এ, মিশাতে জেলে আটকে রাখতে পারে, মালিককে জেলে পুরতে পারে না?' আতা সুইচ টিপে ঘরে আলো জ্বালে।

'হাসাচ্ছিস?'-এতক্ষণে সোজা আতার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে তিলক কাঠের চেয়ারে বসে।

'কেন, এটা কী হাসির কথা?'

'হাসির কথা না? সরকারকে গদীতে বসিয়েছে কে? কে দিয়েছিল এদের লাখ লাখ টাকা? কারখানার মালিকরা কী শুধু আমাদের কপালের মালিক মন্ত্রীদের মালিক না?'

'কথাগুলো নতুন নতুন লাগছে! তোমরা না গরীবী হটাচ্ছ, দেশে সমাজতন্ত্র

আনছ তিলকদা ?'—আতা হাসে, ভারিক্কি চালে—'তার জন্য তোমরা রবিদাদের মত লোকদের পাড়াছাড়া করেছ।'

'স্রেফ একটা চাকরীর জন্য।'

'কাচা টাকা আর মদ ? তারও লোভে। কিছুলোকের চাকরী খেয়ে চাকরী করতে একটুও বিবেকে লাগে না তোমাদের ? চাকরী যাওয়া কি জিনিষ বুঝছ এখন ?'

'মাসিমা কোথায় রে আজ ? এককাপ চা খাওয়াবি ?' তিলক দুচোখে মাসিমাকে খোঁজে।

'মার লো প্রেসার। মাথা ঘুরে পড়েছে বিকালে, ও ঘরে শুয়ে আছে। চা হবে না, পাতা নেই চিনিও না।'

'তুই কী একটুও মিষ্টি মুখে কথা বলবিনা আতা কোনদিন ? তোর কী একটুও মায়া দয়া নেই ?'

'তুমি আমার বাবাকে বাঁচিয়েছ, তার চাকরী বাঁচিয়েছ, তোমার সঙ্গে মিষ্টি মুখে কথা বলব না ? বলিনি মনে নেই, তোমার সঙ্গে কতদিন একসঙ্গে সিনেমা দেখেছি ? অন্ধকারে কতবার তুমি আমার হাত ধরেছ, আর একদিন'—

'খ্যাখ আতা, ইয়ার্কি করিস না সব কথায়। বিবেকের কথা যদি বলিস তাহলে ওটা তোরও নেই। একটু জোর করলে হাত পাওয়াটা কঠিন কিছু না। কিন্তু সত্যি সত্যি বলতো তুই একটুও পছন্দ করিস আমাকে ?'

'কী বলছ তিলকদা, পছন্দ না করলে তোমাকে ডেকে এনে ঘরে বসতে দিই ?'

'খ্যাখ আতা, আমাকে বোকা ভাবিস না। আমি জানি রবিদাকে ভালবাসিস তুই। ঠিক না ? তবে তোকে একটা সত্যি কথা বলি—মনে মনে ভেবেছিলাম পাড়া ছাড়া হলে রবিদার ওপর তোর টান কমে যাবে, ভুলে যাবি। আর আমি যে সত্যি তোকে ভালবাসি সেটা তুই ধীরে ধীরে ঠিক বুঝবি।'

'বুঝিনি আমি ? তোমার কী মনে হয় ?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে স্থির চোখে তিলক তাকিয়ে থাকে আতার স্থির দুচোখের দিকে। তার মুখটাতে যতটুকু আলো পড়েছে সেটুকু যেন শুকনো চামড়া ভেতরে টেনে নিচ্ছে। কোঁচকানো চোখে মুখে হতাশার বেদনার ম্লান কয়েকটা রেখা স্পষ্ট হয়।

একটু পরে খুব আস্তে যেন আপনমনে তিলক বলে—'আজ থেকে আমার চাকরী নেই। সাধন সরকারের আগের সে দাপটও আর নেই ! সব কেমন যেন

গুলিয়ে যাচ্ছে। কী আশা করেছিলাম আর কী হল ? জীবনে একটু দাঁড়াবার জন্য একটু বেঁচে থাকার জন্য কী না করেছি, ডালকুত্তার মত ছো ছো করে ওদের পেছনে ছুটেছি। মারদাঙ্গা বোমবাজি কোনটাই বাদ দিইনি।—আমি-যে শালা একটা ভদ্দর লোকের ছেলে সেকথাটাও ভুলে গেছিলাম।'

'মন খারাপ করছ কেন, লেগে থাকো, আবার ওরা কোথাও দাঙ্গাবাজি করবে তোমাদের আবার চাকরী দেবে।'

'ঠাট্টা করছিস কর আতা, যত খুশী। কিন্তু একটা কথা বলি তোকে, তুই যদি রবিদাকে সত্যি ভালবেসে থাকিস তাহলে তুই জানিস ভালবাসা কী ? আমি যাই করে থাকি, সেটা যত খারাপ হোক, কিন্তু একটা ব্যাপারে কোন বেইমানি নেই, একটুও ভেজাল নেই সেটা হচ্ছে তোকে সত্যি সত্যি—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আতা বলে—'ভালবাসতো ? আমি জানি।'

'ছাই জানিস।' হাতঝাঁকানি দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ে তিলক ঠোঁট বাঁকিয়ে।

'ছাই কেন তিলকদা, আগুনই জানিতো। তোমার হয়তো মনে নেই, কিন্তু আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই রবিদাকে ধরে তোমরা যখন পেটালে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, মা আমাকে টেনে এনেছিল। তখন তুমি যে ঘুষিটা মেরেছিলে রবিদার নাকের ডগায় আমি আবছা দেখলাম, রবিদার নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। আর তার পরের দিনই তুমি সেই হাতে আমাকে এই ঘরের মধ্যে জাপটে ধরে-ছিলে। আমি বাধা দিয়েছি ? তুমি একটা চুমু খাওনি আমার ঠোঁটে ?'—আঁচল পিঠ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে বুকে জড়ায় আতা। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে।

'জোর করতে হয়েছিল আমাকে, তুই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলি আতা, আমারও মনে আছে।'

'ভালবাসা টাসা আমার আসে না তিলকদা, সত্যি বলছি।'

'আসে ঠিকই শুধু তিলকের বেলায় আসে না, তিলকটা লোচ্চা তো।' তিলক জোর হাসতে গিয়ে হঠাৎ ঢোক গেলে একটা ; নিজের মুখের থুথু।

'আমরা কী কম লোচ্চা তিলকদা ? বাবা কারখানায় কাজ করছে পঁচিশ বছর, তবু তার চাকরী থাকে তোমাদের দয়ায়, পাড়ায় যে বাস করছে সেও তো তোমাদের দয়া। বাবা পঁচিশ বছর ধরে ইউনিয়ন করে—সে ইউনিয়ন তোমরা নিয়েছ পনেরটা লোককে জখম করে। আজ লকআউট হল, তোমরা চুপচাপ। আর কাল থেকে আমাদের উনুন জ্বলবে না। কাকে ভালবাসব তিলকদা দু-তিনটে ছোট ভাই

বোনকে মাকে বাবাকে তোমাকে না নিজের পেটটাকে কিছুই বুঝতে পারি না।'

আতা উঠে গিয়ে জানলা খুলে দেয়, তার সারা মুখে ঘাম জমেছে—জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সে বলে—'আমি বি-এ পাশ করে বসে আছি একটা কিছু করতে চাই, কিন্তু কী করব ?'

তিলক বলে—'লকআউট আমরা মানি না, আমরা কারখানার গেটে অবস্থান করব ভাবছি, কোন মাল বাইরে পাচার হতে দেব না।'

আতা হেসে বলে—'তোমাদের লীডার সাধন সরকার কী তাই বলেছে ?'

'ও শালার কথা বলো না'—তিলক হঠাৎ ক্ষ্যাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—'বাঞ্চৎ টাকা খেয়েছে মালিকের, ইউনিয়নের নামে জোরজার চাঁদা তুলে গাপ্ করছে সব টাকা। এখন বলছে—তোমরা চুপ করে থাকো সরকার সব করবে।'

'রেগে যাচ্ছ কেন ? অহিংসা শান্তি—এ সবই তো তোমাদের আদর্শ।'

'অহিংসা ? শান্তি ? আজ থেকে নাকি কারখানার গেটে সি-আর-পি পোষ্টিং হচ্ছে যাতে মালপত্র মালিক ঠিকঠাক সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।'

'বাহ্, এই নাহলে সমাজতান্ত্রিক সরকার !'

'গুষ্টির পিণ্ডি। সব শালাকে দেখে নেব। তোকে বলছি আতা—' জানলা দিয়ে সিগারেট ছোঁড়ে তিলক, তার চোখে মুখে রক্ত এসে পড়ে। উত্তেজিত দেখায় তাকে।

আতা বলে—'তিলকদা একটা খবর শুনেছ ?'

রুক্ষ মুখ ফেরায় তিলক, অস্থির চোখে স্থির তাকিয়ে থাকে।

আতা ফের হেসে বলে—'তোমরা যাদের পাড়াছাড়া করেছিলে আজ তারা ফিরে আসছে। বাবা বেরিয়ে গেছে বিকেলে, রবিদারা আসছে। সবাই কারখানার গেটে অবস্থান করবে।'

বড়শিতে আটকে পড়া মাছ হঠাৎ জলছাড়া হয়ে যেমন ছটফটিয়ে লাফায় শূন্যে, তেমনি যন্ত্রণায় মুচড়ে যাওয়া মুখে তাকায় তিলক। অবিশ্বাসী চোখে বেবুঝের মত তাকিয়ে থাকে, গলায় যেন রক্ত ঝরছে এমন স্বরে বলে—'ও, এইজন্য আজ তোর মুখে খই ফুটছে আতা ? তাই এত কথা বলছিস আজ।'—তিলকের সমস্ত শরীরটা যেন ভেতর থেকে চিড় খেয়ে মাটির মূর্তির মত ফুটিফাটা হয়ে যায়, আস্তে বলে—'মনের মানুষ ফিরে আসছে তাই না রে আতা !'

'তোমাকে তো বলেছি তিলকদা, ভালবাসাটাসা মনের মানুষটানুষ কথাগুলো শুনলে হাসি পায়। রাস্তার কুকুরের মত দুবেলা শুধু পেট ভরাবার ধান্দা আমাদের,

মানুষ কিনা তাই বুঝতে পারি না মাঝে মাঝে। তবে বলতে পার রবিদার কথা শুনে মনের মধ্যে ভরসা পাই—এই সমাজটা একদিন পাল্টে যাবে, দু চারজন শুধু রাঘব বোয়ালের মত সবকিছু ভোগ করবে না, সবাই খেয়ে পরে বাঁচবে।—সেজন্যই তো ওরা—'

'অত সহজ না আতা, সাধন সরকার এখনো বেঁচে আছে মনে রাখিস। রবিদার কী জানের ভয় নেই ?'

'তোমরা যদি অবস্থান করতে যাও তবে তোমাদেরও কী দেবে সাধন সরকাররা ? সব মজুররা তো চাইছে শুনলাম অবস্থান করতে।'—আতার মুখ ভয় সাহসে মেশানো।

'আমাদেরও ছাড়বে না জানি, কিন্তু রবিদাদের জান আগে যাবে আতা। কেউ রুখতে পারবে না।'

'কেন রুখতে পারবে না, সব মজুর এখন এক এককাট্টা। তোমরা কী নেই সেই দলে ?'

দুমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে শুধুই আতার মুখে রঙের খেলা দেখে তিলক। আতার ভেতর যেন উজ্জ্বল একটা আলো জ্বলে উঠছে, মশালের মত, কিন্তু সেটা মশাল নয়, সেটা নিঃসন্দেহে রবি সেনের মুখ। এ-আলো কেউ লুকাতে পারে ? নাকি তিলক লোচ্চা বলেই এ আলো চিনতে তার কোন মেহনৎ লাগে ? রক্তমাংসের কোন্ যুবক এমন আলো সইতে পারে, এমন মেয়ের মুখে যাকে সে ভালবাসে নিজের মত, কিম্বা তারও বেশী ? যে-মেয়েকে বাদ দিলে নিজেকে চিবিয়ে ফেলে দেয়া ছিবড়ের মত মনে হয় ?

কল্জের ভেতরে টেনে টেনে লম্বা করা একটা মুরগীর গলাটা হ্যাঁচকা টানে কে যেন ছিঁড়ে ফেলে। ডানার তোলপাড় ঝাপটে পাঁজরার হাড় কেঁপে ওঠে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ওঠে ব্রহ্মতালুতে, ঘিলুর মধ্যে যেন ষ্ট্যাবিং হতে থাকে মুহুর্মুহু।

হঠাৎ দুহাতের ভাল্লুকে-থাবায় আতার দুহাত খাবলে ধরে তিলক, চেঁচিয়ে বলে—'তুই আমাকে এখবর দিলি কেন আতা ?' বিমূঢ় রক্তহীন মুখ আতার। আতা বলে—'কোন খবর ?' 'রবি সেন আসছে এখবর তুই আমাকে দিলি কেন আতা ? ভেবেছিস হেসে হেসে ছুরি মারবি তুই আর আমি মুখ বুজে সইব ? জবাব দে।' রক্ত বর্ণ চোখে তাকিয়ে দশ আঙুলের দশটা নখ যেন আমূল বিঁধিয়ে দেয় তিলক আতার দুহাতে।

'খবরটা আজ কেন তোমাকে ডেকে এনে জানিয়ে দিলাম শুনবে তিলকদা? এই জন্যে যে রবিদাদের তোমরা পাড়াছাড়া করতে পার কিন্তু আমাদের মত হাভাতে মানুষের মন ছাড়া করতে পার না, এটা বলার জন্য। কতবার তোমাদের যুব অফিসের সামনে দিয়ে আজ ঘোরাঘুরি করছিলাম, দেখনি?'

দুটো ঠোঁট সহজ হাসিতে ভরে যায় তিলকের, খুব ধীরে সুস্থে বলে—'কিন্তু ওকে আমরা দুনিয়া ছাড়া করতে পারি সেটা তুই জানিস না আতা।'

আতা যেন এরকমই আশা করেছিল এমনি তৃপ্ত মুখে বলে—'জানি না? জানি। কিন্তু তুমি জানো না তিলকদা রবিদা দুনিয়া ছাড়া হলে আরো বেশী করে জাকিয়ে বসবে বুকের মধ্যে। এখনো বুঝতে পারছ না? হাত ছাড়ো।'

দুখণ্ড কাঠ হাত থেকে ছুঁড়ে দেবার মত করে আতার দুহাত ছুঁড়ে দেয় তিলক। তারপর ফের হাসে তিলক যেন জলের মাছ জলে ফিরেছে, বলে—'আচ্ছা আতা ধর যদি আমি রবিদাকে আজ বাঁচিয়ে দিই?'

আতা একটুও না ভেবে বলে—'তাহলে জানব মানুষ কুকুর না। মানুষের মত একটা কাজ করলে—'

তিলক শব্দ করে হাসে, একটু জোর লাগে বটে কিন্তু সে শব্দ অনেকটা বুকের পাঁজর ভাঙা শব্দের মত শোনায়, হাসতে হাসতেই তিলক বলে—'আর যদি ধর, রবিদাকে বাঁচাতে গিয়ে আমি নিকেশ হয়ে যাই?'

আগের মত চটপট কিছু বলতে পারে না আতা। থমকে যায়। ভুরু কোঁচকায়। দুচোখের মণি তীব্র করে তিলককে দেখে, যেন তিলকের বাইরেটা নয়, হাসিতে তার পাঁজর সত্যি সত্যি ভেঙেছে কিনা এটাই যেন স্পষ্ট করে দেখতে চায়। দেখতে দেখতে তার মুখ, দৃষ্টি ম্লান হয়ে আসে, ভেতরের হাড়ে ফুটো-ফাটা মাটির মূর্তির মত লাগে তিলকের শরীরটা। আস্তে করে আনমনা গলায় আতা বলে—'তেমন করে যদি তুমি মরে যাও তিলকদা, তাহলে কী হবে বুঝতে পারছ না? বুঝতে পারছ না তখন কেউ কী তোমাকে আমাদের বুকছাড়া করতে পারবে?'

'তোর কথাগুলো কেমন যেন পদ্য পদ্য লাগছে রে আতা! ছেলেবেলায় বোধ হয় এরকম পদ্য পড়েছিলাম তাই না!'

'পড়তে পার। কখনো কখনো আমাদের মনে এরকম কথা আসে বলেই না পদ্য লেখা যায়, তাই না?'

'কী জানি, মনটা খুব খারাপ করে দিলি। আমি যাই।' —বলেই যেন ভীষণ তাড়া এমন পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তিলক। কীরকম বিভ্রান্তভাবে আতা পিছু ডাকে—'কোথায় যাচ্ছ তিলকদা? শোন।'

তিলক দাঁড়ায় না, অন্ধকারে দ্রুত পায়ে যেতে যেতে বলে—'পেছন ডাকিস না আতা, কোথায় যাচ্ছি সময় হলে বুকের মধ্যে ঠিক টের পেয়ে যাবি।'
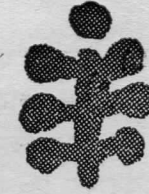
পেছনে কেউ

সমরেশ মজুমদার

সিগারেট কিনতে সুধাময় দোকানটার সামনে খানিক দাঁড়িয়েছিল। এখন
াতে কোন কাজ নেই, চট করে কোথাও গিয়ে আড্ডা মারার কথা মনে পড়ছে না।
াঝে মাঝে এই কোলকাতা শহরে বড় একা লাগে। অথচ উত্তর থেকে দক্ষিণে
র্বত্র কিছু বন্ধু বা আড্ডা ছড়িয়ে আছে তবু কেমন একা লাগে মাঝে মাঝে।
ুধাময় সিগারেট নিয়ে দোকানের আয়নায় চট করে মুখটা দেখে নিল। আর
ঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল পেছনে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে। চুপচাপ সুধাময়কে
দখছে।

সিগারেট ধরাতে সময় নিল ও। একটা অস্বস্তি অনেকক্ষণ ছিল মনের মধ্যে।
ঠাৎ বেড়ে গেল সেটা। মেস থেকে বেরুবার পরই লোকটাকে সে দেখেছে।
ানিকটা দূরত্ব রেখেই পেছন পেছন আসছে! গতকাল যেন মেসের সামনেও
লাকটাকে দেখেছে। কে লোকটা? পুলিশ কিংবা গুণ্ডা? কিন্তু এ দুটোর
ঙ্গে যোগাযোগের কোন ঘটনা তার ঘটে নি। অথচ বিনা কারণে একজন তাকে
নুসরণ করবে ভাবাই যায় না।

একটু চোখাচোখি হতে সুধাময়ের মনে হল লোকটা হাসছে। বয়স হয়েছে।
বুকে সাদা দাড়ির উঁকিঝুঁকি। সিড়িঙ্গে চেহারা।

কিন্তু সুধাময় ওকে পাত্তা দিল না। এক একজন লোক আছে যাকে পাত্তা না
লে তার কোন ক্ষতি হয় না, এ বোধ হয় সেই ধরণের। নইলে সুধাময় এগিয়ে
লেও ও পেছন পেছন আসবে কেন?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুধাময় পারল না। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটাকে আঙুল
ল ডাকল সে। একটা কেচোর মত নিজেকে গুটিয়ে লোকটা সামনে এসে
ড়াল এবার। ভাল করে দেখল সুধাময়। না কোন কালে সে একে চেনে না।
ক চাই।'

হাসল লোকটা। গা রি রি করে উঠল সুধাময়ের। হাসির সময় কালো
ড়ি দেখা একদম সহ্য হয় না ওর।

'আসুন স্যার, একটু চা—' ঘাড় বেঁকিয়ে সুধাময়কে ইঙ্গিত করে লোকটা সামনের চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। দারুণ অবাক হল সুধাময়। লোকটা একটু অপেক্ষা করল না চা খেতে তার আগ্রহ আছে কি না জানবার। চায়ের দোকানটা দেখল ও। মাঝারী ধরণের। চোখ কুঁচকে সুধাময় ভেতরটা দেখল—প্রায় খালি। চা খেতে ও তার কোন সময়েই আপত্তি নেই কিন্তু এই লোকটার সঙ্গে সে খাবে কেন। একে চেনে না জানে না তাছাড়া চালচলন সন্দেহজনক। সুধাময় দেখল লোকটা মাথা নেড়ে তাকে ডাকছে।

শেষপর্যন্ত একটা কৌতুহল ওকে ভেতরে নিয়ে এল। কোণার দিকের একটা টেবিলে বসেছিল লোকটা। পাসিং-শোর একটা প্যাকেট নিয়ে টেবিলে ঠুকছিল। কৌতুক বোধ করল সুধাময়। আজকাল পাসিং-শোর প্যাকেট হাতে বড় একটা কাউকে দেখা যায় না। ছেলেবেলায় বড়দের সে কাঁচি সিগারেট খেতে দেখত আজকাল দেখাই যায় না।

'দেশলাই আছে স্যার!' লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

যেন তার কাছে দেশলাই আছে কি না জানবার জন্যেই তাকে ডাকা। পকেটে থাকা সত্ত্বেও সুধাময় বলল, 'না।' লোকটা বয়কে ডাকল, দেশলাই চেয়ে নিয়ে দু কাপ চা দিতে বলল। হঠাৎ সুধাময় বলে ফেলল, 'এক কাপ বলুন।'

'সে কি স্যর। আপনার তো চায়ে অরুচি নেই। মেসে ক'কাপ খান জানি না—কাল দেখলাম বাইরেই চার কাপ খেলেন।' লোকটা আবার মাড়ি বের করে হাসল।

ঠিক বুঝতে পারছিল না সুধাময় লোকটা কি বলতে চায়। তার মানে ও নিশ্চয়ই ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে। ওর নিজেরই মনে নেই কাল ক'কাপ চা খেয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার তো।

'আপনি কি বলতে চান বলুন।' সুধাময় চেয়ার টেনে নিয়ে বলল।

চায়ের অর্ডারটা পালটালো না লোকটা। চোখ দুটো ছোট করে হাসল, হেসে বলল, 'বসুন না।'

'আপনাকে আমি কিন্তু চিনি না।' সুধাময় কথা বলতে চাইল। লোকটা যেন তার ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইছে। ব্যাপারটা হতে দেওয়া ঠিক নয়।

'না না চিনবেন কি করে।'

'তাহলে!'

'স্যর, আপনার সঙ্গে একট ব্যবসার কথা বলতে এসেছি।'

'ব্যবসা ?' ভীষণ অবাক হল সুধাময় "আমি ব্যবসা করি না।"

'আমি করি স্যর।'

'কিসের ?' কৌতুহল বাড়ছিল সুধাময়ের।

'হবে হবে, চা খান না আগে।' সিগারেট ধরিয়ে মুঠো করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল লোকটা। এখন ওর চোখ বন্ধ। যেন সময় নিয়ে পরিবেশ তৈরী করতে চায়। সুধাময় এবার ভাল করে লক্ষ্য করল। জামা কাপড়ে লোকটার অবস্থা তেমন ভাল নয়। হলদে টেরিলিনের সার্টের ফাইবার উঠি উঠি করছে। এই ধরনের সার্ট আজকাল কেউ পরে না। নাকের লোমগুলো আরশুলার ঠ্যাঙের মত বেরিয়ে এসেছে। লোকটার সারা শরীরে সৌখিনতার মধ্যে বাঁ হাতের কনুয়ের ওপর লাল সুতোয় ঝুলে থাকা পিতলের তাবিচের ওপর ইংরাজীতে নিজের নাম খোদাই করা—এন ডি.। লোকটার হাতের সিগারেট অর্দ্ধেক জলে গেছে এতক্ষণে। ছাইটা সোজা দাঁড়িয়ে। যত্নে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আসলে লোকটা নিশ্চয়ই নার্ভাস প্রকৃতির। মনে ঠিক জোর পাচ্ছে না।

'কি বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।' সুধাময় পা ঘষল।

বলছি স্যর। আপনার তো আজ স্কুল ছুটি।' চোখ বন্ধ করে আর এক টানে সিগারেটের আগুনটাকে প্রায় আঙ্গুলের কাছে নামিয়ে আনল লোকটা।

বয় চা এনে দিতে লোকটা সোজা হয়ে বসল। একটা কাপ পরম যত্নে সুধাময়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল; 'আপনি স্যর বিয়ে করেন নি।' যাচ্চলে! সুধাময় সোজা হয়ে বসল, 'আপনি কি ঘটক ?'

সজোরে ঘাড় নাড়ল লোকটা.' 'না-না-না, একদম না, বিয়ে ভাঙ্গা আমার কাজ স্যর।'

'বিয়ে ভাঙ্গা ?' অন্যমনস্ক সুধাময় চায়ের কাপটা ধরে ফেলল।

'আচ্ছা স্যর. এবার কাজের কথা বলি। কদিন যা আপনি ঘুরিয়েছেন না! ওঃ কোথায় কোথায় না আপনারা যান। সেই পরশু রাত্রে তো বাড়িই ফিরলেন না। ভেবেছিলাম সেদিনই ধরব। মাল ফাল খেয়ে একদম আউট হয়ে যাবেন কে জানতো। এদিকে আমার ক্লায়েন্ট মাইরি স্যর, আমাকে চিঠিগুলো দিন।'

'চিঠি—কিসের চিঠি!' বিরক্ত এবং অবাক সুধাময় চোখ কোঁচকাল। লোকটা তাকে বেশ কদিন ধরেই তাহলে ফলো করেছে। শালা! এই কদিনে সে অনেক কিছুই করেছে যা এ লোকটা দেখেছে। অনেক কিছু যা নিজে নিজে করা যায় এবং যা নিজের কাছে সাধারণ ব্যাপার তা কেউ জানলে বা দেখলে বিচ্ছিরি হয়ে যায়।

পাবলিক ইউরিনালে পেচ্ছাপ করার মতন। যে যারটা নিজের মত করে যাও আড়চোখে তাকালে নিজেরই লজ্জা। ভরা বাসে দাঁড়িয়ে ভাল মেয়েছেলের বুক আড়চোখে দেখতে ভাল লাগে কিন্তু যখনই বুঝতে পারা যায় আর কেউ ব্যাপারটা দেখছে তখনই সব তেতো হয়ে যায়। এই সব আর কি। এই লোকটা তার নিজস্ব ব্যাপার পেছন থেকে দেখে গেছে। ডেঞ্জারাস লোক। কিন্তু কেন? এ শালা চিঠি চাইছে। কার চিঠি। বিয়ে ভাঙ্গে যখন তখন নিশ্চয়ই কোন মেয়ের। কার!

'স্যর আমার ক্লায়েন্ট রাজী আছে খরচ করতে। আপনি চিঠিগুলো দিয়ে দিন।' লোকটা সেই দেশলাই চাওয়ার মুখ করে বলল এবার।

'পরিস্কার করে বলুন—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' সুধাময় লোকটার চোখে চোখ রাখতে চাইল। শালার চোখ কখনও এক যায়গায় থাকে না।

চেয়ারটা টেনে নিল লোকটা, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আর কারো চিঠি আপনার কাছে আছে নাকি ? আমাকে দিন স্যর যা হবে ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি। পার্টি কেমন ?'

'কি পাগলের মত বলছেন। আপনার কিছু বলার থাকলে বলুন।' বেশ জোরে ধমকে উঠল সুধাময়। লোকটা চট করে ডান হাত দিয়ে তাবিচটা আঁকড়ে ধরল। ধরে হাসল।

'স্যর রাগ করবেন না। এটাইতো আমার ব্যবসা। একদম খেতে পাই না। আগে লোকে একটাই প্রেম করত আর তার জন্য জান দিয়ে দিত। আমরাও দুটো পয়সা পেতাম। আর এখন নাকি একটাই প্রেম ভেঙ্গে ভেঙ্গে একে দেয় তাকে দেয়; শালা গা ধোওয়া জলের মত কেউ কেয়ারই করে না। যাক্, আমার কেসটা ভাল খুবই ভাল। তবে একটু আপনার হেল্প চাই। আপনি স্যর রেণু দেবীর চিঠিগুলো আমাকে দিয়ে দিন। পার্টি আপনাকে ক্যাশ দেবে। বলুন কত চান স্যর!'

রেণু! বিস্ময়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে সুধাময়ের দম বন্ধ হয়ে গেল। আর তখনই সুধাময় আবিষ্কার করল রেণু তার কাছে কেমন পুরোন হয়ে গিয়েছে, কেমন যেন। আগে রেণুর কথা মনে হলেই, কারো মুখে রেণুর নাম শুনলে বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠত। রেণু এত সুন্দর হাসতো চোখে এত আদর ছিল যে মুখের দিকে তাকালেই যেন গঙ্গাস্নানের পর পবিত্র মনে হত নিজকে। সেই রেণু কখন ঝাপসা হতে হতে সব হারিয়ে যায় এমনি করেই। নইলে রেণুর দেওর এসে যখন

ওকে শাসিয়ে গেল তখন এত কষ্ট ও পেয়েছিল কেন ? সেই কষ্টটাই বা কোথায় গেল ! এক রাত্রে মেসে ফিরে যখন নিজের ঘরটা তোলপাড় অবস্থায় দেখল অথচ কোন জিনিষ চুরি হয়নি মেসের কেউ জানে না শুধু রেণুর ছবিটা খুঁজে পেল না সেদিন সে কেঁদে ফেলেছিল কেন ? সেই কান্নাটাই বা কোথায় গেল ?

অথচ এই রেণু বিয়ের আগে যখন বলেছিল তুমি ভেবো না, লক্ষিটি, বিশ্বাস কর আমি তোমার কাছে ফিরে আসব—তখন যেন বিশ্বাস করতে ভাল লেগেছিল।

বিয়ের পর যখন কোন নিঃঝুম দুপুরে ঝড়ের মত রেণু মেসে হাজির হয়ে কাঁদতো আর বলতো আমি আসব তোমার কাছেই আসব—তুমি অপেক্ষা কর—প্লিজ—আমার জন্যে অপেক্ষা কর। তখন সেটাই সত্যি মনে হত। অন্যের সিঁদুর মাথায় রেখে রেণু চোখ বন্ধ করে ফিসফিসিয়ে বলত তুমি আমার পতি দেবতা গো—তখন নিজেকে বিরাট মনে হতো। সেই মনটা কোথায় গেল ?

তারপর রেণু নেই অনেকেদিন নেই।

'স্যর।' লোকটা আবার ডাকল। তাকাল সুধাময়। 'স্যর, আপনার কাছে একটা চিঠি আছে রেণুদেবীর—প্রায় দশ পাতার। রেণুদেবীর সেটা নাকি কনফেশান—ইয়ে—ঠিক সোজা মেয়ে তো নন উনি। আপনার আগে তো আরো—কিছু মনে করবেন না স্যর, যা ফ্যাক্ট তাই বলছি—ঐ চিঠিটা দরকার। পার্টি এক হাজার দেবে।'

'এক হাজার !' হাসলো সুধাময়।

'হ্যাঁ স্যর—ওটা পেলে ডিভোর্স আটকাবে না।'

'চিঠির কথা জানল কি করে !'

'সে স্যর দারুণ ব্যাপার। রেণুদেবী একটা চিঠি বাথরুমে বসে ভাইকে লিখছিলেন। তা স্নান করে—মেয়েছেলের মন তো—সোপকেসের ওপর সেটা রেখে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেই চিঠি ওর দেওর পায়। তাতেই আপনার নাম আর এই চিঠির খবর।' হাসল লোকটা।

'রেণু এখন কোথায় ?'

'জানি না স্যর। নট ইণ্টারেষ্টেড। আমার টাকা চাই কমিশন পাবো।' আর একটা সিগারেট ধরাল লোকটা।

হো হো করে হেসে ফেলল সুধাময়।

'হাসছেন কেন স্যর।' কুৎকুতে চোখে তাকাল লোকটা।

'আপনি ব্যবসা কিছু বোঝেন না।' তখনও হাসছিল সুধাময়।

'কি রকম ?' কপালে চটপট ভাঁজ ফেলে লোকটা।

'আপনি একজন কাষ্টমারের কাছে মাল বিক্রী করছেন। দর পাবেন কি করে ! রেণুর বাবার কাছে যান। বলুন এই রকম একটা চিঠির জন্যে রেণুর হাসব্যাণ্ড এত বলছে, আপনি কত দেবেন। নিজের মেয়ের সর্বনাশ ভদ্রলোক চাইবেন ?'

'না স্যর কিছুতেই চাইবেন না !' চোখে মুখে উত্তেজনা লোকটার।

'চাইবেন না। তখন দর করুন। এক হাজার দু হাজার দশ বারো যা ইচ্ছে। আপনি এই ব্যবসা করছেন !' হাসলো সুধাময়। সটাং করে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। উত্তেজনায় হাত চেপে ধরল সুধাময়ের—'ওঃ দাদা আপনি গুরুদেব লোক। শালা এতদিন লাইনে আছি এসব আমার মাথায় ঢোকেনি। কই ফিকির নেই—ওর বাপ থাকে শালকেতে। ঠিকানাটা স্যর—।'

'আমি কি করে বলব—।' সুধাময় চোখ বন্ধ করল।

'আপনি স্যর রেণুদেবীর বাড়িতে যেতেন—' লোকটা হাসল।

'আমি রেণু বলে কোন মেয়েকে চিনি না—' টেনে টেনে বলল লোকটা।

আঁ, ও হা হা হা। দুলে দুলে হাসল লোকটা, 'আপনি মাইরি দারুন মজার লোক তো। ঠিক আছে স্যর আমি এখনই যাচ্ছি। ঠিকানাটা আমার এই ক্লায়েণ্টের কাছেই পাব। কম্পিটিশানটা লাগিয়ে দিই—দিয়েই আসছি।' হুস করে চলে গেল লোকটা। ঘাড় ঘুরিয়ে সুধাময় দেখল লোকটা একবার বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল কাউণ্টারে। পকেট থেকে পয়সা বের করে কাউণ্টারে রেখেই যেন ছুটল।

চুপচাপ রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল সুধাময়। বাইরে এখনো কড়া রোদ। রেণুর মুখটা মনে করতে চেষ্টা করল ও। হলদে শাড়ি পরত রেণু। চুলগুলো ফুলিয়ে পিঠের কাছে একটা গিঁট বাঁধতো। মুখের আদলটা—মাথা ঝাঁকাল সুধাময়—আঃ, কিছুতেই ঠিক আসছে না। অথচ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মানুষের মুখ পরস্পরের এত কাছাকাছি ! চোখ তুলে সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখল ও। হিন্দী ছবির সব নায়িকাই দূর থেকে ওর কাছে একরকম।

মেসের দিকে পা চালাল সুধাময়। রোদ একদম সহ্য হয় না ওর। রেণু কি সব গুলিয়ে ফেলল ! দশপাতার স্বীকারোক্তির দাম হাজার টাকা। বুকের মধ্যে কেমন হাঁপ ধরে যায়।

বিয়ের দিন বিকেলে মেসে ফোন করেছিল রেণু। 'আমি বলছি, গড়িয়া-হাটার মোড় থেকে। একটু এসো।'

চমকে গিয়েছিল সুধাময়, 'সেকি—আজ তোমার বিয়ে।'

'জানি—এসো।' রেণুর ধরা গলাটা এখনও কানে বাজে।

'না—তা হয় না।' সুধাময়ের কান্না পাচ্ছিল।

'আমার চিঠি পেয়েছো—? আমি সব বলেছি, সব। আমি খুব খারাপ খুব।' ফোন নামিয়ে রেখেছিল রেণু। অনেকক্ষণ পর ঘরে ফিরে সুধাময় চিঠিটা একটা একটা করে সব পাতা পুড়িয়েছিল দেশলাই জেলে। চিঠির শেষে রেণু লিখত, 'ভাল থেকো—রেণু।' বড় মায়া লেগেছিল সেটুকু পোড়াতে তখন। সেই ছোট্ট টুকরোটা তুলে রেখেছিল সে। কোথায় আছে—স্যুটকেসে? কোন খামে? ঠিক মনে করতে পারছিল না সুধাময়।

ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ওর মনে হল কেউ যেন পেছন পেছন আসছে। চট করে মুখ ফেরাল সুধাময়। ঠিক কাউকে চোখে পড়ছে না। সেই লোকটা নাকি। কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরল। না বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সমস্ত বোধ নিয়ে সে অনুভব করছিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে। দূরত্ব বাড়াবার জন্য পা চালাল সে। সেই ছোট্ট টুকরোটা খুঁজতে হবে! যার দাম হাজার টাকা হতে পারে না? অথবা দশ হাজার কিংবা হাজার হাজার। যদি খুঁজে না পাওয়া যায়—ভীষণ ভয়ে ভয়ে সুধাময় শব্দ নিয়ে খেলা করছিল, ভাল থেকো রেণু, ভালো থেকো. রেণু ভালো থেকো, রেণু ভালো থাকো।

সময়ের চাবি

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

চিত্রকল্পের জটিল নকশা, শব্দের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, আয়রনির নিপুণ প্রয়োগ ইত্যাদির সমবায়ে উপন্যাসের আধুনিক শিল্পরূপ নির্মাণের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ দেখা গেল ফ্লোরেয়ারে এবং তারপর তাঁর ভক্ত হেনরি জেম্‌সে। অবিশ্যি তাঁরা ন্যারেটিভের প্রচলিত কালানুক্রমিক ছকটিকে প্রায় অক্ষতই রেখে দিয়েছেন। কিন্তু তারপর ইয়োরোপীয় সমাজের ব্যাপক অবক্ষয় ও ভাঙ্গনে ব্যক্তির সামাজিক সম্বন্ধের শেকড়গুলো ছিন্নভিন্ন হয়েছে, পুরনো বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে সাহিত্যের প্রচলিত ছকেও কোনও কোনও শিল্পী আস্থা হারিয়েছেন, উপন্যাসের নিটোল কাহিনী বিন্যাসকে ভেঙ্গে চুরমার করতে চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ বিশেষত জয়েসের প্রকরণগত পরীক্ষা উপন্যাস পাঠকের সুপরিচিত। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ জয়েস কিংবা তাঁদের আধুনিক অনুগামীদের রচনায় সমস্ত পার্থক্যের মধ্যেই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য চোখে না পড়ে পারে না: কবিতার স্বাবলম্বন ও দেশকাল নিরপেক্ষ সাঙ্গীতিক বিশুদ্ধতার অনুসরণে ঔপন্যাসিকের নিরংকুশ শিল্পকর্তৃত্ব-স্থাপনের চেষ্টা। কবি ঔপন্যাসিকের তুলনায় অনেক স্বাধীন, কবিতার প্রাথমিক ইউনিট শব্দ, পংক্তির নির্দিষ্ট মাপের গণ্ডি থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন অনেক আগেই, সময়ের চাপ বা আশেপাশের জগতকে এড়িয়ে তিনি শব্দ নিয়ে ইচ্ছেমত খেলতে পারেন, এক একটি ভাবপ্রতিমা গড়তে ভাঙ্গতে পারেন মুহূর্তে মুহূর্তে। দেশকালের সীমায় জীবনের ধারাবাহিক চিত্রণের দায়ে ঔপন্যাসিক আবদ্ধ, সেই দায় ঘাড় থেকে নামিয়ে কবিতার আকাশে স্বেচ্ছাবিহারের স্বাধীনতা উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্যাভিমানী শিল্পীরা পেতে চাইলেন।

তাই আধুনিক উপন্যাসের অবলম্বন হল সময়ের দায়দায়িত্বশূণ্য তাৎক্ষণিক আবেগ অনুভূতি চিন্তা ভাবনা, যা অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে প্রবাহিত ইতিহাসের কোনও সূত্রে আবদ্ধ নয়, ঘটনার কালানুক্রমিক বিন্যাসের পরিবর্তে কবিতার মত সময়ের ইউনিট হিসেবে শুধু কতকগুলো মুহূর্ত নির্বাচন, ক্লাসিক উপন্যাসের এপিক বিস্তারের পরিবর্তে লিরিকের মুহূর্ত আশ্রয়ী তীব্রতা, শব্দ ও চিত্রকল্পের নিপুণ

টুকরো টুকরো নকশা, মীথ যা তার অনুষঙ্গ, নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া, স্মৃতিচারণ, পদ বাক্য বা বাক্যাংশের চমকপদ মোচড়; কবিতার মত শব্দচিত্র বা বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি, তীক্ষ্ণ বাস্তবতার সঙ্গে ফ্যান্টাসি ইত্যাদির জকস্টাপজিশন। আধুনিক উপন্যাস হয়ে দাঁড়াল সময়ের গতির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন নিছক ব্যক্তিগত ভাষাভঙ্গি-সর্বস্ব নকশা, tour-de force, যাকে সমালোচকেরা বলেছেন spatialisation of form, শব্দের স্থির, নিশ্চল চিত্র। স্পেস-টাইমের, দেশ বা সমাজকালের দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক ছিল আগেকার উপন্যাসের ব্যক্তিজীবনচিত্রণের পটভূমি, আধুনিক উপন্যাসে তা অস্বীকৃত। এই উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্রের কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নেই, সমস্তই অল্পবিস্তর পরিমাণে শিল্পীর স্বয়ম্ভূ মানসের প্রতিচ্ছবি। বেশির ভাগ আধুনিক উপন্যাসই অস্তিত্ববাদের দ্বারা প্রভাবিত, ব্যক্তি সেখানে ভাসমান খড়কুটো, বিচ্ছিন্ন চিন্তাভাবনার অনুভূতির নিষ্ক্রিয় আধার, একটি মুহূর্তের বিভ্রান্তি, আপাততুচ্ছ জিনিস বা প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব; চোখে প্রখর রোদ ঝলসানো—ইত্যাদি মুহূর্তের মধ্যেই নায়ককে খুন বা এই ধরনের জীবন-ব্যাপী মর্মান্তিক বিড়ম্বনার অনিবার্য নিয়তিতে নিক্ষেপ করতে পারে। একালের শক্তিশালী লেখক স্যামুয়েল বেকেট ত আরও অনেক দূর এগিয়েছেন। তার কাছে এযুগের মানুষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবেই অর্থহীন, নিরালম্ব, তার সব কিছুই অনিশ্চিত, আছেও বটে নেইও বটে, যাকে ইলিউশন মনে করা হচ্ছে তা হয়ত বাস্তব, যা বাস্তব রূপে প্রতিভাত তা হয়ত ইলিউশন। তিনি তাই তাঁর উপন্যাসে দেশকালের পটে আধৃত মানুষের সমস্ত সামাজিক পরিচয়চিহ্ন এক আশ্চর্য নির্মম নিস্পৃহতায় মুছে দিয়েছেন, ভাষার কমিউনিকেশনঘটিত সামাজিক ধর্মকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাকে করে তুলেছেন উৎকেন্দ্রিক, ব্যক্তিগত শূণ্যতাবোধের ইডিয়ম।

হাল আমলের আঙ্গিক সচেতন বাঙলা উপন্যাসও মোটামুটিভাবে এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত। দু একটি উপন্যাস একালের বাঙলা উপন্যাসের হাওয়া কোন দিকে বইছে তার মোটামুটি একটা আঁচ পাবার চেষ্টা হয়ত একেবারে নিরর্থক নাও হতে পারে : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৪) এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুনপোকা' (১৯৬৭)। এই আলোচনার অসম্পূর্নতা প্রথমেই সবিনয়ে স্বীকার্য, উল্লিখিত উপন্যাস ছাড়া এই তরুণ ঔপন্যাসিকেরা হয়ত আরও গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন এবং অন্য কারুর কারুর এমন রচনা আছে যা আমাদের সযত্ন অভিনিবেশ দাবি করে। আমি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

সম্বন্ধে আগ্রহী কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের রচনা সংগ্রহ করতে পারিনি। ঐ দুটি রচনাই লেখকদের রচনানৈপুণ্যে বিশিষ্ট, উপন্যাসের নামে সমকালীন সমস্যা উপস্থাপনার আড়ম্বরপুর্ণ ভাবালুতাসিক্ত রম্যরচনা যা এখন উপন্যাস পাঠকদের অত্যন্ত প্রিয়, তার প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হননি। তাদের একালের সিরিঅস বাঙলা উপন্যাসের প্রবণতার মোটামুটি প্রতিনিধিত্বমুলক উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা বোধ হয় একেবারে অযৌক্তিক নাও হতে পারে।

'কুবেরের বিষয় আশয়'— এর নায়ক কুবের এক ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, মেণ্টার এককালে তাদের অবস্থা ভাল ছিল, বাবা মা, বড়দা, বউদি, ছোট ভাই নগেন বীরেন আর নিজের স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে শালকেতে নানা শরিকানায় ভাগ হয়ে যাওয়া বাড়ির অত্যন্ত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ অংশে কোনও রকমে মাথা গুঁজে থাকে। কলকাতার বাইরে বেশ কিছু জমি নিয়ে ভাল বাড়ি তৈরি করে সকলকে নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে থাকার সাধ কুবেরের। চার-দিকে জমিজমা খোঁজার সূত্রে কুবের বহুদিন আগেকার পরিচিত ব্রজদা ও তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আভার সান্নিধ্যে আসে, ব্রজদা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কদমপুরে ঘরভাড়া করে থাকে। কদমপুরে নিজের বাড়ির জন্য জমি কেনার পর থেকেই কুবেরের জমি কেনাবেচার ব্যবসা শুরু হয়, তার হাতে প্রচুর অর্থ আসতে থাকে, কদমপুরে বিরাট বাড়ি তোলে, রাস্তাঘাট বানিয়ে জায়গাটার ভোল পাল্টে দেয়, ঐ তল্লাটের ভদ্রেশ্বরের পরামর্শে ধানচাষে আরও টাকা কামাবার নেশা তাকে পেয়ে বসে। এর মধ্যে তার মায়ের মৃত্যু ঘটে, ছোটভাইরা কেউ তার সঙ্গে কদমপুরে এসে থাকতে রাজি হয় না। কুবের মেদমল্লর দ্বীপে বহুলোকজন নিয়ে চাষবাসে নামে, এখানেই ব্রজদার বন্ধুদের দ্বারা উত্যক্ত হয়ে আভা তার আশ্রয় নেয় এবং তার সংসর্গে গর্ভবতী হয়। ঝড়ে এই দ্বীপে সদ্য উদ্‌গত প্রায় সমস্ত ধানগাছ নষ্ট হয়, কুবের তার সবকিছু খুইয়ে বসে। আভাকে গলাটিপে মেরে মাটিতে চাপা দিয়ে সে সর্বস্বান্ত, ভগ্ন অবস্থায় ফিরে আসে, তারপর একদিন রাত্রিতে তার বাড়ির কাছেই সাপের কামড়ে ঢলে পড়ে।

অবিশ্যি কোনও সংক্ষিপ্তসারেই 'কুবেরের বিষয় আশয়'-এর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ, ঘটনার গ্রন্থনে নয়, বাক্‌রীতিতে, বিন্যাসনৈপুণ্যে, টেক্‌সচ্য-রেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখক তাঁর ন্যারেটিভকে এমনভাবে গেঁথে তুলেছেন যে তা আমাদের মনকে টেনে রাখে। কিন্তু লেখকের শক্তিই উপন্যাসটির নিপুণ ডিজাইন tour-de-force সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। কুবেরের অস্তিত্বের

অন্যতম প্রধান অংশ তার বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত। কলকাতার পরিবেশ কুবেরের অসহ্য হয়ে উঠেছিল, কলকাতায় বাসে-ট্রামে ঠাসাঠাসি, ফালি ফালি ঘর, শীতকালের সন্ধ্যে হতেই ময়লাভর্তি চাপ চাপ ধোঁয়ার দলা অতিকায় বাদুড় হয়ে ট্রামের তারে ঝোলে। তখন চোখ জ্বলে, নিঃশ্বাস টানা যায় না। আত্মঘাতী হওয়ারও ভাল জায়গা নেই।' তারপর, নয়ানের ভাই ভোম্বল বহরিডাঙ্গা রেজেষ্ট্রি অফিসে একজনের জমির অংশ কোবালার দিন কুবেরের সঙ্গে সনাক্ত করতে গেলে তাকে মুখে মুখে জমির চুলচেরা হিসেব করতে দেখে ভোম্বল বলেছিল, 'আপনি পাগলা হয়ে যাবেন—এতো হিসেবে, দর—এসব দিয়ে হবে কী! কলকাতায় এর চেয়ে ভালে থাকেন না?' কুবের একথার কোনও উত্তর দিতে পারে নি—'সত্যিই কি একটুখানি ভাল থাকবার জায়গা বানাতে গিয়ে সে আগাগোড়া বিষয়ে ডুবে যাচ্ছে।' এরপর আবার শহরের শ্বাসরোধকারী পরিবেশের বৈপরীত্যে তার বাড়ি করার স্বপ্ন আসে অনেকটা কবিতার বিন্যাসে: 'বিকেল ছিল। ট্রাম চেঁচাচ্ছে, প্যাসেঞ্জার চেঁচাচ্ছে, ঠেলার আগা রাস্তার জন্যে বাসের পেছনে সামনে খোঁচাচ্ছে—বিকেল বেয়ে ঝুলন্ত ধোঁয়া সমস্ত বাতাসটুকু শুষে নেবার তাল খুঁজছে। ঠিক এখন যদি এক বিঘের ওপর তাদের একটা বাড়ী থাকত (বাবার জন্যে ছোট হামানদিস্তের শব্দ করে পান ছেঁচছে ঝি)।' আবার তার মনে হয়, আগেকার দারিদ্র্যের জীবনই ছিল ভাল: 'বাড়ি ভাগা-ভাগি হয়েছে সবে। বাবার চাকরি নেই। বড়দা শুধু রোজগেরে। আশিজন পাওনাদার ছোঁক ছোঁক করছে স্কুল কলেজে মাইনে বাকি, রেশনের টাকা থাকত না—ভোরে ঘুম থেকে উঠলে পিঠ ব্যথা করত। সারা রাত এক কাতে শুয়ে না ঘুমোলে জায়গাই হত না তবু তখন কত শান্তি ছিল।' এর পর পাই স্ত্রী বুলুর কাছে ঘুড়ি খেলার উপমায় তার টাকার নেশার কথা: ছোট বেলায় একটা কাটা ঘুড়ি পুকুরে পড়লে সকলে পুকুর পাড়ে ছুটে এসে থমকে দাঁড়ায়, কুবের ঝাঁপিয়ে পড়ে কাগজ জলে গলে যাওয়া সত্ত্বেও ঘুড়িখানা নিয়ে বীরদর্পে ওঠে—'আমার জীবনে অন্তত একবার ঘুড়ি লোটার দরকার ছিল বুলু। একবার আমাকে টাকার শেষ দেখতেই হবে। ঘটির তলায় কি আছে আমি জানবোই' (•এই আয়রনিক উপমায় অবিশ্যি তার বিষয় আশয় সঞ্চয়ের পরিণাম মেলে)। কদমপুরের বাড়িতে আসার জন্য কুবেরের মা খুব ব্যাকুল হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আর আসা হল না, তাঁর মৃত্যু ঘটল, এক অপরিসীম শূণ্যতায় কুবেরকে আচ্ছন্ন হতে হল: 'এতদিনকার ভাবনাচিন্তা, উদয়াস্ত পরিশ্রম সব জলে গেল। কুবের কোন দিন নিজের জন্য এত সব করতে চায় নি। তার বিশেষ কিছু দরকারও হয়

না। ··· ··· কতরকম স্বপ্ন ছিল। মা আসবে, বাবা আসবে—রেশনে লাইন দেওয়ার চিন্তা থাকবে না। ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ, মাঠের সবজী—সব কিছু কুবের গুছিয়ে আনছিল। হরিরাম সাধুখাঁর ভদ্রাসন থেকে বেরিয়ে এলেই সবার হাতের সামনে কুবের এসব এগিয়ে দিত। এখন এত সব দিয়ে কি হবে। কার কাজে লাগবে। ছেলে, মেয়ে, বুলু, কুবের আর বাড়ীর লোকজন মিলিয়ে ফেলে ছড়িয়ে সব শেষ করা যাবে না।' (১৩১ পৃঃ)।

কিন্তু কুবেরের এই শূন্যতাবোধ স্থায়ী হয় না, বুলু যখন তাকে নিয়মিত টাকা আসার বন্দোবস্তের কথা বলে তখন: 'টাকা আসবে—কথাটা শুনলেই কুবের সব সময় ঝক করে স্টার্ট নেয়' (পৃঃ ১৩৮)। মেদনমল্লর দ্বীপে চাষবাসের সময়ও তাই টাকার নেশায় তাকে মত্ত হতে দেখি: 'ধানের কথা ভাবতে গিয়ে কুবেরের মাথার ভেতরে আগুন ধরে গেল। তিরিশ হাজরে মণ। লঞ্চঘাটার বাজারে সুবিধে দরে ছেড়ে দিলেও--ওরে বাব্বা! ভাবা যায় না। অনেক টাকা। ষাট টাকার নীচে নিশ্চয় মণ নামবে না (পৃঃ ১৯২)।' এর আগেও কুবেরের এই ধান ও টাকার উত্তেজনাময় স্বপ্ন পাই: 'ধানের ভারে সারা তল্লাট নুয়ে পড়েছে। লোক-জন দেখা যায় না। কুড়িটা মোষের মাথা ঢাকা পড়ে গেছে। দিঘির ধার দিয়ে পরির সারি আড়ালে চলে গেছে। কুঁজি বেঁধে চাষীরা সংসার করছে। ব্যাপারীদের নৌকোগুলোর গলুইতে আঁকা মাছ, মানুষের চোখ, নোম্বরের আঁক সব কিছু চিক চিক করছে। এক লহমায় কুবের সাধুখাঁ আগামী শীতের চেহারাটা দেখে ফেলল। এখনই বস্তা নব্বই বিরানব্বই টাকা। ধরে রাখতে পারলে—উঃ ভাবা যায় না (পৃঃ ১২৪)।' কুবের নিজেকে বার বার 'ড্রিম-মার্চেন্ট' বলেছে, মানুষের জীবনের সব থেকে বড়ো স্বপ্নসাধ জমি জায়গা বিষয় সম্পত্তির কারবারী সে, তার কাছেই তার মা পালং বোনার জন্য এক কাঠা জমি চেয়েছিল, 'ড্রিম মারচেন্ট কুবের সাধুখাঁর গর্ভধারিণী এক কাঠা জায়গা চেয়েছিল' (পৃঃ ১৩৮), কিন্তু পুত্রকে দিয়ে তাঁর সে স্বপ্ন পুরণ হল না, মায়ের এই সাধের কথা একাধিকবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কুবেরের এই সমস্ত বিপরীতমুখী টান আসে স্বপ্নদৃশ্যের মত টুকরো টুকরো ছবিতে, মুহূর্তে মুহূর্তে এক একটি ছবি মিলিয়ে যায়, আর একটি তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, কোনও প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণার সূত্রে গ্রথিত হয়ে ট্র্যাজিক বিড়ম্বনার অর্থপূর্ণ রূপ পায় না। বাবা মা ভাইদের নিয়ে যৌথজীবনের সাধ, মেদনমল্লর দ্বীপের অনাত্মীয় পরিবেশে নিজের সংসারের জন্য চিন্তা—'নিজের ছেলে বলতে কুবের বোঝে সৃষ্টিধর। ..নিজের মেয়ে বলতে কুবের বোঝে কুসুম।

বউ বলতে বোঝে বুলু। কতদিন এদের দেখিনি। আমি কি করতে এসেছিলাম এ তল্লাটে। সবাইকে নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকব। আজ কেউ আমার জন্য বসে নেই। আমার মতো করে ভাবারও কেউ নেই' (পৃঃ ১৯২), এমন কি নিজের মায়ের জন্য বেদনাকেও মনে হয় না কুবেরের সত্তার কোনও গভীর শেকড়ের জিনিস, যার টান লক্ষ্যগোচর হয় উপন্যাসের চরিত্রের স্নায়ু মজ্জায় রক্তে, আচরণে, প্রতিটি অভিজ্ঞতা ও চিন্তায় এবং তাদের জটিল সমবায়ে, জীবনবিস্তৃত ভেতর ও বাইরে দ্বন্দ্ব সংঘাতে, এক কথায়, উপন্যাসের স্বধর্মে, তার নিজস্ব চারিত্র্যে। মেদন মল্লর দ্বীপে কুবেরের ধান টাকার স্বপ্নও কোনও ভয়ংকর আত্মঘাতী ট্র্যাজেডির রূপ নয়, এমন কি জাত গোখরো সাপের কামড় খেয়ে আচ্ছন্ন হবার মুহূর্তে সে স্বপ্ন যখন ফিরে আসে তখনও নয়ঃ 'সাপটা এই ঠাসা জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে খুব ঢিলে ঢালে একটু একটু করে গর্তে গিয়ে ঢুকে গেল। যাবার সময় লেজে সারাটা আলোর পরত নেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুবের পরিষ্কার দেখল, হলদে গুঁড়ি গুঁড়ি রাজ্যের ধান ছড়িয়ে এই মাঠ ভরে গেল। আজলা ভরে তোলা যায় প্রায় দুধ এসে দানা ভরে শক্ত হয়ে গেছে—আলে আলে কামলারা কাস্তে হাতে দাঁড়ানো। এখন একদল কাটবে—আরেক দল আটি বেঁধে বেঁধে এগোবে' (পৃঃ ২৮১)। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের একটি মানুষ সংসারের সকলকে নিয়ে ভালোভাবে থাকার জন্য জমিজায়গা বসতবাড়ির ধান্দায় থাকতে থাকতে কিভাবে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বিষয় সম্পত্তির অজগর-পাকে জড়িয়ে যায়, নিজেকে হারাতে থাকে—সেই বাস্তব সমস্যার পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ লেখকের লক্ষ্য নয়, কদমপুরে জমি কেনার পূর্ববর্তী স্তর পর্যন্ত জমির জন্য টাকা জোগাড় করা, নানা হিসেব-নিকেশ হাঙ্গামাহুজ্জত, দলিল্ দস্তাবেজ শরিকানার নানা ঝামেলা কুবেরের বিষয় আশয় সংগ্রহের বাস্তব চেহারা ফুটেছে, তারপর আমরা শুধু তার অর্থ ও সম্পত্তির বর্ণনাটুকুই পাই, তার প্রক্রিয়ায়, টানা পোড়েনে, নানা চাপে কুবের কিভাবে আবর্তিত হয় সেই সমস্যাজটিল দ্বন্দ্বসংঘাতময় চিত্র নয়। কুবেরের বিষয় আশয়ের ছবিগুলোর কোথায়ও কোথায়ও আয়রনি আছে, কিন্তু তা ছিল নিপুণ তির্যক ভঙ্গি, মোচড় মনে হয়। বিদ্যুতের মত জীবনবীক্ষেণের কোনও তীক্ষ্ণ দীপ্তি তাতে মেলে না। আসলে কুবের লেখকের অস্তিত্বের শূন্যতাবোধের উপকরণ মাত্র, সে এবং তার সব কিছুই তুলির নানা রঙের নিপুণ আঁচড়ের ক্লস্টার, শুধুই ক্লস্টার আর কিছু নয়।

কুবেরের যৌনব্যাধির প্রসঙ্গ ও চিত্র, তার সঙ্গে বুলুর এবং তারপর আভার

সঙ্গে **সম্পর্কও** আসে একই বিচ্ছিন্নতায়, নিছক প্যাটার্ন হিসেবেই। ২য় মহাযুদ্ধের সময় কুবের তার বন্ধু সনতের সঙ্গে নিতান্ত কৈশোরে হঠাৎই দুপুরে গণিকা-পল্লীতে গিয়ে শেফালি বলে একটি পতিতার দৈহিক সংসর্গে আসে, তারপর তার পুঁজ বেরুতে শুরু হল, পাড়ার হরি ডাক্তারের জোড়াতালি চিকিৎসায় আপাতভাবে সুস্থ হয়ে উঠল। কুবেরের জীবনের এই শোচনীয় অধ্যায়টি আসে তার স্মৃতি-চারণে, ছয় ও নয় পরিচ্ছেদে। প্রথম পরিচ্ছেদে উপন্যাসের শুরুতেই রয়েছে তার হাতের ও পায়ের আঙুলের কালচে দাগের প্রসঙ্গে জমি খোঁজার সূত্রে ট্রেনেই তার কদমপুর হেল্‌থ সেণ্টারের ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ, তাকেই সে এই কালো ছোপ দেখায়ঃ 'দেখুন ছোটবেলায় খুব একটা ট্র্যাজিক', একটু থামতেই হলো কুবেরকে, এত ভিড়ে কিছু বলা যায় না, 'স্যাড্ এক্সপিরিয়েন্স—ঘটনা বলতে পারেন'—কুবেরের ঐ ব্যাধির চিত্রকল্প এবং উক্তিটি ডিজাইনের মত উপন্যাসে ঘুরে-ফিরে এসেছে বহুবার। যেমন, 'অজান্তে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের গাঁট গায়ে ঘসে দেখলো কুবের। জায়গাটা শুধু কালোই হয়নি—কেমন খসখসে হয়ে যাচ্ছে' [ছয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৯], 'কুবেরের বাঁ হাতের কেনে আঙুলে খানিক জায়গা কালো হয়ে উঠছে ইদানিং' [এগারো, পৃঃ ৯২]; 'পরিষ্কার রোদ্দুরে তার হাতের আঙুলের কালো কালো দাগগুলো শুধু চোখের সামনে ভয়ঙ্করভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল' [ষোল, পৃঃ ১৩৩], 'কোমরের নীচে, পেছনে হাড়ের ভেতর আজকাল ওঠা-বসার সময় মড় মড় করে আওয়াজ হয়। গালে, কপালে কালো কালো ছোপ ছড়িয়ে পড়েছে' [উনিশ, পৃঃ ১৫১]। কুবের তাব জীবনের 'স্যাড ঘটনা, স্যাড এক্স্‌-পিরিয়েন্সে'র কথা স্ত্রী বুলুকে, বুলুর মেয়ে হওয়ার সময় হাসপাতালের ডাক্তারকে, মেদনমল্লর দ্বীপে সঙ্গিনী আভাকে বলতে গেছেঃ 'আভা। আমার অসুখ আরও বড়ো! ইদানিং আমি পরিষ্কার টের পাই—গতকালও আমার শরীরে যে জায়গা সুন্দর ছিলো, আজই সকালে তা কালো হয়ে যাচ্ছে। .... আভা। ইদানিং আমি পরিষ্কার টের পাই—আমার মেরুদণ্ডের হাড়ের চাকতির বল বেয়ারিং মজ্জা শুকিয়ে যাওয়ায় তেল মবিলের অভাবে খচ খচ করে ওঠে। আমাকে আর কিছুতেই চালু রাখতে চায় না। কেননা, একটা স্যাড ঘটনায়—এক্স-পিরিয়েন্স বলতে পার—আমার মাথার ভেতরে ঘিলুর পরতে পরতে মনে করে রাখার সিঁড়িগুলো একদিন ঘচাং করে মুছে যেতে পারে।' জীবনের এই শোচনীয় অধ্যায়টি প্রথম আভার কাছেই কুবের খুলে ধরে, কি ভাবে সেই ঘটনা তার জীবনে দুর্বিষহ বোঝা হয়ে তাকে পঙ্গু করে রেখেছে, সেই থেকে তার মুখে নিষ্পাপ সরল

ভাবের মুখোস এঁটে গেছে, ব্যাধির বিষ তার মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে মাঝে মাঝেই তার স্মৃতিভ্রংশ ঘটাচ্ছে। কুবের বার বার বলেছে, সে নম্বরী, দাগী আসামী। কিন্তু এই ব্যাধি ও তার চাপে কুবেরের ক্ষয়ে যাওয়ার ক্লান্তি অবসাদ আসে নিছক প্রাকৃতিক ঘটনার মত তাৎপর্যহীন বিচ্ছিন্নতায়।

'কুবেরের বিষয় আশয়ে'র নারী পুরুষের সম্বন্ধের চিত্রগুলোয়ও এই জীবনা-বেগবিতৃষ্ণ মনোভঙ্গি, অনীহার ছাপ। স্ত্রী বুলুর প্রতি কুবেরের আচরণের প্রথম চিত্রটিই ধরা যাক : 'চারদিক তাকিয়ে ঠিক ঠোঁটের ওপর বড় একটা চুমু বসিয়ে দিল কুবের। তা সরিয়ে দিয়ে ঠিক যখন ট্রাঙ্কের কথাটা পাড়তে গেল বুলু তখন কুবের বেশ জাপটে বুলুর কাঁধ কামড়ে ধরলো। ভালবাসার লাইনে কত রকম যে আছে। যা ইচ্ছে একটা করে দিলেই তা লেগে যায়। অন্তত কুবের তাই মনে করে। মাথার তেল, কয়েকটা চুল জিভে—তবু ছাড়ল না কুবের,' তারপর—'বুলুকে কামড়ানোর পরদিন ভোরে ডিউটি ছিল কুবেরের।' বিশেষ করে নারীপুরুষের ক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্কে আস্থাহীন লেখক প্রথম থেকেই যে জান্তব অস্থিত্বে বুলুও কুবেরের সম্পর্ককে বেঁধে দিয়েছেন, এই অংশেই বোঝা যায়। সিনেমা দেখতে গিয়ে এক সময় তার আর্থিক সচ্ছলতায় বুলুর তৃপ্ত মুখ দেখে কুবেরের মনে হয়, 'এই মেয়েলোকটি তো তার বউ', বুলুর কাছে তার প্রথম যৌবনে তাকে নিয়ে মেয়েদের প্রেম-খেলার প্রসঙ্গে সে বলে, 'আমি তখন প্রায় মেয়েমানুষের নাঙ্ হয়ে উঠেছি', কুবের তার ছোট ভাই নগেনকে যত ভালবাসে ভাই তাকে তত ভালবাসে না, বুলু এ কথা বলার পর—'এইখানে কুবেরের ইচ্ছে হয়েছে, চেঁচিয়ে বলে ওঠে—তুই থাম মাগী। কতখানি জানিস আমার ভাইকে? বিষম খেলে নগেনের বুক লাল হয়ে ওঠে, জামার ভেতর দিয়ে আমি দেখতে পাই, তুই জানিস এসব? কিন্তু বলতে পারেনি কুবের। বিয়ে করা বউ, ছেলের মা বুলু, আরও একটা পেটে এসেছে। জীবনের মাঝখান থেকে শেষ অব্দি এই অন্য আরেকজনের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকতে হবে।' জমি-জায়গা সংগ্রহের প্রথম পর্বে বুলুর গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা এই চিন্তায়, 'এই অবস্থায় আবার যদি বুলুর পেট ফুলে ওঠে—সে এক দুশ্চিন্তা' কিংবা তার গর্ভবতী হওয়ার পর এই ভাবনায়—'কিন্তু ইদানীং বুলুর দিকে তাকালে কুবেরের বার বার মনে হয় - বুলু মূর্তিমতী প্রতিবন্ধক। বড় সাইজের কোন ঝুঁকি নিতে গেলে ভয় হয়। ভরাডুবি হলে এই মেয়েলোকটি ভাসবে। কোথায় তাকে খানিকটা রিলিফ দিয়ে ইচ্ছে মত কাজ কারবারে এগোতে দেবে—তা নয়, ঠিক

এই সময় মা হয়ে বসল' তাদের সম্পর্কের অন্তঃসারশূণ্যতাই আভাসিত, অথচ এ সম্পর্কে নিজের কোনও দায়িত্ববোধ কুবের বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়, বুলুর সঙ্গে তার সম্পর্ক কোনও সময়েই সমস্যার কোনও রূপ নেয়নি, সে তার কাছে 'শুধু একটি মেয়েলোক'।

আভার সঙ্গে কুবেরের সম্বন্ধের চিত্রই বেশী মেলে। জমি কেনার সূত্রেই কুবের তার বহুদিনের পরিচিত ব্রজদার কদমপুরের ডেরায় আসে। তার অতিথি হয়। ব্রজদা পুকুরে স্নান করতে বেরিয়ে গেলে আভা তাকে গতদিনের চাঁদ দেখার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলে—'এত কাছে বলে স্পষ্ট দেখলাম চাঁদখানার ওপর অন্তত দু'ইঞ্চি পুরু করে নরম নীল মাখন মাখানো—, ... অথচ চিরকাল জেনে এসেছি চাঁদ হলুদ রঙের'—, অমনি আকস্মিক বিহ্বলতায় কুবের আভার প্রতি আকৃষ্ট হয় : 'এমন একটা কঠিন ভাবনা থেকে বাঁচানোর জন্যে কুবের সেদিনই প্রথম আভাকে শক্ত করে ধরে চুমো খেয়েছিল।' এটা শুধু একটি মুহূর্তেরই ব্যাপার, নীল চাঁদের চিত্রকল্প, ফ্যান্টাসিও আমাদের কাছে কোনও তাৎপর্য বহন করে আনে না। সরকারের পেট্রল সন্ধানের সঙ্গে যুক্ত, ব্রজ দত্তর বন্ধু সাহেব মিত্তিরের দ্বারা উত্যক্ত হয়ে আভা পালিয়ে মেদনমল্লর দ্বীপযাত্রী কুবেরের লঞ্চে এসে তার আশ্রয় নেয়। লঞ্চ কুবেরের আবাদের জায়গা মেদনমল্লর দ্বীপে যাবার সময় দূরে বসা আভাকে এক ঝটকায় হাত ধরে কাছে টেনে আনে সে, 'অরক্ষিত মেয়েমানুষ সব সময় যে কোন পুরুষেরই প্রিয় জিনিস', সন্ধ্যে হতে আভা কুবেরের সামনেই পা ছড়িয়ে খোঁপা ভেঙে বিনুনী বাঁধতে বসলে—'কতকাল এমন মেয়েলোক দেখেনি কুবের', অতঃপর জ্যোৎস্নায় মেদনমল্ল দুর্গ দেখার সময়—'কুবের নিজেকে সামলাতে পারল না। এমন পোড় খাওয়া মেয়ে মানুষটা কি করে জলের সামনে, আলোর সামনে খুকিটি হয়ে যায়। আর পাঁচজন পুরুষে যা করে, কুবের তাই করল। আলিঙ্গন ওরফে জাপটানো, তারপর বিছানায়।'

একটি অভিপ্রায়েই কুবের আভাকে চেনে, তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, 'মেয়েমানুষ', কুবের তাকে দুর্গের ভেতরটা ঘুরে ঘুরে চললে আভা যখন বলে, একা তার ভয় লাগে, হঠাৎ যদি ভয়ঙ্কর চেনা বলে লাগে তখন তার মধ্যে কুবের নিজের মনের কথাই শোনে—'এই সব জেনে ফেলে বলে পরের বউ হলেও আভা ফট করে নিজের নিজের মেয়েমানুষ হয়ে গেছে' (আর কোথায়ও কিন্তু এভাবে তার নিজের মনের কথা জেনে ফেলার ব্যাপার দেখা যায় না), তারপর আসে মেয়েলোক ভালো লাগার নেশার মত্ততা : মেয়েলোক একবার ভালো লেগে গেলে পূব-পশ্চিম ঠিক

থাকে না;' তার আগে আভা কুবেরের সঙ্গে তার মিলনজাত গর্ভের সন্তান তার কথামত নষ্ট করতে চায়নি বলে সে তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছে, বুলুর কতটুকু কুবের জানে, আভার এই কথায় তার মন সন্দেহের বিষে পাক দিয়ে উঠেছে। আভা ফট করে তার নিজের মেয়েমানুষ হয়ে গেছে; একথা মনে হওয়ার পর আভা যখন দুর্গের চওড়া দেওয়াল ধরে অনেক উঁচুতে উঠে নামতে না পেরে তাকে ডাকে তখন—'কুবের টের পেল, এখন আভা পড়ে গেলে তার খুব কিছু যাবে আসবে না। আভা যে ভোর রাতে 'ডাহুকে' উঠে এসেছে—সে কথা কেউ জানে না। শুধু কুবেরের কদমপুরে গিয়ে চুপ মেরে থাকতে হবে' অসংলগ্নভাবেই এই চিন্তা তার মাথায় আসে। বিরক্ত হলে তার মেয়ে কুসুম যেমন তার পুতুলের হাত, পা, মুণ্ডু হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলে, তেমনি ভাবে, কুবের আভার বুকে বুক রেখে তাকে আগাগোড়া জড়িয়ে ফেলে 'তুমি বুলুর কি জান', এই প্রশ্ন করার পরই দুহাতে তার গলা টিপে তাকে শেষ করে আগেকার খোঁড়া গর্তে মাটি চাপা দেয়। ব্যাধির প্রকোপে ধীরে ধীরে তার স্মৃতিভ্রংশতা ঘটার জন্য কুবের ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল, যে কোনও উপায়ে যে কোনও কাজে জড়িয়ে পড়ে নিজের এই হারিয়ে যাওয়াকে রোধ করতে হবে, কিছু আগে কুবেরের এই বিড়ম্বনার বর্ণনা পাই, তারই জের টেনে কিছু একটা করে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা হিসেবে আভাকে খুন করার আগে শুধু তার এই পটভূমিগত সূত্রটি পাই, কোনও মানসিক বিক্ষোভ-আলোড়নের প্রক্রিয়া নয়। ব্যাধির বিষে আচ্ছন্ন গ্লানিময় অস্তিত্বের চাপ মুহূর্তের তীব্রতায় দুঃসহ হয়ে উঠে এই কাজে মানুষকে ঠেলে দিতে পারে এখানে তার কোনও বোধই আমাদের মনে সঞ্চারিত হয় না বাস্তবতার সেই পটভূমি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চিত্রণে শ্যামল উৎসাহী নন, তিনি খুব শীতল ভঙ্গিতে তুচ্ছ কোন বিষয় বা ঘটনাকে কিছুটা উদাসীন, আপতিক ভাবে (casually) বলার চালে এই দৃশ্যটিকে আঁকেন : 'তুমি বুলুর কি জান ?

আভা এবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। গলা দিয়ে বেড়িয়ে এল, ছাড়ো-ও'—

আর কোন চান্স পেল না। তারের জাল, রবার, ফাইবার—কিছুই পেল না কুবের। একটু জোর দিয়ে চেপে ধরতে হল দু'হাতে। শেষ দিকে আর একটু চাপ—দম ধরে যাওয়ার যোগাড়। সে কিছুতেই ভুলতে চায় না। কোন একটা জিনিস ধরে তাকে উঠতেই হবে। হাতের আঙুলে মাংসের নীচে কয়েকখানা খুচরো, পাতলা হাড়ের জোড় একটু লাগছিল। ভারী মাল তোলার সময় কুলিরা

চেঁচায়—আউর এক দফে হেঁইয়ো। প্রায় তাই। শেষে একটু একটু একস্ট্রা জোর লাগল। আভার মুখটা ফুলে গিয়ে দু'টো চোখই ঠেলে বেড়িয়ে পড়ল।'

নিজের দেহ ব্যাধির বিষে দূষিত, তার সবটাই ঘুণ ধরা, সব জেনেশুনে আর একজনকেও সে আনতে চায় না, একথা বলে কুবের আভাকে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জন্য অনুরোধ করেছে, পরে আক্ষেপ—'দয়া কর আভা। আমাকে একটু দয়া কর। আচমকা আমার বাচ্চা পেটে ধরার কোন দরকার ছিল না তোমার। ইচ্ছে করলেই কলকাতায় গিয়ে মুক্ত হয়ে আসতে পারতে।' এক্ষেত্রেও নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোনও যন্ত্রণাবোধ কুবেরের নেই। সাপের কামড়ে মৃত একটি মজুরের দেহকে পেট্রল দিয়ে পোড়াবার সময় সে ভাবে 'এই লোকগুলো কত সস্তা। আসলে মানুষ কত সস্তা। দিন মজুরির টানে কোন সেই শালবণী, চন্দ্রকোনা আরও ওপাশের লোক একটানা চারমাসের কাজের লোভে এতদূর ছুটে এসেছে। তবুও পৃথিবীতে রোজ লোক হচ্ছে, জন্মাচ্ছে। এই অবস্থায় সে আর একবার বাবা হয় কি করে।' কুবের সহজেই, বিচ্ছিন্নভাবেই, মুহূর্তের অসংলগ্ন চিন্তায় অস্তিত্বের অর্থহীনতার ধারণায় পৌঁছে যায়। লেখক যে তাঁর চরিত্রের মানবিক সত্তাকে একেবারেই ধরতে চান না তাও নয়, মেদনমল্লর দ্বীপ থেকে বিধ্বস্ত অবস্থায় নিজের বাড়িতে ফেরার পর এক জ্যোৎস্না রাত্রিতে যে বেদনায় কুবের বিচলিত হয় তাকে আমাদের অত্যন্ত আপন লাগে : 'আমাকে আর নগেনকে মা একথালায় ভাত মেখে খেতে বসাতো। তখন গল্প বলত মা। ছোটবেলায় জুড়িয়ে গিয়েও যায় না। কবে কাকে কতখানি ব্যাথা দিয়েছি মনে—আলাদা করে কিছুই মনে রাখতে পারিনি। জানা-শোনা ছাড়াও যাদের আবছা দু'একবার দেখেছে—তাদের জন্যেও আজ কুবেরের চোখ ফেটে জল আসছিল। কেন—তা জানি না। হরগঞ্জ বাজারের বাইরে এক বুড়ো রাস্তায় বসে পুরনো শাড়ি রঙ করে বেচতে বসত। ইস্কুলে এক বন্ধুর বাবাকে সেখান দর করে শাড়ি কিনতে দেখেছিল। যতবার মনে পড়ে—ততবারই কুবেরের খুব কষ্ট হয় সেই লোকটির জন্য।' কিন্তু এই ধরণের মুহূর্ত কুবেরের জীবনে এই একবারই আসে, লেখক তাকে যন্ত্রণাবোধের কোনও প্রবল টানে পরিণত করেন না, তাকে নিজের অস্তিত্বের অর্থহীনতার বোধে বুদ্বুদের মতই মিলিয়ে যেতে দেন।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ে তাঁর উপন্যাসে ইংরেজি বাংলা মিশ্রিত শহুরে আলাপের হালকা চালের যে ডিকশন বা বাক্রীতি ব্যবহার করেছেন তাতেও তাঁর জীবন বিষয়ে অনীহা পরিস্ফুট হয়। যেমন, কলকাতার বর্ণনা – 'রোজ সকালে পঞ্চাশ লক্ষ

লোকের জিনিষপত্রের আণ্ডার গ্রাউণ্ড দিয়ে গঙ্গাযাত্রা। এত লোক দিনের মধ্যে কতবার জলসারে.' 'কাল রাতে গোড়ার দিকে বুলুর মাথাধরা ছিল—শেষ রাতে তাকে খালি অ্যাভয়েড করেছে,' আভা বউদির বর্ণনা—'কদমপুরের মতো জায়গায় লেস লাগানো শাড়ি, অথচ পায়ে খড়ম, কপালে লম্বা করে আবিরের টিপ—ঝিলের স্থির জল ব্যাক গ্রাউণ্ডে' 'বুলু, ব্রজদা ইত্যাদি পরিচিত ইউজুয়াল এলাকা থেকে তাকে একদিন না সরে আসতে হয়'—শেফালির সঙ্গে দৈহিক সংসর্গের বর্ণনা 'বেশি ক্ষণ এগোতে হয়নি তাকে—প্রথমটা জলে গিয়েছিল, তারপর মাথার ভেতরের ঘিলুর খানিকটা কে সুড়ুৎ করে চুষে নিল'; 'এই এখন—এখনকার লোকজন, টাইম, বিপদ-আপদ, ভাবনাচিন্তার সঙ্গে নিজেকে যে-কোন উপায়ে সেফটিপিন দিয়ে গেঁথে রাখতে হবে,' 'মাথার ঘোমটা টেনে কুবেরের খুব ফেবারিট পোজে বুলু পান এগিয়ে দিল।' এই সমস্ত অংশ-বিশেষ আভাকে খুন করার বর্ণনার পূর্বে উদ্ধৃত বাক্যের আপতিক, ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত চালে লেখক যে জীবনের অর্থহীনতাকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান না, আমাদের তা মনে না হয়ে পারে না।

ঔপন্যাসিকের জীবনবিতৃষ্ণার আর এক প্রমান মেলে বুলু ও সাহেব মিত্তিরের সম্পর্কের চিত্রগুলোতে। কুবেরের তুলনায় স্বল্প পরিচয়েই সাহেব মিত্তিরকে বুলুর আকর্ষণীয় বলে মনে হওয়ার কারণ লেখক আপতিক ভাবেই জানান: 'অনেক দিন দাড়ি কামানো ফিটফাট একাগ্র পুরুষ তার চোখে পড়েনি। ইদানীং কুবের সাধুখাঁ নামে তার দখলদার যে পুরুষটিকে সে দেখে আসছে—তার জামা কাপড়ের ঠিক থাকে না, সারাদিন পরে শোয়ার আগে সে জমা-খরচের হিসেব খাতায় তুলে রাখে।' সকালবেলায়ই দাড়ি কামিয়ে সাহেব মিত্তির ফিটফাট হয়ে থাকে, আর তার প্রতি একাগ্র—শুধু এই সূত্রেই মেদনমল্লর দ্বীপে কুবেরের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সাহেব মিত্তিরের প্রতি বুলু আকৃষ্ট হয়, তার কাছে ধরা দেয়, স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কের ভাঙ্গন কিংবা টানাপোড়েনের সূত্রে নয়। আর সাহেব মিত্তির, তার লোভের প্রথম লক্ষ্য ছিল আভা—'মাস খানেক আগেও নিষুতিরাতে এই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্রজ ফকির আর সে—দুজনে দুদিক থেকে একটা জিনিস নিয়ে টানাটানি করেছে। সে জিনিসের নামও মেয়েমানুষ ওরফে আভা।' বুলুও তার কাছে তাই: 'চুলসুদ্ধ কানের পাশ, ভারি খোঁপা, নাকের একদিককার ওঠানামা—শুধু এইটুকুই সাহেব মিত্তির দেখতে পাচ্ছিল। গয়নার দোকানে ক্যালেণ্ডারে এমন মেয়েমানুষের ছবি থাকে', 'এর আগে কোন মেয়ে-মানুষকে এত সহজ—এত কঠিন লাগেনি' কিন্তু সাহেবের উক্তি ছাড়া ('নিষ্ঠুর,

স্থির, নিখুঁত লাগত বুলুকে,' কিংবা তার মনে হত, 'লম্বা চোয়ালের এই মেয়ে-মানুষটি' তার মুখোমুখি 'নিশ্ছিদ্র লোহার দরজা তুলে দিয়েছে') পারস্পরিক সম্বন্ধের সমস্যায় বুলুর কঠিনতা পাই না, তেমনি কিভাবে এই কাঠিন্য ভাঙ্গে তারও কোনও চিত্র নয়, একদিন বুলুকে অনিবার্যভাবেই সাহেব মিত্তিরের কাছে ধরা দিতে হয়, 'সেই শান্ত মুখের ওপরে ঠোঁট খুঁজে নিয়ে সাহেব শেষ হয় না এইভাবে নিজের ঠোঁট অনেকক্ষণ চেপে রাখল,' 'হয়েছে, । এবার তো শান্তি' বুলু একথা বলার পর—'সাহেব ঘাসের ওপর আধো বসা অবস্থায় বুঝতে পারল না, বুলু চটে গেল—না, মেয়েলোক যেমন করে—ইণ্টারভ্যালের জন্যে সময় দিয়ে রঙ্গ করে উঠে গেল,' বুলু উঠে যাবার পরে সাহেব ভাবে, 'চুমোটুমো না খেলে তেমন জুৎ হয় না'। কুবের মেদনমল্লর দ্বীপ থেকে ফিরে আসার পর বুলুর দুকাঁধ ধরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে—'আমার দিকে তাকাও আমার শুধু একটা কথাই তুমি জানো না। অনেকবার বলতে চেয়েছি বলা হয়নি,' তখন—'বুলু টের পেল সায়ার দড়ির নীচে নাইকুণ্ডলী থেকে শিষ তুলে তার মাথা অবধি এক চুমুকে কে ফাঁকা করে দিল। কুবের তার কোনটুকু-কোন জায়গাটুকু জানতে চায়। আমি আগাগোড়াই তোমার—সাহেব মিত্তির একটা অজানা লোক ঠিকই—এবং কিন্তু তাকে ভালোই লাগে। কত একাগ্র—শুধু কাছে থাকতে চায়'—স্বামী তার 'দখলদার', এই বোধ আর অন্যদিকে একাগ্র সাহেব মিত্তিরকে ভালো লাগা—বুলুর এই দ্বৈততাও নারীপুরুষের সম্বন্ধের সমস্যা বিশ্লেষণের সূত্রে আসে না বলেই তাকে ব্যক্তিস্বরূপের কোনও গভীর যন্ত্রণাময় ব্যাপার মনে হয় না (হয়ত তা লেখকের অভিপ্রেতও নয়), মনে হয় বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের অনুভবের চিত্রও শব্দসর্বস্ব একটা প্যাটার্ন যা একান্তভাবেই এই অংশেই সীমাবদ্ধ নিশ্চল, স্থাণু। বুলুর মত এই উপন্যাসের অন্যান্য মূল চিন্তাভাবনাগুলোও নিতান্ত স্থানিক, কয়েকটি স্থিরচিত্রে বা নকশায় গণ্ডিবদ্ধ, তারা শুধুই পুনরাবৃত্ত হয়েছে. বিকাশের দ্বন্দ্বময় জটিল অথচ সজীব স্রোতে উপন্যাসে প্রত্যাশিত জীবনের কোনও তাৎপর্যপুর্ণ অভিজ্ঞতার সন্ধান দেয় নি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ঘুণপোকা'য়ও আত্মগত চিন্তাভাবনার মুহূর্ত-আশ্রয়ী উৎক্ষেপ, চিত্রকল্পের পুনরাবৃত্তি, শব্দ বা চিত্রের ব্যঞ্জনা, কবিতার মত পংক্তি-বিন্যাস ইত্যাদির সমবায়ে একটি নিপুণ নকশা গড়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসটির সমস্ত কিছুই এসেছে নায়কের আত্মগত চিন্তার বিন্যাসে, স্বভাবতই লেখক কবিতার বুনন ব্যবহারের সুযোগ নিয়েছেন। 'ঘুণপোকার' নায়ক শ্যাম অবিশ্যি প্রথম

থেকেই কুবেরের মত ব্যাধির নিয়তিতে পঙ্গু নয়। শ্যাম একটি ফার্মের উচ্চপদস্থ অফিসার ছিল চাকরি তাকে 'উচ্চাশা সম্পন্ন' করে তুলেছিল, 'সে বাজার ঘুরে ফ্রিজিডেয়ার রেডিওগ্রাম এবং পুরোনো ছোট্ট মোটর গাড়ির দাম জানবার চেষ্টা করেছে, বড়লোকদের নিরিবিলি পাড়ায় দুই বা তিন ঘরের ছিমছাম একটা ফ্ল্যাটের সন্ধানেও ছিল সে, এবং—'সে খুব ভাবপ্রবণ ছিল না কোনোদিন, গভীর চিন্তাও তার অপছন্দ ছিল হুল্লোড় ছাড়া বাঁচা যায় না এমন বিশ্বাসই সে এতকাল পুষে এসেছে।' শ্যাম বড় বড় বার রেঁস্তোরায় অবসর বিনোদনে মেয়েদের নিয়ে লাম্পট্যে অভ্যস্ত, সে তার ওপরওয়ালা হরি মজুমদারের মার্কামারা গালাগালগুলো তার নীচুস্তরের কর্মচারীদের 'একই ভঙ্গীতে এবং স্বরে উপহার দিয়েছে।' তার ড্রইংয়ে একটা ভুল থাকার জন্য হরি মজুমদার জনান্তিকে তার উদ্দেশ্যে বলেছিল—বাসটার্ড। তারপর বাপ মা তোলা এই গালাগাল শ্যামকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলে তার মধ্যে ক্ষয় ধরাতে শুরু করল। তার ক্লান্তি বেড়ে চলে, অবসর সময়ে ভয়ঙ্কর অবসাদ আর মাথাধরা নিয়ে ঘরে শুয়ে থাকে, কেবলই আয়নায় মুখ দেখে। অবশেষে সে মরীয়া হয়ে চাকরি ছেড়ে দিল।

লেখক শ্যামের জীবনের এই মুখবন্ধের মত তার পরের সমস্ত অংশগুলোয়ও তাকে ক্ষয়ের অনুভূতিতে ও চিত্রে নির্দিষ্ট ও আবদ্ধ করে রাখেন। ক্লান্তি ও মাথা ধরা, আয়নায় মুখদেখা প্যাটার্নের একটি অংশ হিসেবেই পুনরাবৃত্ত হয়। ইঞ্জিনীয়ারিং ডিজাইনের ফার্মগুলোতে হরি মজুমদারের ফার্মের খ্যাতি এমন 'নালী ঘায়ের মতো' ছড়িয়ে গেছে যে সে বুঝল, তার চাকরি পাওয়া সহজ হবে না। এই প্রসঙ্গের পরই আপতিক অসংলগ্নতায়ই তার আত্মহত্যার এক শৌখীন চেষ্টার চিত্র পাই: 'আর একদিন সে হাত-আয়নাটা মুখের সামনে ধরে জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে ডান হাতে চকচকে একটা সুন্দর ব্লেড কণ্ঠনালীর ওপর রাখল। সামান্য একটু চাপ দিল। বড় আরাম! কিছুক্ষণ পর সরু রক্তের কয়েকটা রেখা তার গেঞ্জীর ওপর নেমে বুক ভাসিয়ে দিল। ব্লেডটা ছুঁড়ে ফেলে সে হেসে আপন মনে বলল, ধ্যুৎ, বড্ড নাটুকে। তারপর তোয়ালে দিয়ে গলা মুছে ডেটল লাগাল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, রাস্তায় জীবন্ত মানুষজন চলাফেরা করছে। ক্ষতের ওপর ভেজা তুলো চেপে সে চোখ বুজল। আঃ! বড় আরাম।' —'বড় আরাম' শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তিতেই এই চেষ্টার হাস্যকর তুচ্ছতা আভাসিত, অন্যদিকে শ্যামের জীবনে 'রাস্তায় জীবন্ত মানুষজন চলাফেরা' দেখারও কোনও তাৎপর্য ফোটে না। পুরো ছবিটাই আসে বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের

অসংলগ্নতায়। শীতের রাত্রিতে পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে শ্যাম সিগারেট ধরায়: 'পায়ের স্যাণ্ডেল ঘাসের শিশিরে ভিজে গেছে, পা বেয়ে শির শির করে উঠে আসছে শীত, কুয়াশায় দমচাপা ভাব আর কাঠ কিংবা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ। শ্যাম নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে, ঘড়ির দিকে তাকায় না, তার মন গুন গুন করে ওঠে—উদাসীন, বড় উদাসীন দেখায় তোমাকে শ্যাম', কিংবা প্রেমিকা ইতু তার কাছে আসার পরও তার সম্পূর্ণ উত্তেজনাহীন শরীরে গভীর আলস্য, বাথরুমে ঢুকে শূন্য চোখে শাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা, বন্ধুর সঙ্গে চলার সময় নিজের ভেতর এক অদ্ভুত শীতলতা অনুভব—এই সমস্ত অংশে ইচ্ছাহীন, স্পষ্ট প্রয়োজন-বোধহীন শ্যামের অনিচ্ছা ও ক্লান্তির কতকগুলো চিত্র বা বর্ণনাই শুধু পাই, লেখক ইয়োরোপীয় অস্তিত্ববাদী লেখকদের রচনায় অবক্ষয় ও অনীহার যে যন্ত্রণাময় তীক্ষ্ণ রূপ দেখা যায়, নিজের কাব্যিক মেজাজে তাকে পরিহার করে তাদের মধ্য দিয়ে আপাত সুন্দর নকশাই বুনতে চেয়েছেন।

যে যুবকের বাবা মা আছেন পূর্ববঙ্গে, যেখানে এবং যাঁদের মধ্যে তাঁর জীবনের কিছু শেকড় এখনও কলকাতার নাগরিক অস্তিত্বেও বর্তমান সেই শ্যামকে বাস্টার্ড গালাগাল খেতে হল, এই সূত্রে সমাজপটে ব্যক্তির আইডেনটিটির সংকট ও গভীর আত্মানুসন্ধান একটি মধ্যবিত্ত তরুণের অস্তিত্বের যন্ত্রণা চিত্রণের উপন্যাসগত কী সম্ভাবনাই না ছিল! আমাদের অর্দ্ধ-ঔপনিবেশিক জীবনে ইংরেজদের পরিত্যক্ত অনেক উচ্ছিষ্টই ত আমরা সাদরে মাথায় তুলে রেখেছি। বাসটার্ড শব্দটি ত তারই একটি অংশ, উচ্চ মধ্যবিত্ত ইঙ্গবঙ্গ সমাজের এদেশীয় অফিসারদের বহুল ব্যবহৃত প্রিয় শব্দ—মজুমদার সাহেবের ঐ গালাগালটি ঐ সমাজের ঈথস বা মানসিকতার প্রতীকরূপেই প্রবল আঘাতে শ্যামকে তার সেইণ্ট অ্যাণ্ড মিলারের ছোট সাহেবের জীবন থেকে উৎপাটিত করে আত্ম-অন্বেষণের প্রবল যন্ত্রণায় ও সমস্যায় টেনে আনতে পারত, তার অসহায় আত্মক্ষয় ও দহনই হয়ে উঠতে পারত জীবনের বানিজ্যিক সাফল্য ও সার্থকতা বিষয়ে ব্যক্তির গভীর প্রশ্ন ও প্রতিবাদ, সেই সূত্রেই ব্যক্তিস্বরূপের প্রাণবন্ত যাথার্থ্যে শ্যাম হয়ে উঠত একাধারে একটি সবল চরিত্র ও একালের সংশয় দ্বন্দ্ব বেদনার প্রতীক। শুধু শিল্পের নিপুণ নকশার উপকরণে পর্যবসিত হত না। ভাবতে অবাক লাগে শীর্ষেন্দুর মত শক্তিশালী লেখকেরও চোখ এদিকে পড়ে না, সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধের সমস্যা সম্পর্কে অনীহা এক ধরনের ভাবালুতাপুর্ন অস্তিত্ববাদ [যা কিছুটা পরিমানে শৌখিন লাগে] এবং মেজাজ ও আঙ্গিক

উভয়দিক থেকেই অতিমাত্রায় কবিত্বের প্রতি ঝোঁকের চোরাবালিতেই তিনি পা দেন।

তাই 'ঘুণপোকা'র নায়কের মানসিকতার কোন ছবিই আমাদের কাছে কোনও গভীর জীবনাভিজ্ঞার তাৎপর্য বহন করে আনে না। পূর্ববঙ্গে ভিটের মায়ায় আবদ্ধ তার বাবার চিঠি পাবার পর নিজের অস্তিত্বের শূন্যতায় ক্লিষ্ট শ্যামের মনে হয়ঃ 'এখন, এই যে লোকটা তাকে চিঠি লেখে, তার ভালমন্দের খবর নেয় —এ লোকটা কে! বাবা? কি রকম বাবা! তার মুখ মনে পড়ে না, ভিনদেশী এক অচেনা লোক, ভিটের মায়া ছেড়ে আসতে পারেনি—এ লোকটার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?' তার বাক্সে বাবা-মার একটা ফটো ছিল, আগে সে মায়ের জন্য কাঁদত, পরীক্ষা দিতে যাওয়ায় আগে কিংবা নতুন চাকরিতে যাওয়ার সময় ঐ ছবিতে প্রণাম করে যেত, তারপর আস্তে আস্তে 'কর্পূরের গন্ধের মতো মন থেকে মুছে গেছে ঐ দুটি মুখ', শুধু 'মাঝে মাঝে হরিধ্বনি দিয়ে যখন মড়া নিয়ে যায়, তখন চমকে উঠে মনে পড়ে কুয়োতলা, ঘাটে যাওয়ার মেঠো পথ, করমচার গাছ, পগারে লাফিয়ে পড়ছে ব্যাঙ; মনে পড়ে প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে উত্তরের ঘরের দাওয়ায় ছোট্ট একটু হ্যারিকেনের আলো কোলে করে মা বসে আছে— মুখের চামড়ায় নেমেছে শিকড়-বাকড়, কথা বলতে মাথা কাঁপে - সামনের অন্ধকার, এক আকাশ অস্পষ্ট নক্ষত্র, আর রক্তের মধ্যে অতি দুর্বোধ্য মৃত্যুর হিম অনুভব করতে করতে অসহায় মা বীজমন্ত্র ভুলে গিয়ে বিড় বিড় করে বলে চলেছে মনু, মনুরে, অ মনু, মনু, মনুরে, অ মনু'···এই অংশটিকে গদ্যের অনুচ্ছেদের বদলে অতি সহজেই কবিতায় পংক্তি হিসেবে সাজিয়ে দেওয়া যায়, মৃত্যুর অনুষঙ্গে মায়ের এই চিত্রের বিষাদজড়িত কাব্য সৌন্দর্য নিছক নান্দনিক মুগ্ধতার বিষয়ে সীমিত না থেকে আমাদের হৃদয়সংবেদ্য হয়ে ওঠে, তবু শেষ পর্যন্ত এই চিত্রটিকেও বিচ্ছিন্ন লাগে; কারণ এই স্মৃতি আসে না শ্যামের সত্তার কোনও যন্ত্রণাময় আলোড়নে, নিজেকে খুঁজে পাবার মর্মান্তিক প্রয়াসে। স্মৃতির শেষ অংশে, মায়ের চিত্রে যে গাঢ়, গভীর ব্যঞ্জনা পাই, ঠিক তার পরেই শ্যামের এই চিন্তার সঙ্গে তার সঙ্গতি থাকে না—মনে মনে শ্যাম প্রশ্ন করে তুমি আমার কে? তোমরা কারা? না, আমি তোমাদের চিনি না।' ঐ অংশে আমরা যেন লেখকের কল্পনা ও উপলব্ধির, গভীর কবিত্বের একটি মুহূর্তকেই পাই, উপন্যাসের চরিত্রের জীবনাভিজ্ঞতাকে নয়। আমি তোমাদের চিনি না এই প্রশ্নের ঠিক পরমুহূর্তেই 'তারপর চমকে ওঠে সে, অস্থির হয়ে আবার বিড়বিড় করে বলে তোমরা ভাল থেকো।

বেঁচে থেকো। আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি ভাল আছি। আমি খুব ভাল আছি। দেখো একদিন খুব সুসময় এসে যাবে। ভাল জমিতে আমরা তুলবো ঘরবাড়ি, তৈরি করবো বাগান, মাছ ছেড়ে দেবো পুকুরে, ছাড়া জমিতে বসিয়ে দেব জ্ঞাতিদের ঘর, এক-আধজন বোষ্টম, আর ধোপা নাপিত। দূর বিদেশ থেকে আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসবো, আমি নৌকা বোঝাই করে নিয়ে আসবো সুদিন'... এই স্বপ্নও শ্যামের সত্তার গভীর দ্বন্দ্ব বিক্ষোভের আলোড়নে জীবনের পরতে পরতে বিস্তৃত কোন মৌল টান হিসেবে নয়, তার চমকে ওঠা মুহূর্তের ছবি হিসেবেই বিচ্ছিন্নভাবেই আসে।

শ্যামের ছিন্নমূল অস্তিত্বের চিত্রণে মোটর সাইকেলের দুর্ঘটনার চিত্রটি এই উপন্যাসের অন্যতম মূল স্ট্রাক্চারাল ইউনিট। কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যরূপে বারবার এসেছে। একদিন সে সকাল বেলায় তার জানলা থেকে আয়না দিয়ে নানা জায়গায় আলো ফেলতে থাকে, কিছুক্ষণ পর ক্লান্তি লাগায় 'আয়নাটা রেখে দেওয়ার জন্য ঘরের ভিতরে চলে আসছিল শ্যাম,' এমন সময় ডানদিকের মোড়ের ওপাশ থেকে মোটর সাইকেলের আওয়াজ হতেই তার হাত পায়ের পেশী শক্ত হয়ে ওঠেঃ 'অনেকদিন ধরে সেই কবে থেকে যেন মোটর সাইক্লিষ্টদের ওপর একটা পোষা রাগ আছে তার' তখন বড় রাস্তার ওপর একটি গরু আস্তে আস্তে রাস্তা পার হচ্ছিল, মোড় থেকে মোটর সাইকেলের মুখ আর লোকটার কালো মাথা দেখা যেতেই ঠিক তার মুখের ওপর শ্যামের আয়নার আলো ঠিকরে পড়লঃ 'ঝড়ের মত শব্দ তুলে বাঁক নিচ্ছিল মোটর সাইকেল, শ্যাম এক পলকের জন্য দেখল লোকটা তার আলো থেকে মাথা সরিয়ে নিতে গিয়ে কাত হল। তারপর আর কিছু দেখার ছিল না, শুধু গরুটার ভয়ঙ্কর লাফিয়ে ওঠা ছাড়া। তড়িৎ গতিতে শ্যাম মেঝেতে বসে পড়ল; শুনতে পেল রাস্তার ওপর মোটর সাইকেলটার আছড়ে পড়ার ধাতব কঠিন শব্দ। সে হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল' (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। এই পরিচ্ছেদের শেষে দেখি, শ্যামের কাছে তার সারা দিনের আচরণ দুর্বোধ্য লাগেঃ 'সারা রাস্তায় সে কিছুতেই ভেবে পেল না, কেন সে ওই মাঠের মধ্যে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল! কেন সে বাসের ভাড়া দেয়নি! কেন সে খুচরো ছিটিয়ে দিয়েছিল রাস্তায়! কেন সে আয়নায় আলো ফেলেছিল একজন মোটর সাইক্লিষ্টের মুখে।' পরের দিন সকালে শ্যাম খবরের কাগজে কোনো মোটর সাইক্লিষ্টের মৃত্যুর খবর না পেয়ে নিজের মনকে প্রবোধ দেয়। তারপর বারবার সে তার মাথার ভেতরে মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনতে পায়, 'হঠাৎ তার

মাথার ভিতরে আস্তে জেগে ওঠে ভ্রমরের শব্দের মতো মোটর সাইকেলের আওয়াজ' (পৃঃ ৮৮), 'তার মাথার ভিতরে অমনি বগরী পাখীর মতো গুর গুর করে ভেসে উঠল একটি প্রায়-ভুলে-যাওয়া মোটর সাইকেলের আওয়াজ। মৃত্যুকূপে সেই খেলার মতো ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে আবার নীচে নেমে যেতে লাগল।' কিছুদিন পর খবরের কাগজে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ শ্যাম দেখতে পায়, তার নাম গৌর ভৌমিক, দু'বছর আগে তার বিয়ে হয়েছিল, তার একটি শিশু কন্যা আছে, বাবা মা তিন ভাইবোনও, রেডিওতে গান গাইত, তার দুটি রেকর্ডও আছে। শ্যাম টেরও পায়নি, এত সম্পর্কের মধ্যে বাঁধা ছিল লোকটা 'সে শুধু দেখছিল একটা মোটর সাইকেলের কালো ভোঁতা মুখ, আর অচেনা একটা মানুষের ছুটন্ত শরীর। কে জানত যে লোকটার অত পরিচয় আছে!' তবে এই সেই লোক কিনা শ্যাম জানে না, যদি এই সেই লোক হয় তবে সে এ জন্মের মত বেঁচে গেল, অকারণে আলো ফেলার জন্যে তাকে আর কেউ দায়ী করতে পারবে না, সমস্ত প্রমান লোপ পেল।

তবু শ্যাম তার দায় থেকে মুক্তি পায় না, সে ভাবতে থাকে : 'তুমি ছেলে ছিলে, তুমি স্বামী ছিলে, তুমি ছিলে বাবা। তুমি এত কিছু ছিলে কেউ জানতোই না। আবার দেখ, তুমিই উড়ন্ত মোটর সাইকেলে ছুটে যাওয়া এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। তুমি পৃথিবীর কেউ না। গৌর ভৌমিক, আমার ওপরওয়ালা বাসটার্ড বলে গাল না দিলে আমি কি চাকরি ছাড়তুম? চাকরি না ছাড়লে আমি কি খেলার ছলে তোমার মুখে ফেলতুম আয়নার আলো? দেখ, এ সব কিছুই একটি রহস্যময় কার্যকারণসূত্রে বাঁধা। তুমি কাকে দায়ী করবে? এই দু'হাত শূন্যে তুলে ধরে বলছি—আমি দায়ী নই। আবার দেখ মাথা নিচু করে আমিই স্বীকার করছি—আমি দায়ী। তুমি কাকে দায়ী করবে? মাঝে মাঝে রাতে ঘুমের ঘোরে আমি ডাক দিয়ে উঠি—শ্যাম! আবার নিজেই উত্তর দিই—যাই। নিজের সঙ্গে সব বোঝাপড়া আমার শেষ হয়নি।' এবং—'অনেকক্ষণ ধীরে ধীরে হেঁটে বিচিত্র সব রাস্তার ভিতর দিয়ে চলে গেল শ্যাম। কখনো মাথার ভিতরে, কখনো বুকের ভিতরে ভ্রমরের গুণগুণ শব্দের মতো গভীর থেকে গভীরে চলে গেল একটি মোটর সাইকেলের শব্দ। মাঝে মাঝে চমকে উঠল শ্যাম। নিজেকে ডেকে বলল—তুমিও…তুমিও উড়ন্ত মোটর-সাইকেলে ছুটে যাওয়া এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। তুমি পৃথিবীর কেউ না তা নয়, শ্যাম জানে। সে শ্যাম চক্রবর্তী, বাবা কমলাক্ষ চক্রবর্তী, বিক্রমপুরের বানিখাড়া গ্রামে তার দেশ, সে ছিল

সেইণ্ট অ্যাণ্ড মিলারের ছোটো সাহেব। এ সব কিছুর মধ্যে সে বাধা আছে। অথচ সে জানে না সে কে! কিংবা সে কি রকম!—এই সমস্ত অংশের কাব্যিক, পেলব ভাষার বিন্যাসে শ্যামের অস্তিত্বের লক্ষ্যহীন অনিশ্চয়তা তীক্ষ্ণ রূপ পায় না, কোনও কোনও সার্থক ইয়োরোপীয় অস্তিত্ববাদী উপন্যাসে এই জাতীয় চিত্রে, তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ সক্রিয়তাজনিত ট্র্যাজিক বিড়ম্বনার তীব্রতায় একটি বিশেষ জীবনবীক্ষণের সঙ্গে ইয়োরোপীয় সমাজসভ্যতার অবক্ষয়ের প্রচণ্ড চাপকে অনুভব করি, এখানে কিন্তু তা কোনও সময়েই অনুভূত হয় না, মোটর সাইকেল দুর্ঘটনার চিত্র শ্যামের আইডেনটিটি সংকটের অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে না, কয়েকটী ভাবালুতাময় মুহূর্তের বর্ণময় নকশা হয়েই থাকে।

একটি সাহেবী কোম্পানীর লেডি রিসেপশনিষ্ট লীলা ও তৎসম্পর্কিত শ্যামের আবেগ অনুভূতির চিত্রও ঘুনপোকার আর একটি মূল সাংগঠনিক ছক। শ্যামের বন্ধু অরুণ, এক কোম্পানীর অফিসার, তার সঙ্গে সাহেবি অফিসে গিয়ে রিসেপশনিষ্ট সুন্দরী লীলাকে দেখতে পায়। যে শ্যাম ক্রমাগত শীতল হয়ে যাচ্ছিল, এই মেয়ের সান্নিধ্যে তারই মধ্যে এক আশ্চর্য উষ্ণ অনুভূতি ছড়িয়ে দেয় : 'বস্তুত: তার মনে হয় এই যে লোকটা সে—এণ্ডির চাদর গায়ে, গালে দাড়ি, ভিতরে অস্থির এক রেল গাড়ির পুল পেরিয়ে যাওয়ার গুম্ গুম্ শব্দ—একে কোনো কালে কখনো চিনত না শ্যাম।' অরুণের কাছে শ্যামের স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, সে এতকাল যখন বৃন্দা মাধবী কিংবা ইতুর সঙ্গে ঘুরেছে, এক বিছানায় শুয়েছে, তখন আগাপাশতলা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে কোনও রহস্য, লাভবান হওয়ার মত কিছু, বুকের মত এমন রেলগাড়ির শব্দ কখনও পায়নি। সে এখন বুঝতে পারে, এতকাল সবাই তাকে ঠকিয়ে এসেছে। শ্যাম তার এই নতুন অনুভূতির আস্বাদ পাবার জন্য লীলাকে তার অফিসে, রাস্তায়, বারে সর্বত্র অনুসরণ করে, তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তার সান্নিধ্যেই পায় বুকের মধ্যে রেলগাড়ির স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আর পুল পেরিয়ে যাওয়ার শব্দ; বৃষ্টিপাত আর চারিদিকে অসংখ্য ধাবমান হরিণের পায়ের শব্দ। শ্যামের বেঁচে থাকার এই রহস্যময় অনুভূতির চিত্রকল্প লেখক তাঁর ন্যারেটিভে বহুবার বুনে দিয়েছেন। যেমন, 'সে বড় বেঁচে আছে। বুকে হাত রাখে শ্যাম। একটি রহস্যময় রেলগাড়ি বহুদূরের এক অচেনা পুল পেরিয়ে যাচ্ছে (পৃঃ ৯৯), 'আর কেবলই রেল গাড়ির শব্দ, হরিণের খুরের আওয়াজ, নিঃশব্দ এক বৃষ্টিপাতে ভরে আসে বুক, শরীরের ভিতরে ধীর গম্ভীর মেঘ ডেকে ওঠে' (পৃঃ ১০৬), অরুণের মুখে লীলার নাম শুনেই—

'হঠাৎ আবার শ্যামের বুকের মধ্যে গুর গুর করে মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে ওঠে বিদ্যুৎ। হরিণ দৌড়োয়। আর কালো একটা রেলগাড়ি লম্বা একটা রেলপুল পেরিয়ে যেতে থাকে' (পৃঃ ১২৯), লীলার অফিস ঘরের কাঁচের দরজাটার মুখোমুখি জরতপ্ত দেহে দাঁড়িয়ে 'চারদিকে ছায়ার মতো অলীক লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। কেউ টেরও পাচ্ছে না তাদের চেনা এই চতুর্দিক, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ভেদ করে একে একে হেঁটে আসছে মায়াবী হরিণেরা। তাদের মৃদু খুরের শব্দ বেজে যাচ্ছে। আর মেঘ ডেকে উঠছে শরীরের ভিতরে, বৃষ্টি নামছে, সেই বৃষ্টির জলের মতো ভালবাসায় টলটল করে ভরে আসছে বুক, বহুদূরে অচেনা এক রেল পুল পেরিয়ে যাচ্ছে কালো একটা রেলগাড়ি' (পৃঃ ১৩৬)। যদিচ শ্যামকে দেখে লীলার মুখ অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে, তাকে যে ভাবে বিভিন্ন পুরুষ সঙ্গী বা বন্ধুর সঙ্গে দেখা যায়, তাতে তাকে ইতু-মাধবী-বৃন্দার তুলনায় স্বতন্ত্র মনে হওয়ার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই, তবু তাকে ঘিরেই জীবনের রহস্যকে, ভালোবাসার স্বাদকে সে অনুভব করে, এ যেন তার আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন (তাই কি সে অরুণকে বলেছে, 'কে যেন বলেছিল, ঈশ্বরজ্ঞান না হলে মেয়েদের ঠিকমতো চেনা যায় না') এবং লীলা তার প্রতিমা। শরীরে জর নিয়ে শ্যাম যখন লীলার অফিসের কাঁচের দরজায় মুখোমুখি তার চেনা থামটায় হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, তখন লীলার সঙ্গী, লম্বা কালো চেহারার একটা লোক যার মুখ অত্যন্ত নিষ্ঠুর, দয়াহীন, নিঃসন্দেহে লীলারই প্ররোচনায় তার লোহার পাঞ্চ পরা ডান হাত দিয়ে বার বার তাকে ঘুষি মারতে লাগল, তার মুখ থেকে গালাগাল শুনতে পেল শূয়োরের বাচ্চা, বেজন্মা—আর তখনই শ্যাম তার আইডেনটিটিতে অনুভব করে, 'না। মাথা নাড়ে শ্যাম। আমি শ্যাম চক্রবর্তী, কমলাক্ষ চক্রবর্তী আমার বাবা, বিক্রমপুরে বানিখাড়া গ্রামে আমার দেশ..' সে দেখতে পায়, 'প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে দাওয়ায় ছোট্ট একটু হ্যারিকেনের আলো করে বসে মা হঠাৎ বীজমন্ত্র ভুলে গিয়ে মৃদুস্বরে ডাকছে— মনু...মনুরে, অ মনু.. মনু।' মাটিতে তার শরীরে লুটিয়ে পড়ছিল, অচেনা অলীক ছায়ার মত মানুষদের ভিড় করে সে কাচের দরজাটা দেখতে পায়, লীলা কাচের গায়ে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে পরনে শ্যামের প্রিয় বাসন্তীরঙের শাড়ি, 'শান্ত বিষণ্ণ তার চোখ সমস্ত শরীরে মা হওয়ার আগের নম্রতা ফুটে আছে'—'হঠাৎ আবার শ্যামের বুকের মধ্যে গুর গুর করে মেখ ডেকে ওঠে, চমকে ছুটতে থাকে হরিণের পাল..তারপর কেবল হরিণ আর হরিণ, সরল ও সুন্দর চোখের হরিণেরা ছুটে আসে দিগ্বিদিক জুড়ে..মেঘের দুপুরে অচেনা এক

রেলপুল পার হতে থাকে কালো রেলগাড়ি বৃষ্টির জলে ভরে ওটে বুক..' অবশেষে শ্যাম তার আইডেনটিটিকে খুঁজে পায়: 'অস্বচ্ছ চোখে ভিড়ের মধ্যে এক-আধটা চেনা মুখ খুঁজে বেড়ায় শ্যাম—আঃ সোনা কাকা! রাঙ্গাপিসি! মানুমামা! আমি মনু. আমি তোমাদের মনু..জন্ম নেওয়া বড় কষ্টকর, তবু তোমাদের জন্যই এই দেখ আমি আর একবার জন্ম নিচ্ছি..ভালবাসা যে কত কষ্টের তা জানে আমার মা তবু আমি সেই কষ্ট বুকে করে নিলুম..শীগগীরই আমি সুসময় নিয়ে আসছি পৃথিবীতে..অপেক্ষা করো..বড় মায়ায়, বড় ভালবাসায় ধুলোমাটির মধ্যে মুখ গুঁজে দেয় শ্যাম (এইখানেই উপন্যাসের শেষ)। এখানেও আমাদের মনে হয়, লেখক আত্মগত অনুভূতির কতকগুলো কাব্যিক মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন কিন্তু উপন্যাসে কি শুধু কয়েকটি চিত্রকল্পের নকশায়ই চরিত্রের কোনও উপলব্ধির রূপ রচনা করা যায়? বাস্তবজীবনের সাধারণ্যেই উপন্যাসের চরিত্রের অভিজ্ঞতা প্রাণ পায়, তখনই তা হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থে অসাধারণ, নতুন আলোয় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেরই আশ্চর্য আবিষ্কার, ব্যক্তিস্বরূপের রক্তাভায় উজ্জ্বল। শ্যামের আত্মোপলব্ধিকে এসোটেরিক মনে হয়, তার চিত্রকল্পগুলোকে মনে হয় ফুলদানীর স্থির নিশ্চল সযত্নরচিত পুষ্প স্তবক, তাতে আমাদের এই কঠিন সময়ের অভিঘাতে আলোড়িত বাস্তবজীবনাভিজ্ঞতার রক্ত ও লবণাক্ত অশ্রুর কোনও সজীব, উষ্ণ স্পর্শ মেলে না।

জয়েস ধারাবাহিক কালক্রম, যাকে সমালোচনার পরিভাষায় বলা হয় chronological time তার অনুসারী ন্যারেটিভের প্রচলিত ছক ভাঙলেও উপন্যাসের নানাভাবে নানারূপে জীবনের সমগ্রতার সন্ধানের নিজস্ব ধর্মকে উপেক্ষা করেন নি; তিনি তাঁর কালের অস্তিত্বের সমস্যাকে ধরতে চেয়েছেন সমগ্রতার আর এক বিন্যাসে। জয়েসের নিজের শহর ডাবলিন, তাঁর দেশ, ইয়োরোপ—বৃহত্তর দেশ-কালের পটধৃত ঐতিহাসিক বস্তবতায় তাদের সত্তার মূল ছড়িয়ে থাকে বলেই ষ্টীফেন ও ব্লুম বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রের রূপ পায় তার অভিজ্ঞান হিসেবেই তাদের আন্তর্মনন ও তার চিত্রগুলো অর্থগভীর হয়ে ওঠে। আধুনিক কালের উপন্যাস যতই কবিতার আঙ্গিককে আত্মসাৎ করুক বা অস্তিত্ববাদের দ্বারা প্রভাবিত হোক, ব্যক্তিগত যে কোনও ঝোঁকে ঐতিহাসিক বাস্তবতার জমিকে উপেক্ষা করে শূন্যে উধাও হতে গেলে তা শেষ পর্যন্ত নিছক শিল্পকলার কসরতে পরিণত হতে বাধ্য। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের বিস্তারের সাবেকি চাল অথবা কবিতার বিন্যাসের সংহতি ও তীব্রতা যে দিকেই আকৃষ্ট হন না কেন, তাকে তাঁর সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

তাকে বোঝার ও আয়ত্ত করার কঠিন চেষ্টায়ই তাঁর শিল্পকর্মকে বাঁধতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোনও বিন্যাসেই তাঁর কালের পরিপ্রেক্ষিতকে আভাসিত করে অস্তিত্বের সমস্যাকে রূপ দিতে হয়। তাই সেকাল ও একালের প্রতিটি সার্থক উপন্যাসেই পাই শিল্পীর সময়ের সমাজসভ্যতা সম্বন্ধে গভীর প্রশ্ন, সমালোচনা; জীবনের পুরুষার্থের যন্ত্রণাজর্জরিত অন্বেষণ। উপন্যাসের মত আর কোনও শিল্প মাধ্যমকে বোধ হয় সময়ের দায়দায়িত্ব এত বেশি বহন করতে হয় না। উপন্যাসের মধ্যেই আমরা অতীতের মত আমাদের সময়কেও জানতে, নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করতে চাই। ডিকেন্সের উপন্যাস ছাড়া ভিক্টোরিয়া যুগের জীবনের এমন অন্তর্দৃষ্টি গভীর ইতিহাস আর কোথায় মিলবে, আর কোথায় মিলবে তার এমন ক্ষুরধার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা যার জীবনের সত্যসন্ধানী প্রজ্ঞা দস্তয়েভস্কিকেও প্রভাবিত করে। একালের বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক রোনা বার্থেস সঙ্গত কারণেই ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষ্য করেন।

হাল আমলের বাঙলা উপন্যাস ইয়োরোপের অস্তিত্ববাদের দ্বারা সংক্রামিত। কিন্তু ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষে পার্থক্য অনেক : ইয়োরোপে সমাজসভ্যতার অবক্ষয় ও তৎসম্পর্কিত অস্তিত্বের সমস্যা তার বিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই এসেছে, আর এখনও আমাদের সমস্ত কিছুই অসম, প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং একালের যান্ত্রিক সভ্যতা যা এখানে নিতান্তই অপরিণত, অর্দ্ধবিকশিত তার এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। গ্রাম ও শহরের মর্মান্তিক ব্যবধানে; কলকাতার মত বিরাট শহরেরও শোচনীয় দুঃস্থতায় সেই ঔপনিবেশিক জীবনের দায়ভাগ আমাদের এখনও বইতে হচ্ছে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে দেশের মানুষ অর্দ্ধাহারে অনাহারে ব্যাধিতে বাঁচার নিম্নতম সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। সময়ের প্রতিটি স্তরে, পর্বে পর্বে আমাদের দুঃস্থতা ও মিথ্যাচার নানা চেহারায় প্রকট হচ্ছে, কিন্তু একালের উপন্যাসে তার ছাপ সে বিষয়ে প্রবল যন্ত্রণা-বোধ ও জিজ্ঞাসা বিশেষ মেলে না। দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের ব্যক্তির অস্তিত্বের সমস্যা-যন্ত্রণা যে তীব্রতায় চিত্রিত; একালের কোনও অস্তিত্ববাদজীবী উপন্যাস তার কাছাকাছি পৌঁছুতে পেরেছে কিনা সন্দেহ : এই রাশিয়ান ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-গত খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস ভিত্তিক জীবনদর্শন সম্বন্ধে আমাদের যতই সংশয় থাকুক, তাঁরা সময়ের পটভূমিতেই তাঁর জীবনচিত্রণ অর্থবহ তীক্ষ্ণতা পেয়েছে, টলস্টয়ের মহত্ত্ব তথা গভীর ইতিহাসবোধ তাঁর ছিল না; তবু তিনি যে অন্যান্য মহৎ রাশিয়ান লেখকদের মতই তাঁর কালের দেশ ও স্বদেশবাসীদের দুঃখকষ্ট যন্ত্রণার অংশীদার হয়েছিলেন,

তার ছাপ তাঁর উপন্যাসের সর্বত্র। বিমল করের 'দেওয়ালে' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত সমাজ-পরিবারের ভাঙ্গন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারোঘর এক উঠোনে'র শ্রেণীচ্যুত মধ্যবিত্তজীবনের অবক্ষয়ের তন্নিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ ও নির্মম, তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ কিংবা অসীম রায়ের 'গোপালদেবে'র প্রখর আত্মসচেতনতা হালের তরুণ লেখকদের শিল্প নৈপুণ্যের তুলনায় অনেক বেশি উপন্যাসের স্বধর্মনিষ্ঠ বলে মনে হয়। শীর্ষেন্দুর 'নীলুর দুঃখ' ছোটগল্পে বাস্তবজীবন বিষয়ে যে গভীর সংবেদ্যতার পরিচয় মেলে, উপন্যাসে কেন তা পাই না? ঐতিহাসিক বাস্তবতা-বোধের নৈর্ব্যক্তিকতায়ই উপন্যাসের আধারে আমাদের অস্তিত্বের সমস্যার চিত্রণ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, ঔপন্যাসিকের মাধ্যমের ওপর নিজের শিল্পকর্তৃত্ব হতে পারে গভীর ও পরিণত; প্রাতিস্বিকতায় দীপ্ত।
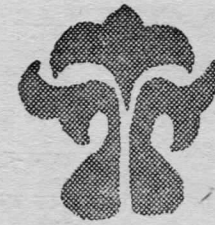
যে বাজে সঠিক স্বরে

হেনা হালদার

জীবনটা কারো কাছে হার্মোনিয়ম
কারো কাছে তবলা।
কেউ স্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেয় স্বর
কেউ চটাস চটাস চাঁটি মারে।
এবং কারো কাছে এই হার্মনিহীন গান
যেন সেই মণিহার
যা' কখনো সাজেনা গলায়,
যা' পরতে গেলে লাগে, কিন্তু ছিঁড়তে গেলেই
বাজে। অর্থাৎ বাজেনা সঠিক স্বরে।

সুরাসুর যুদ্ধ লেগেই থাকে।
হয়ত অমৃত ওঠে চকিতে ক্বচিৎ
তারপর বিষ। অথচ
যে বাজে সঠিক স্বরে, কথায়-কাজে
যার হয়ে যায় মিল। জীবনে ও জীবিকায়
বিভেদ থাকে না। বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গে আসে
অভিন্নতা। সে আর আজে-বাজে কিছুতেই
রস পায়না। সারসের মত অনায়াসে
চোরাবালি পার হয়ে যায়।

●

ভিত

মোহিত রঞ্জন লাহিড়ী

এক শীর্ণ কঞ্চিকে
অবলম্বন ক'রে
দাঁড়িয়ে রয়েছে
সুন্দর কেয়ারি লতাগাছ।
লোকে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ
তার ফুলের রঙে বিমোহিত
তার হেলান দেহটি
তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে
নৃত্যের ছন্দ
ইত্যাদি।
অথচ যখন ঐ
স্বল্পপ্রাণ মুমূর্ষু কঞ্চিটি
দুমড়ে মুচড়ে
মাটির উপর পড়ে যাবে
তখন এই মনমোহন লতাগাছটিকে
আর যাবে না দেখা
তাকে যাবে না চেনা।
সে মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে পড়বে
মাটির উপর
আর আগাছার বিকৃত ক্ষুধা
তাকে করবে গ্রাস
আর এই বিমোহিত মুগ্ধ দর্শকের দল
তখন তাকে যাবে মাড়িয়ে মাড়িয়ে।।

●

বিপ্লব ঃ আতঙ্কিত স্বপ্নের সন্ত্রাসে

সিদ্ধার্থ পাল

প্রত্যহই রাজপথে
আমার রক্তাক্ত দেহ
পড়ে থাকতে দেখি ঃ
রোমাঞ্চিত হই
প্রত্যহই।

বিপ্লব!

এখানে বিপ্লব এসে গেছে,
ছুরির তীক্ষ্ণতা আর জ্বলন্ত বারু.দ,
বল্গাহীন আবেগের উচ্ছ্রিত বুদবুদে,
শিরা-উপশিরা
লোহিত কণিকা বেয়ে
এখানে বিপ্লব এসে গেছে।

প্রত্যহই।
তাই
রাজপথে
আমার শোণাক্ত দেহ
পড়ে থাকতে দেখি ঃ
আতঙ্কিত স্বপ্নের সন্ত্রাসে ॥

অভিব্যক্তি

মিহির সেন

মেয়েটি একাই এসেছিল।

আমরা আমাদের অফিসে বসে পরের দিনের কাজ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কালকের আর্টিস্টদের ভেতর একজন দার্জিলিং এ অন্য একটি ছবির আউট-ডোরে গেছে। গতকাল ফেরার কথা ছিল। আজও ফেরেনি। কোন খবরও দেয়নি। যে কোন মুহূর্তে একটা টেলিগ্রামের জন্য অপেক্ষা করছি সবাই। ভদ্রলোক না এলে কালকের গোটা প্রোগ্রাম চেঞ্জ করতে হবে। এই সেট্‌টা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। একদিনের ভেতর রাতারাতি অন্য সেট্‌ তৈরী করা সম্ভব নয়। সুতরাং কি করনীয়? কালকের ডেট্‌টা কি বাতিল করে দেওয়া হবে, না, স্ক্রিপ্টটা একটু পরিবর্তন করে ঐ আর্টিস্টকে বাদ দিয়েই কাজটা সেরে নেওয়া সম্ভব?

স্ক্রিপ্ট সামনে রেখেই গভীরভাবে ভাবছিলাম আমরা সমস্যাটা নিয়ে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলোচনা করে একটা পথ বের করার চেষ্টা করছিলাম।

এমন সময় মেয়েটি সরাসরি ঘরে এসে ঢুকল। ঠিক চিনলাম না মেয়েটিকে। আগে দেখেছি বলেও মনে পড়ল না। প্রথমে ভেবেছিলাম অন্য কারো চেনা। কিন্তু আর সবার মুখ দেখেই বুঝলাম, তাদেরও চেনা নয়।

সাধারণত নতুন সুযোগপ্রার্থীরা স্টুডিওতে ঢুকলেই কিছুটা বিব্রত বোধ করে। চলায় বলায় জড়তা এসে যায়। কোন প্রোডাক্‌শনের অফিসে ঢুকতে হলে আরো সঙ্কুচিত হয়। অনুমতি ছাড়া ঢোকার সাহস পায় না।

কিন্তু মেয়েটি এমন অসঙ্কোচে সপ্রতিভ ভঙ্গীতে ভেতরে চলে এল, যেন কত দিনের অভ্যস্ত। আমরাই ডেকে পাঠিয়েছি, এসে আমাদের ধন্য করেছে।

ক্যামেরাম্যান দত্ত জিজ্ঞেস করল, কাকে চান?

মেয়েটি সবার উদ্দেশ্যে দুহাতে একটি নমস্কার জড়ো করে বলল, ডাইরেক্টারের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

মনে মনে আমরা বিরক্ত হচ্ছিলাম। একটা জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনা

হচ্ছিল বলেই। মেয়েটি আগে আমাদের অনুমতি চাইলে অবশ্যই তাকে পরে আসতে বলা হত।

ডাইরেক্টার মৈত্র গম্ভীর মুখেই বললেন, আমিই ডাইরেক্টার। বলুন কি বলবেন।

মেয়েটি কোন ভূমিকা না করেই সরাসরি বলল, আপনি এখন যে ছবিটা করছেন তাতে একটা সুযোগ চাই।

মৈত্র বললেন, কেউ পাঠিয়েছে আপনাকে আমার কাছে?

অর্থাৎ, জবাব বা ব্যবহারটা তার ওপর নির্ভর করবে।

মেয়েটি বলল, না। স্টুডিওতে এসে দেখলাম আপনার ছবির সুটিং হচ্ছে। সবে শুরু হয়েছে। তাই—

ভদ্রতার খাতিরে মেয়েটিকে বসতে বললাম।

মৈত্র জিজ্ঞেস করলেন, আগে কোন ছবিতে কাজ করেছেন?

মেয়েটি বলল, না, সুযোগ খুঁজছি। অনেককেই অনুরোধ করছি। এখনও সুযোগ পাইনি।

কিছুটা ব্যতিক্রম বলেই বোধহয় বেশ কৌতুক বোধ করছিলাম। অন্যরাও যে পরিস্থিতিটা উপভোগ করছে, মুখ দেখেই বুঝছিলাম তা।

আমাদের কথার ভেতরই প্রোডিউসার ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোক না বলে ছেলেটি বলাই ভাল, বয়সে যুবক। টাকা অবশ্য বাবারই, ছেলের বেনামীতে ছবিটা করা হচ্ছে। আমাদের এবং স্টুডিওর সবার চোখে এই ছেলেটিই তাই প্রোডিউসার। অবশ্য ছবির কাজ অতি উৎসাহে এ-ই দেখাশুনা করছে। ছেলেটি উৎসাহী এবং প্রাণবন্ত।

আমি সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, আসুন অলোকবাবু। বসুন।

অলোকবাবু চেয়ারে বসতে বসতে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন মেয়েটিকে। পূর্বাপর কিছু জানেন না, কিন্তু বুঝলেন, ছবি সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই এসেছেন মহিলা।

মৈত্র মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আগে কোনদিন অভিনয় করেছেন? ধরুন কোন স্টেজে-টেজে বা স্কুল কলেজের নাটকে?

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, না।

মৈত্র বললেন, ঠিক আছে, আপনার নাম ঠিকানাটা রেখে যান, দরকার হলে খবর দেব।

মেয়েটি বলল, আমার নাম সবিতা দত্ত। আমাকে খবর দেবার দরকার নেই, আমিই এসে মাঝে মাঝে খবর নেব'খন।

মৈত্র বললেন, কেন বলুন তো?

মেয়েটি একটু হেসে বলল, নাম ঠিকানা অনেকেই রাখেন তো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খবর কেউ দেন না। আপনাদের সেটাই বোধহয় রেওয়াজ। তাই—

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, আপনি তো এ-লাইনের অনেক কিছুই জেনে ফেলেছেন দেখছি। কতদিন হয় চেষ্টা করে যাচ্ছেন?

মেয়েটি বলল, বেশী দিন নয়, বছর খানেক।

অলোকবাবু এতক্ষণে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছেন। বেশ অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ নজরেই মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন ভদ্রলোক। জীবনের দুটি ক্ষেত্রে দেখেছি বেহায়ার মত দেখাটা নিন্দার বাইরে—বিয়ের পাত্রী আর সিনেমার শিল্পী নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

টের পেয়েই কিনা জানিনা, সবিতা বুকের আঁচলটা একটু টেনে দিল।

অলোকবাবু বললেন, দেখুন, আমি এ-ছবির প্রোডিউসার। আমি নিজেই আপনাকে কথা দিচ্ছি সম্ভব হলে এ-ছবিতে আপনাকে একটা চান্স দেবার চেষ্টা করব। তারপর টিঁকে থাকাটা আপনার এলেমের ওপর নির্ভর করবে। আপনার ঠিকানাটা বরং রেখেই যান। আমাদের অনেক সময় হঠাৎ-হঠাৎ দরকার হয়ে পড়ে।

সবিতা আমাদের অফিসের প্যাডে গোট-গোট অক্ষরে নিজের নাম ঠিকানা লিখে দিল। ঠিকানাটা শহরতলীর। মধ্যমগ্রামের।

প্যাডটা অলোকবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি বলল, আজ তাহলে চলি! আপনারা বোধহয় জরুরী কোন কাজ করছিলেন। ডিসটার্ব করে থাকলে মাপ করবেন।

মেয়েটি যেভাবে এসেছিল, সেই সপ্রতিভ ভঙ্গীতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরপর থেকে মেয়েটি মাঝেমাঝেই আমাদের স্টুডিও-অফিসে আসত। যখন সুটিং থাকত না তখন ধর্মতলার অফিসেও আসত। কখনও একা কখনও বা অলোক বাবুর সঙ্গে।

অলোকবাবুর অনুপস্থিতিতে অনেক সময় আমরা হাসাহাসি করতাম। মহিলা প্রসঙ্গে অলোকবাবু একটু অতি উৎসাহী। টাকা এবং বয়স—দুটোরই আনুকূল্য

থাকায় হয়তো। আমরা বলতাম, শিল্পী খুঁজে বের করাও কিন্তু একটা শিল্প কর্মই। এদিক দিয়ে মহিলা শিল্পী খোঁজার ক্ষেত্রে অলোকবাবু একজন নিখুঁত শিল্পী।

কিন্তু সবিতার দিক দিয়ে কথাটা ভাবলে আমি মনে মনে বিরক্ত হতাম। মেয়েটির ওপর কোন শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি বোধ করতাম না। ও যদি সরাসরি রোজ অফিসে আসত, করুণাপ্রার্থী হিসেবে পরিচালক বা আর কারো পায়ে পায়ে ঘুরত, এতটা বিরূপতা জাগত না ওর ওপর। কিন্তু পয়সাওয়ালা প্রোডিউসারের পায়ে পায়ে ঘোরাটাকে কেমন যে একটা স্থূল ব্যাপার বলে মনে হত আমার। অবশ্য এটাও ঠিক, সব পাখিই শক্ত ডালেই বাসা বাঁধতে চায়। জাত যদি খোয়াতেই হয়, বড় কোন নিশ্চয়তার হাতে খোয়ানোই ভাল!

অলোকবাবুও মাঝেমাঝে মনে করিয়ে দিতেন আমাদের, কই মশায়, সবিতার মত কিছু বেরুল? মেয়েটা যে মাথা খেয়ে ফেলল!

আমরা আড়ালে বললাম, হ্যাঁ, মেয়েটা যে মাথাটি খেয়েছে সেতো দেখতেই পাচ্ছি।

কিন্তু সামনা সামনি দুঃখপ্রকাশ করে বলতে হত, চেষ্টা করছি, মনেও আছে, কিন্তু সেরকম কোন চরিত্র আসছে না।

অলোকবাবু আমাকে দু'এক সময় সবিতার সামনেই হেসে বলতেন, দূর মশায় একটা লেখক লোক নতুন একটা চরিত্র লিখে দিতে পারছেন না?

সবিতা এসব সময় প্রত্যাশী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাত।

আমি হেসে বলতাম, একটা কেন, আপনি অর্ডার দিলেই দশটা চরিত্র যোগ করে দিতে পারি। কিন্তু গল্পের সঙ্গে খাপ খাবে কিনা কথা দিতে পারছি না।

অলোকবাবু বলতেন, আরে না না মশায়, সে কথা কে বলছে। গল্পকে হত্যা করে চরিত্র সৃষ্টি করতে বলছি না।

তারপর সবিতার দিকে তাকিয়ে হেসে বলতেন, আমার পিছে না ঘুরে এই ব্যক্তিটির পিছে লেগে থাক। চরিত্র পয়দা করা, হত্যা করা, সব এই লোকটির হাতে।

এই উস্কানিতেই কিনা কে জানে, এরপর থেকেই সবিতা আমার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করত। আমার বাড়ির ঠিকানাও চেয়েছিল, কিন্তু ইচ্ছে করেই দিই নি। এড়িয়ে গেছি।

ও বোধহয় কারণটা বুঝতে পেরেছিল। এরপর আর কোনদিন আমার ঠিকানা চায় নি ও। বরং উল্টে ওর ঠিকানাই আমাকে দিয়ে বারে বারে অনুরোধ করেছিল

একদিন যাবার জন্য কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সে ঠিকানায় যাবার জন্য সেরকম কোন উৎসাহ বোধ করিনি কোনদিন। সময়ও পেতাম না।

কিন্তু, কিছুটা ঘনিষ্ঠ হবার পর, ও অনেক সময় কথায় কথায় ওদের পরিবারের যে কাহিনী বলত, তাতে মেয়েটার জন্য মাঝে মাঝে সহানুভূতি বোধ করতাম। দারুণ যে একটা আর্থিক অনটন ছিল পরিবারের, তা নয়। অভাবটা ছিল পারিবারিক শান্তির। নিষ্ঠার। স্নেহ-প্রীতির।

বাবা কাকারা পূর্বপুরুষের সম্পত্তি সে রকম কিছু পাননি। এঁদের পূর্বপুরুষ-রাই সেটা উড়িয়ে দিয়ে গেছেন। এক বসত বাড়িটা ছাড়া। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে নাকি এরা পূর্বপুরুষের একটা জিনিষ পুরোই পেয়েছেন—সেটা উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বার্থপরতা। পরিবারে পারিবারিক বন্ধন বলে তাই কিছুই নেই।

অবশ্য জানি না, এই বিবরণের কতটা সত্য, কতটা মিথ্যে। নতুন যারা ছবিতে নামার জন্য পাগল, অনেক সময়ই দেখেছি তাদের শেষ পর্যন্ত আর কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সত্যি-মিথ্যা, ন্যায়-নীতির কোন ধার ধারতে চায় না তারা। তখন সামনে একটাই মাত্র লক্ষ্য থাকে তাদের—যেমন করে হোক তাদের একটা ছবিতে নামতেই হবে।

সবিতাকে দেখে মাঝে মাঝে আমার ভয় হত। ছবিতে নামার ব্যাপারটা ক্রমেই ওর তীব্র হয়ে উঠছিল। একটা জেদে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যেন। ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন একটা যন্ত্রণা বোধ করত ও। কোন একটা কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসার আগে একটা সুযোগ করে দেবার কথা আমি ভাবছিলাম।

কথাটা একদিন পরিচালককে বললামও। মৈত্র বললেন, দিন না, আমার আপত্তি কি? প্রোডিউসারকে তুষ্ট করতে পারলে তো আখেরে আমাদেরই লাভ। কিন্তু দেবেনটা কোথায়?

সেটাও এক সমস্যা। দেখতে মোটামুটি ভালই সবিতা। চেহারায় কোথায় যেন, শিক্ষা বা ব্যক্তিত্বের ছাপ না থাকলেও, একটা বনেদী ছাপ আছে। তার সঙ্গে আছে যৌবনের একটা চাপা ঔদ্ধত্য। এ ধরনের মেয়েদের যে কোন রকম চরিত্রে মানায় না। যাদের চেহারায় বিশেষ কোন ধরনের ক্যারেক্টার নেই তাদের বরং সুযোগ দেওয়া সুবিধে। ঝি-টি যে কোন চরিত্রে নামিয়ে দেওয়া যায়।

একদিন মেট্রোর সামনে হঠাৎ সবিতার সঙ্গে দেখা। ভদ্রতার খাতিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এদিকে কোথায়?

সবিতা হেসে বলল, একটা ফিল্ম অফিসে। আপনি তো আমার জন্য কিছু করলেন না।

এরকম সরাসরি অভিযোগে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। বললাম, চেষ্টা করে যাচ্ছি। ঠিক আসছে না।

সবিতা বলল, কোথায় যাচ্ছেন ? জরুরী কোন কাজে ?

বললাম, না, সেরকম কোন কাজে না।

সবিতা বলল, তাহলে চলুন না, একটু কফি খাওয়া যাক। আমি ম্যাড্রাজি কাফেটাতেই ঢুকছিলাম। আপত্তি করবেন না নিশ্চয়ই ?

ওর বলার ধরনেই আপত্তির উপায় থাকল না। বললাম, চল।

সঙ্গে সবিতা থাকায় দোতলায় গিয়ে বসলাম। খুব বেশি ভিড় ছিল না। একটা কোনের দিকে গিয়ে বসলাম আমরা।

ছবিতে নামার, শিল্পী হবার যন্ত্রণা যে সবিতার কী তীব্র সেটা টের পেলাম ওর সঙ্গে আলাপ করে। লক্ষ্য করে দেখলাম, বাইরে যাই করে বেড়াক না কেন, মেয়েটির ভেতর কোথায় যেন একটা সারল্য আছে। অথবা, অগভীরতাও বলা যায়। কোন কিছুরই যেন কোন গুরুত্ব বুঝতে পারে না ও। না হলে, অলোক বাবুর সঙ্গে ওর মেলামেশার যে বিবরণ ওর কথার ফাঁকে ফাঁকে পেলাম সেটা চেপে যেত ও।

সেদিন বাড়ি ফিরেই চিত্রনাট্যটা নিয়ে বসলাম আবার। সবারই যখন ইচ্ছে, চেষ্টা করে দেখিই না। সত্যি কথা বলতে কি, এতদিন সেরকম গুরুত্ব দিয়ে ভাবিনি কথাটা।

ছোট একটা চরিত্র বের করে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হল না। ইচ্ছে করেই চরিত্রটা কঠিন রাখলাম না। সংলাপ কম দিলাম। যদি বলার সময় গোলমাল করে ফেলে। অবশ্য সবিতাকে, কে জানে, হয়তো অজান্তে প্রোডিউসারকেও খুসী করার জন্যও, চরিত্রটা তিন চারটা দৃশ্যে ছড়িয়ে দিলাম। গোটা তিন চার অভিব্যক্তিরও সুযোগ করে দিলাম ক্লোজ-আপ এর সুযোগটা ধরিয়ে দেবার জন্যে।

দিন সাতেক পর কাজ পড়ল সবিতার। বেশ বড় সেট্ পড়েছে। জনা ছয় সাত নামী অভিনেতা সহ আজকের অভিনেতা সংখ্যা প্রায় জনা পনের। পরিচালক দারুণ টেনশনের ভেতর আছেন। লোড্ শেডিং-টেডিং-এর ঝামেলায় পড়ার আগেই যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে। আজকের সুটিং-এর পুরো স্কীম আগেই করে নিয়েছেন তিনি।

কিছুক্ষণ কাজ করার পর সবিতার ডাক পড়ল। মেক-আপ রুম থেকে

অলোকবাবু নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ওকে। ফ্লোরে লাইট অ্যাডজাষ্ট করা হচ্ছিল তখন। পরিচালক, ক্যামেরাম্যান সবাই সেদিকে ব্যস্ত।

আমাকে একা বসে থাকতে দেখে সবিতা এগিয়ে এল। আচমকাই আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। হেসে বলল, আশীর্বাদ করুন যেন আপনার সম্মান রাখতে পারি।

আমি ওকে সাহস দিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই পারবে। নার্ভাস হবে না একদম, তাহলেই হবে। কিন্তু তোমাকে কিছুটা টায়ার্ড লাগছে কেন।

সবিতা একটু হেসে বলল, কাল অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরেছিলাম। ভাল ঘুম হয় নি।

বললাম, কোথায় গিয়েছিলে ?

ও বলল, একটা পার্টি ছিল।

একটু অবাক হলাম। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! বললাম, কার সঙ্গে গিয়েছিলে ?

ও ঠোঁট টিপে একটু হাসল। বলল, গিয়েছিলাম একজনের সঙ্গে।

আন্দাজেই বুঝলাম, সেই এক জন কে। অলোকবাবু যে ওকে ছবিতে নামানোর নাম করে এতটা সুযোগ নিতে শুরু করেছেন, জানতাম না। অবশ্য মনে মনে অলোকবাবুর চেয়েও বেশী বিতৃষ্ণা বোধ করলাম সবিতার ওপর।

সব কিছু ঠিক ঠাক করে পরিচালক সবিতাকে ডাকলেন। সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন। এই শটে ওর কোন সংলাপ নেই। ঘরে নিজের মনে কাজ করছিল, দরজায় শব্দ শুনে কিছুটা ভয়, কিছুটা বিস্ময় নিয়ে ফিরে তাকাবে ও দরজার দিকে। ব্যাস্, আর কিছু নয়।

কিন্তু সমস্যায় ফেলল সবিতা। বার তিনচার শট্টা নষ্ট করেও এই সামান্য অভিব্যক্তিটুকু ও মুখে আনতে পারল না। পরিচালক মনে মনে দারুণ চটে গেলেন। কিন্তু প্রডিউসারের ক্যাণ্ডিডেট্ বলে মুখে ধমকাতেও পারলেন না।

ওর কাছে গিয়ে বললেন, ঠিক আছে, বিস্ময় ও ভয়ের অভিব্যক্তি একসঙ্গে ফোটাতে না পারলে যে কোন একটা করুন। হয় ভয়, নয় বিস্ময়।

কিন্তু সেটাও পারল না সবিতা। এবার রীতিমত নার্ভাস হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম। অলোকবাবুও বিরক্ত হয়েছেন বোঝা গেল। আজ প্রচুর কাজ। এর ভেতর এরকম একটা সাধারণ ভূমিকার পিছে আর সময় বা ফিল্ম নষ্ট করা সম্ভব নয়। পরিচালকের কাছে গিয়ে অলোকবাবু নিজেই বললেন, বোধহয়

একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ঠিক আছে, এখন ছেড়ে দিন। শেষের দিকে না হয় আর একবার ট্রাই করবেন। না হলেও সেট্ তো আরো তিন চার দিন আছে, পরে এটা সেরে নেওয়া যাবে। আপনি নেক্সট্ শটে যান।

মাথা নিচু করে সেট্ থেকে সরে গেল সবিতা। প্রচণ্ড কাজের চাপে কেউ লক্ষ্য করল না ওকে।

আমার কিছুটা মায়া হওয়ায় কিছুক্ষণ পর মেক-আপ রুমে গেলাম। গিয়ে শুনলাম ও অফিসে আছে। অফিসে গিয়ে দেখি মাথা নিচু করে গম্ভীর মুখে বসে আছে সবিতা।

ওকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, নার্ভাস হবার কিছু হয় নি। প্রথম প্রথম অনেকেরই এরকম হয়। ঠিক আছে, এখন তো ঘরে কেউ নেই, আমার সামনে চেষ্টা করে দেখতো।

লজ্জার আর সময় নেই বুঝেই আপত্তি করল না সবিতা। কিন্তু নানাভাবে, অনেক উৎসাহ দিয়েও শেষ পর্যন্ত মনে মনে হার স্বীকার করতে হল আমার। এমন অভিব্যক্তিহীন মুখ আমি জীবনে দেখিনি। কোন ভাবের কোন অভি-ব্যক্তির ন্যূনতম একটি রেখাও যেন ও মুখে চোখে ফোটাতে পারে না।

কথাটা ওকে না বুঝতে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, চেষ্টা কর, হয়ে যাবে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে মনে করবে যে, স্টুডিওতে না, নিজের বাড়িতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অভিব্যক্তি দেখছ তুমি, তা হলেই আর নার্ভাস হবে না।

সেদিন বিকেলের দিকে সব কাজের শেষে আর একবার চেষ্টা করে দেখা হল। কিন্তু বৃথা। এবেলা সবিতার মুখ যেন আরো ভাবলেশহীন।

শেষ পর্যন্ত অলোকবাবুই বললেন, আজ থাক। রিহার্সাল দিয়ে পরে একদিন ডেট্ ফেলা যাবে। আজ আর পারবে না।

কিন্তু পরদিন থেকে আর পাত্তা পাওয়া গেল না সবিতার। রিহার্সালেও এল না। অফিসেও না। আমরা সবাই বুঝলাম, ও নিজে থেকেই বুঝতে পেরেছে যে, ওকে দিয়ে অভিনয় হবে না। শুধু উদগ্র আকাঙ্খা থাকলেই অভিনেত্রী হওয়া যায় না, সেজন্য শক্তি চাই। সাধনা চাই। এত সহজে এবং দ্রুত নিজের আত্ম-মূল্যায়নের ক্ষমতা থাকায় মনে মনে আমি তারিফ করলাম মেয়েটাকে।

সবিতা এরপর সত্যই আর আসে নি। ছবির কাজ শেষ হতে আরও মাস

ছয়েক লাগল। তার তিনমাস পর ছবির রিলিজ-ডেট্ পাওয়া গেল। সত্যি কথা বলতে কি, সবিতার কথা এর ভেতর ভুলেই গিয়েছিলাম।

কিন্তু হঠাৎই ছবিটির রিলিজের দিন অপ্রত্যাশিতভাবে ওর সঙ্গে দেখা হল সিনেমা হলেই। প্রথম ছবি মুক্তির দিন ছবির সঙ্গে যুক্ত সকলেই প্রচণ্ড এক উত্তেজনার ভেতর থাকে। ছবির ভাগ্য নির্ধারিত হবার দিন বলে।

আমিও একটু অন্যমনস্কে বাইরের ব্যালকনিতে একটা সোফার কোণে চুপ করে বসেছিলাম। চোখের সামনে দিয়ে নানা পোষাকের দর্শকরা ঘোরাফেরা করছিল, কিন্তু কাউকেই ঠিক লক্ষ্য করে দেখছিলাম না।

হঠাৎ নিজের নামটা কানে আসায় তাকিয়ে দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আমার বিশেষ পরিচিত একটি ছেলে। সঙ্গে সবিতা। মাথায় ছোট্ট একটা ঘোমটা সিঁথিতে সিঁদুর।

আমি কিছু বলার আগেই অদ্ভুত সূক্ষ্ম একটা অভিব্যক্তিতে ও ইশারা করল আমাকে। আমি স্পষ্ট সে ইশারার অনুচ্চারিত ভাষা বুঝতে পারলাম, দয়া করে আমাদের পূর্ব পরিচয়টা গোপন রাখুন !

ছেলেটি বেশ উত্তেজিত ভাবেই ওর নতুন বউয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, যে ছবিটা দেখতে এসেছ, তার কাহিনীকার ইনি, বুঝলে !

মুহূর্তে সবিতার মুখে এমন একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল, যেন এরকম একটা অদ্ভুত যোগাযোগে, এবং জলজ্যান্ত একজন সিনেমার গল্প লেখককে সামনা-সামনি দেখে দারুণ বিস্মিত, অভিভূত ও।

আমি একটু সরে বসে সবিতাকে বললাম, বস না।

সবিতা একটু ইতঃস্তত করে আমার পাশে বসে পড়ল।

ছেলেটি হেসে বলল, জানেন, ছবিটা ফার্স্ট শোতেই দেখার জন্য ওর মাথায় কেমন যেন একটা ভূত চেপেছিল। বাধ্য হয়ে অফিসটা কামাই করতে হল আমার।

আমি হেসে বললাম, স্ত্রীর জন্য এটা খুব মিনিমাম স্যাক্রিফাইস। খুব বেশী কিছু কর নি।

ওরা দু'জনই শুনে হেসে ফেলল। ছেলেটি বলল, দাঁড়ান, তিনটে কোকা-কোলা আনি, দারুণ গরম লাগছে।

ছেলেটি সরে যেতেই আমি আস্তে সবিতাকে বললাম, সেদিন অত সহজ

একটা অভিব্যক্তি দিতে গিয়েও কিছুতেই পারলে না। কিন্তু আজ এত স্থক্ষ অভিব্যক্তি দুটো কি করে ফোটালে বল তো। অনেক পাকা অভিনেত্রীও এটা পারত কিনা সন্দেহ।

সবিতা চোখ নামিয়ে হেসে বলল, আসল জীবন আর নকল জীবনের ভেতর এখানেই বোধ হয় পার্থক্য মিহির দা!

শিল্পী

দিব্যেন্দু পালিত

ট্রেনটা প্লাটফর্মে ঢোকার মুখেই ব্যস্ততা চোখে পড়ল তাঁর। এদের দেখেই চেনা যায়। কলকাতা নয় যে বহুর ভিড়ে হারিয়ে যাবে, খুঁজে নিতে হবে জহুরীর চোখে। ফুটফুটে একটি কিশোরকে মালা হাতে দৌড়তে দেখলেন গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে। তাজা, ফুরফুরে, রজনীগন্ধার মালা! সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। অবশ্যই ফুলের জন্যে বা কল্পিত সুগন্ধের জন্যে নয়। এসব তাঁর আটচল্লিশ বছরের জীবনে অনেক দেখেছেন, অনেক পেয়েছেন। সত্যি বলতে, তাঁর কৈশোর কেটেছে ফুলে ফুলে, গন্ধের মধ্যে। আজকের দীর্ঘশ্বাস অন্য কারণে, তাঁর নিজের কথা ভেবে।

ক্রমশ মন্থর হয়ে আসছে ট্রেনের গতি। টিকিটটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে অন্য হাতে স্থটকেশটা তুলে নিলেন তিনি। যে কামরায় দাঁড়িয়ে আছেন তার পরেই শুরু হয়েছে ফার্স্ট ক্লাস। ছুটোছুটি দেখে বুঝলেন ওদের লক্ষ্য সেদিকে। তবু ভালো—এরা নামেই চেনে, চেহারায় নয়। একটি নামকেই মাল্যদান করবে তারা, একটি নামের মহত্ব বা মূল্যকে। গোটা মানুষটিকে নয়, তার ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত জীবনকে নয়।

না হ'লে ঘটনাটা অন্য রকমও হতে পারত। সঙ্কোচে পড়তে হতো তাঁকে, কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে যুৎসই মিথ্যা খুঁজতেন।

যদিও এই কথাটিই আজ এখানে বলতে এসেছেন তিনি যে সত্যবাদিতাই তাঁর জীবনের ধর্ম, তাঁর তপস্যা, সারা জীবনের নিরলস সাধনার সঞ্চয়। যাঁরা তাঁকে ভালোবাসেন, তাঁর রচনাকে, পরোক্ষে তাঁরা সেই মহাভূমিতেই নত হন, যার নাম সত্য।

আট, ন' ঘণ্টার ট্রেন জার্নিতে সারাক্ষণ মনে মনে এই কথাই ভেবেছেন তিনি। ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত রোমাঞ্চে শিহরিত হয়ে উঠেছে সমস্ত শরীর, চেতনার ভিতর একটা ঠাণ্ডা সাপ যেন হিলহিল ক'রে নেচে উঠছে। কখনো পুলক, কখনো বিস্ময়, কখনো বা মানসিক দীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চিন্তাশক্তি। সাফল্যে

মানুষ গর্বিত ও আনন্দিত হয়—হয়তো এক ধরণের সাফল্য সম্ভাবনার শীতোষ্ণ বোধ তাঁকে অভিভূত ক'রে তুলেছিল। সে বোধও সাময়িক। আসলে সারাক্ষণই মনে হচ্ছিল এই সাফল্যের অর্থ মানুষের আত্মমুখিনতার জয়!

কিন্তু এতোক্ষণের আশা উদ্দীপনা, অনুচিন্তার ঢেউ থিতিয়ে পড়ল ট্রেন স্টেশনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে।

তখনো গতিশীল ট্রেনের কামরা থেকে ব্যস্তভাবে সুটকেশ হাতে নেমে পড়লেন তিনি। শরীরে জোর নেই তেমন। মনের জোর কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে শুরু করেছিল হাঁটু। ধুতির কোঁচায় পা আটকে গিয়েছিল, সামলে নিলেন কোন-রকমে।

তাঁর হাসি পাচ্ছিল অনতিদূরে তাকিয়ে, যেখানে ব্যস্ততা ও উৎকণ্ঠা এতোক্ষণে শূন্য স্পর্শ করেছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন সেই কিশোরটির দিকে, যে তাঁর নামকে মালা পরানোর জন্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে—প্রৌঢ়, প্রায়-প্রৌঢ়, যুবক, নানা বয়সের উৎসাহীদের সঙ্গে অবুঝ কিশোরও এখন শিকারের সন্ধানে ব্যস্ত! ফার্স্ট ক্লাস কামড়া দু'টি তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে এখন হতাশ হতে শুরু করেছে ওরা। ওরা খুঁজুক।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিমর্ষ বোধ করলেন তিনি। যা করেছেন, তা অত্যন্ত গর্হিত। উদ্যোক্তারা টের পেলে সারা জীবন হেয় হয়ে থাকতে হবে তাদের চোখে। সামনে কিছুই বলবে না হয়তো, কিন্তু মনে মনে হাসবে, ছ্যাখো, ফার্স্ট-ক্লাশ ফেয়ার পাঠানো সত্ত্বেও লোকটি সেকেণ্ড ক্লাসে এসেছে! ওদের বোঝানো যাবে না, বেয়াল্লিশটি টাকার মূল্য তাঁর জীবনে আজ অনেকখানি।

কিন্তু, বেঁচে গেলেন তিনি। হঠাৎ একজনের চোখ পড়ল এদিকে। কী আশ্চর্য, চিনে নিতেও দেরী হলো না। সুটকেশটা হাত থেকে কেড়ে নিল কেউ। চাঞ্চল্যের মধ্যে ছুটে এসে সেই ফুটফুটে কিশোরটি রজনীগন্ধার মালাটি প্রায় ছুঁড়ে দিল তাঁর গলায়। উগ্র, বিবশকারী সুবাসে ঝিমঝিম করতে লাগল স্নায়ু। কৃতজ্ঞতায় দু'হাত জড়ো ক'রে ক'মুহূর্ত অভিভূত দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

কেউ সন্দেহ করল না। অস্বস্তিকর কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো না তাঁকে। বরং হাবভাব দেখে মনে হলো তাঁকে পেয়ে ধন্য হয়ে গেছেন সকলে। ভক্তজন পরিবৃত অবস্থায় আত্মবিস্মৃত হলেন তিনি।

আয়োজনে ত্রুটি ছিল না কোনো। তাঁর প্রতিটি সুখ সুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ছিল উদ্যোক্তাদের। উঠেছিলেন সমিতির সভাপতির বাড়িতে। ভদ্রলোক

পেশায় ডাক্তার। পসার ও জনপ্রিয়তা আছে, জনহিতে তাঁর অবদানের কথা গাড়িতে আসতে আসতেই শুনিয়েছিলেন। পরে তাকে বিশ্রাম নিতে ব'লে কলে বেরুলেন।

তা হোক। বাড়ির লোকজন ছিল, ছিল পাড়ার ছেলেরা—অন্দরে ও বাহিরে সেবা পরায়ন কয়েকটি মানুষের ব্যস্ততায় খুশীই হলেন তিনি।

চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করা গেল। বছর সাত-আটের একটি মেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে লক্ষ্য করছিল। দৃষ্টিতা কৌতুকের, যেন চিড়িয়া-খানায় বনমানুষ দেখছে!

বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে টলটলে জলে ফুলের সুবাস পেলেন। এবার রজনীগন্ধা নয়, গোলাপ। গায়ে জল ঢালতেই সিরসির ক'রে উঠল সর্বাঙ্গ। এ অনুভূতি বহু পুরনো হলেও তাঁর চেনা—প্রতি রোমকূপ ফুরে বেরিয়ে আসছে অযত্নলালিত রক্তের কান্না। এই খাতেই বয়ে গেল তাঁর চিন্তা। উপমা হিসেবে মন্দ নয়। ফিরে গিয়ে এই নিয়ে একটা গল্প লেখার কথা ভাবলেন। কলকাতায় প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে আনন্দিত রক্তের বিদ্রোহের কাহিনী হয়তো তেমন জমবে না। তবু, সব অভিজ্ঞতারই দাম আছে। দুঃখ ও তিক্ততাময় ক্লান্তিকর পৌনঃ-পুনিকতার মধ্যেও এই রকম এক একটি দিন ফুটে ওঠে ফুলের মতো। হোক স্বল্পায়ু, তবু স্মৃতি মাত্রই মূল্যবান!

স্নান সেরে বেরিয়ে আসার পর বেশ ঝরঝরে লাগছিল শরীর। বাইরের হল-ঘরে তাঁর জন্যে আলাদা বসার ব্যবস্থা করা হলো। গা এলিয়ে বসলেন ইজিচেয়ারে, মখমলের তাকিয়ায়। এখানে জীবনের একটা আলাদা অর্থ আছে, যার নাম শান্তি। কথাটা আজকাল আর ব্যবহার হয় না সাহিত্যে—অসারতার অপবাদে পুরনো চিঠির মতো অনেকদিন আগেই ফেলে দেওয়া হয়েছে ডাস্টবিনে। এখানে, রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে, সুস্পষ্ট আরামের মধ্যে ব'সে শান্তির পুরনো তাৎপর্যে ফিরে গেলেন তিনি।

এখন বিশ্রাম নিতে হবে তাঁকে। বিকেল পাঁচটায় সভা, তার জন্যে তৈরী থাকতে হবে দেহে ও মনে। তবু নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম বুঝি এ-জীবনে আর পাবার নয়।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল; ক্লান্তিতে হাই উঠল পর পর কয়েক বার। নির্জন ঘরে একা বসে সুস্থির হবার চেষ্টা করলেন তিনি। জানলার বাইরে প্রচুর রোদ, তার কিছু ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। দৃষ্টি প্রায় সেইখানে গিয়ে আটকে গেল।

রৌদ্রোজ্জ্বল এই বেলা, এমন অফুরন্ত হাওয়া বহুদিন দেখেন নি তিনি। কতো দিন? মনে মনে হিসেব কষে বের করার চেষ্টা করলেন। মিলল না।

কিছু কিছু অবশ্য মনে পড়ল। বেয়াল্লিশে কারাবরণ। আগষ্ট আন্দোলনের তখন তুরীয় গতি। তিন মাস জেল খেটে যেদিন মুক্তি পেলেন, সেদিনের সঙ্গে কি আজকের সকালের ঘটনার মিল আছে কোনো? হয়তো।

সেদিনও গলায় মালা দেবার জন্যে ছুটে এসেছিল অনেকে। রক্তে তখন বয়ে চলেছে উদ্দাম নদী। ওঃ, কী ছিল এক একটা দিন! যেন বারুদে ঠাসা! পঞ্চাশে বিয়ে হলো। ভালবাসার বিয়ে, সুরমা এলো। বাহান্নয় বড়ো ছেলে সন্টু।

ছবির মতো এক-একটা দৃশ্য ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। বহু দিবসের অবহেলিত স্মৃতি দরজা খোলা পেয়ে পড়ি-কি-মরি ভাব নিয়ে ছুটে আসছে, তার কোনটি মুণ্ডহীন, কোনটি রঙীন, বিবর্ণ, ধূসর। কোনটি বা চকিত আলোর আভায় সমুজ্জ্বল।

শেষের বছরগুলির স্মৃতি তেমন সুখের নয়। জেল থেকে বেরিয়ে চাকরি নিয়েছিলেন খবরের কাগজে। দেশ স্বাধীন হলো সাতচল্লিশে। বছর দুয়েক যেতে না যেতেই কাগজ উঠে গেল—বানিজ্য কেঁপে ওঠার মুখে কম্পিটিশনে টিঁকতে পারল না। তারপরের ইতিহাস একটানা হা-ভাতের। ঘরে রুগ্ন স্ত্রী, অর্থাভাব, চারটি সন্তানের ভরণপোষনের অমানুষিক দায়!

তবু হাল ছাড়েননি তিনি ভগ্নোদ্যম হননি। মেতে উঠেছিলেন সৃষ্টির আগ্রহে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। চোখের সামনে সমজীবীরা ফেঁপে উঠেছে অর্থ, বিত্ত, সম্মানে। দেখে শুনে ধিক্কার দিয়েছেন পাঠকের অবিমৃষ্যকারিতায়। সস্তায় বাজি মাত্! শিল্পীর সততা কোথায়? কোথায় সেই লড়াইয়ের খবর; আবহমান মানুষের সভ্যতা যার জন্যে পটভূমি সৃষ্টি ক'রে রেখেছে!

একটু ঝিমুনির ভাব এসেছিল। পাশে টিপয়ের ওপর দামী সিগারেট রাখা। একটা তুলে নিয়ে আগুন জাললেন তিনি। এই রোদ, এই হাওয়া, সবকিছুই অত্যন্ত প্রাণবন্ত মনে হচ্ছিল তাঁর। কেননা, এই প্রথম তাঁর ডাক এলো। এতো-দিনে সার্থক হলো তাঁর শ্রম। এতোদিন যাদের প্রতীক্ষায় উদগ্রান্ত তাকিয়ে থেকেছেন দূরে, তারা এসেছে।

ঘাম দিয়ে জর ছাড়ার মত সহজ, শিথিল হয়ে এলো তাঁর শরীর। বিকেলে সভায় তিনি তাঁর মনের কথা বললেন।

সমাগম মন্দ হয়নি। শ'চারেক লোকের মধ্যে বেশির ভাগই যুবক, কিছু মহিলাও ছিলেন। সভা শুরু হওয়ার পর ভিড় বাড়তে লাগল ক্রমশ।

প্রথম প্রথম এই সমাবেশের দিকে তাকিয়ে একটু আড়ষ্ট বোধ করছিলেন তিনি। পেশাদার বক্তা তো নয়, তিনি সাহিত্যিক। খবরের কাগজের বাঁধা বুলি নয়, তাঁর সব কথাই তাঁর মনের কথা। মানুষের আদর্শ ও তার বিপুল সম্ভাবনার কথা। ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে এতোদিন যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা নিয়ে কথার পর কথা জুড়ে রচনা করেছেন একটার পর একটা গল্প, উপন্যাস; আজ বহুর মাঝে অন্তরের সেই বাণী ছড়িয়ে দেবার সময় কিঞ্চিৎ দুর্বলতা যে দেখা দেবে, তাতে আর সন্দেহ কি!

তবু তিনি বললেন। শুরু করেছিলেন ধীরে ধীরে, নিজেকে গুছিয়ে নিতে সময় নিলেন কয়েক মিনিট। ক্রমশ উদাত্ত হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর, স্বরের উত্থান-পতন তাল লয় মিশে যেন একটা গানের সুর একাকার হয়ে গেল।

'আমার কণ্ঠস্বরের এই উত্থান-পতন, আরোহন অবরোহন আমার জীবনের মতো।' তিনি বলছিলেন; 'মানুষের জীবনও এক দীর্ঘস্থায়ী সঙ্গীতের সুরের মতো—তার কোথাও উত্থান; কোথাও পতন; কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার। জীবনের প্রবাহ শুধু সমতলে সীমাবদ্ধ নয়, জীবন পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতার সমাহার! এই মুহূর্তের অন্ধকারকেই যদি আমরা সত্য বলে ধরে নিই, তাহলে ভুল করব। তাহলে অবিচার করা হবে যুগ যুগ ধরে প্রবহমান মানুষের সভ্যতাকে; হেয় করা হবে মানুষের সংগ্রামশীল প্রতিভাকে। আমাদের জীবনের একটিই লক্ষ্য হওয়া উচিত; তা হলো আলোর উপাসনা। অন্ধকারের চেতনায় কোন মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। অন্ধকারে আলোর ফুল ফুটিয়ে তোলাই হলো শিল্পীর কাজ। সে কাজে কতোখানি সফল হয়েছি সে-বিচার করবেন আপনারা; যারা নতুন যুগের অগ্রদূত; নতুন লেখার পাঠক।'

বিপুল করতালির মধ্যে গৃহীত হলো তাঁর কথাগুলি। কথা শেষ হবার পরও যেন বহুক্ষণ তিনি নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিলেন নিজের কণ্ঠস্বর। অদ্ভুত আবেগময় সে কণ্ঠ। এতোক্ষণে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে আকাশের দিকে চোখ মেললেন তিনি।

* * *

হাওড়া স্টেশনে যখন গাড়ি পৌঁছুল তখন আর ভোর নেই। বেলা হয়েছে।

উদ্যোক্তারা পীড়াপীড়ি করেছিলেন আর একটা দিন থেকে যাওয়ার জন্যে। স্ত্রীর অসুখ, থাকা গেল না।

প্লাটফর্মে নেমে কুলি ডাকলেন। স্যুটকেসটা তেমন ভারী নয়, যাবার সময় একাই বহন করেছিলেন। তবু, এই মুহূর্তে বিলাসিতার লোভটুকু সামলাতে পারলেন না। নিজেকে আজ খুব সহজ লাগছে, যেন অনেকদিন পরে স্বর্গের চাবি এসে পড়েছে হাতের মুঠোয় !

'বাবা !'

প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়েই হঠাৎ পরিচিত ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। চেকিং গেটের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বড় ছেলে সন্টু।

'কিরে ! তুই এখানে ?'

'তোমাব জন্যে অপেক্ষা করছি। ট্রেন লেট ছিল।'

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁফ ছাড়ল সন্টু। তারপর বলল, কাল রাত থেকে মা'র ব্যাথাটা আবার বেড়েছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন এক্ষুনি ইঞ্জেকসন দিতে। বাড়িতে টাকা নেই ! তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি !'

'হতভাগা ছেলে !'

আরো খারাপ কথা এসে গিয়েছিল তাঁর মুখে। চারপাশে ভীড়, ব্যস্ততা, লোকজন দেখে কোন রকমে সংবরণ করলেন নিজেকে।

'মরণ পর্যন্ত তোরা আমার পেছনে তাড়া করবি। আমি জানি !'

উত্তেজনায় তাঁর কপালে একটা শিরা ফুলে উঠল। হাতটা ঢুকিয়ে দিলেন জামার পকেটে। আজ ফার্স্ট ক্লাসে এলেও গতকাল তিনি কিছু ভাড়া ফাঁকি দিয়েছিলেন।

ক'লকাতা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আজ অনুপমের ফুলশয্যার রাত। মাঘ মাসের আট তারিখ। এখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। ফুলশয্যার অনুষ্ঠানে ঘটা করে কিছুই হয়নি। সামান্য কয়েকজন অতিথি বিদায় নিয়েছেন। বাড়ি এখন অনেকটাই নিস্তব্ধ। শুধু বাইরে এটো পাতা নিয়ে কুকুরের হুড়োহুড়ি শোনা যায়। রাস্তায় রিক্সার ঠুনঠুন বা ট্যাক্সির মিটার ঘুরবার ক্ষীণ আওয়াজ। সানাই বাজছে দূরে। অনুপমের বিয়েতে সানাই বাজেনি, কলকাতায় আজ অনেক বিয়ে। রাস্তার মোড়ে বড় বাড়িটায় ম্যারাপ বেঁধে এক বড়লোকের বৌভাত হচ্ছে। সে বাড়িটায় প্রচণ্ড ভীড়। আলো, শব্দ, সানাই। ঘরের জানলায় দাঁড়ালে পরিস্কার সব শোনা যায়। জানলায় দাঁড়িয়ে মোড়ের বাড়িটার দিকে চেয়ে অনুপম একটা সিগারেট ধরাল, কম দামী, ঝাঁঝালো সিগারেটের ধোঁয়ায় আর শীতে চোখে একটু জল এল বুঝি। চশমাটা খুলে সে চোখের জলটা মুছে নিল। তারপর চশমাটা হাতে ধরেই দাঁড়িয়ে থাকে সে।

একটু বাদে পিছনে বেনারসীর খস্‌খস্ আর গয়নার একটু ঠুং ঠাং আওয়াজ ওঠে। জলপাইগুড়ির সেই অচেনা মেয়েটি, যার নাম রাণু। যে পরশু দিন থেকে তার বৌ হয়েছে, সে বুঝি ঘরে এল। পরশু এক ঝলক দেখেছিল শুভ-দৃষ্টির সময়ে। তখনই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল তার। সুন্দর ? না, তেমন সুন্দর কিছু নয়। তবে বড় বড় দুখানা বাঙ্ময় চোখ আছে। ঠোঁট দুখানা মিষ্টি, কিশোরীর মতো কচি একটা আহ্লাদী ভাব মাখানো আছে মুখের ডৌলটিতে। অনুপমের বুকের মধ্যে গুর গুর করে ডেকে উঠেছিল মেঘ, বিদ্যুৎ চমকে উঠেছিল।

অনুপম শুনতে পায়, সন্তর্পণে মেয়েটি দরজা বন্ধ করে। মুখ না ফিরিয়ে অনুপম সবই অনুভব করে। কেমন সুন্দর ফুল আর সেন্টের গন্ধে ভরে উঠল ঘর। লজ্জায় অনুপমের শরীরটা শক্ত হয়ে থাকে। একটু বাদেই ওর সঙ্গে তার ভাব হবে। একই বিছানায় ঘুমোবে দুজন। সারা জীবন এক সঙ্গে থাকবে—একি ভাবা যায় ?

একটা শ্বাস ফেলে অনুপম মুখ ফেরায়। মেয়েটি কাঠ হয়ে বিছানায় এক পাশে বসে আছে। মুখ নোয়ানো। গোলাপী বেনারসী আর গয়নায় ওর চেহারাটা ঢাকা পড়ে গেছে।

অনুপম বলার মতো কিছু খুঁজে পেলনা। অনেক ভেবে বলল—আজ খুব শীত। না?

কোনো উত্তর পেল না। একটা শ্বাস ফেলে বলল—শুনছো?

উত্তর নেই।

—তোমার নাম তো রাণু?

মেয়েটি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—হ্যাঁ।

আমার নাম ধাম তো তুমি জানোই। অনুপম চৌধুরী, ইস্কুল মাষ্টার।

মেয়েটি মুখ তুলল না। আরো নত হয়ে রইল।

অনুপম খুব নার্ভাস বোধ করে। কাঠের চেয়ারটায় বসে বলে—রাণু!

—উঁ।

—আমি কত মাইনে পাই জানো?

—না।

—সব মিলিয়ে সাড়ে তিনশো, একটা টিউসানী করি পঞ্চাশ টাকার, কত হল বলতো?

রাণু একটু হাসে। মুখটা তুলেই আবার নামিয়ে নিয়ে বলে—চারশো।

মাসে পনেরো টাকার সিগারেট খাই। আর বাস ভাড়া, টিফিন, চা সব নিয়ে ধরো আরো চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ টাকা তাহলে কত থাকছে?

—সাড়ে তিন শো।

—বাসা ভাড়া আশি টাকা, ইলেকট্রিক ধরো পাঁচ, তাহলে কত থাকে?

রাণু এবার হিসেবটা করতে সময় নেয়। সাড়ে তিনশো থেকে পঁচাশি বাদ দিতে গিয়ে ভুল করে বলে—দু'শো পঞ্চান্ন।

হল না। দুশো পঁয়ষট্টি।

রাণু একটু হেসে খুব আস্তে বলে—এত হিসেব দিয়ে কী হবে?

অনুপম হাই তুলে বলে—তোমার খুব কষ্ট হবে রাণু।

—হোকগে। রাণু জবাব দেয়।

—আমাদের বিয়েতে সানাই টানাই বাজল না, আলোর রোসনাই হল না, ওই শোন, বড় লোকের বিয়ের সানাই বাজছে, খুব আলো ঝলমল করছে।

রঙ্গীন আলোর প্রজাপতি জলছে নিভছে, ও বাড়ির বৌ কত হাজার টাকার উপহার পেয়েছে আজ কে জানে!

রাণু হয়তো বুঝতে পারল তার স্বামীটি নিতান্তই ভাবপ্রবণ এবং অহংকারী। বলল—ওসব কথা থাক্।

—তাহলে থাক্। বুঝলে রাণু। ও বাড়ীর সানাইটা আমাদেরই বিয়ের সানাই। কেমন?

রাণু মৃদু হেসে বলে—আচ্ছা।

—তুমি কী কী উপহার পেয়েছো রাণু?

—মনে নেই।

—বলো না।

কী জানি।

—শাড়িটাড়ি পাওনি?

—হুঁ।

—কটা?

—তিন চারটে।

—আর সোনা দানা?

রাণু ঘোমটা থেকে মুখ তুলে অনুপমকে দেখে চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে—হিসেব করিনি।

—বলো না। আংটি, দুল হার কিছু পাওনি।

—পেয়েছি।

– কটা?

একটা আংটি, আর বোধহয় এক জোড়া ঝুমকো।

—বাস?

রাণু উত্তর দিল না। অনুপম একটা বড় শ্বাস ফেলে বলে—না সানাই, না সোনা, না শাড়ি। তোমার দুঃখ নেই তো রাণু? মেয়েদের জীবনে এই একটা রাতই তো আসে। সেটাও যদি—

—উঃ! বলছি তো আমার একটুও খারাপ লাগে নি।

—কখন বললে?

রাণু হেসে ফেলে বলে—মনে মনে বলেছি।

অনুপম অবাক হয়ে বলে—মনে মনে বলেছো? বাঃ তোমার বেশ বুদ্ধি তো

রাণু আর একটা কথা, —

—কী ?

—আমার ভাই বল্টু, আর আমার মা—এ দুজনকে ভালবাসতে পারবে তো ?

—পারব না কেন ?

—আর আমাকে ?

- যাঃ।

অনুপমের আর নার্ভাস লাগছিল না। ঘোমটা সরে যাওয়া মুখখানা, স্পষ্ট দেখতে পায়। ঢলঢলে মুখখানা ওকে ভালবাসতে একটুও দেরী হয় না। অনুপম ডাকল—রাণু।

- উঃ

—আমি মনে একটা কথা বলছি।

— কী ? —রাণু প্রশ্ন করে।

—বলো তো কী।

— কী করে জানব ?

অনুপম হাসল, বলল—তাহলে জেনে কাজ নেই,

— বললেই তো হয়।

অনুপম শ্বাস ছেড়ে বলে—মনে মনে বলা কথা যতক্ষণ বুঝতে না পারছো ততক্ষণ আমি তোমার কেউ না। যখন বুঝতে পারবে তখনই আমি তোমার সর্বস্ব।

রাণু বলে— অত শক্ত কথা আমার মাথায় ঢোকে না।

— একদিনে অতবুঝে কাজ নেই। ঘুমোও। রাণু অনেকক্ষণ মুখ লুকিয়ে রেখে বসে থাকে। অনুপম চুপচাপ সিগারেট খায়। এক সময়ে রাণু হঠাৎ তার মুখখানা তুলে বলে—বুঝতে পারছি।

— কী ?

— মনে মনে বলা কথাটা।

— কি বলো তো ?

— যাঃ, বলব না।

অনুপম হাসল। বলল— বলতে হবে না। কেবল কথাটা তুমিও আমাকে মনে মনে বলো।

রাণু ভারী লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নেয়। অনেকক্ষণ কথা বলে না।

অনুপম জিজ্ঞেস করে—বলেছো ?

— যাঃ, লজ্জা করে।

— মনে মনে বলতেও লজ্জা ? তাহলে বোধ হয় আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি রাণু। আমারই ভুল। সাড়ে তিনশো টাকার ইস্কুল মাষ্টারকে কি সহজে কেউ পছন্দ করে ?

রাণু হঠাৎ একটু আকুল হয়ে বলে—আচ্ছা, আচ্ছা বলেছি।

—বলেছো ?

—হুঁ।

—কী ?

—যাঃ লজ্জা করে।

অনুপম ধীরে ধীরে বলে — বোলো না। মাঝে মাঝে শুধু মনে মনে বোলো। কেমন ?

— আচ্ছা। রাণু ছোট্ট জবাব দেয়।

তারপর গভীর রাত পর্যন্ত সানাই বেজে গেল, ক'লকাতা জুড়ে জ্বলতে থাকল আলোর রোশনাই। ডাষ্টবিনে জমতে থাকে এঁটো পাতা, কলকাতা জুড়ে আজকের দিনটিতে কত জড়োয়া গয়না, আলোর ঝুরি হাসল, ফুল আর রূপ-ধানের সুবাস মথিত করল বাতাস। ফ্রিজ থেকে রেডিওগ্রাম কত দামী উপহারের হল হাত বদল, গাড়ি থামল, চলল, হাসি আর কথার শব্দ বাজল, মহার্ঘ খাবারের গন্ধে উন্মুখ হল ভিখারীরা। এরই মাঝখানে কখন নিঃশব্দে অনুপমদের বাড়ির উৎসবটি শেষ হয়ে গেল।

পরদিন সকালে যখন তারা ঘুম থেকে উঠল তখনই তারা পুরোনো স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেছে। এ ওর দিকে চেয়ে হাসল, ও এর দিকে চেয়ে, দুজনেই মনে মনে ভাবে— তোমার মনের কথা জানি গো, জানি। এইভাবেই তার পরস্পরকে জানতে শুরু করে।

মাঝে মাঝে রাণু বলে—তুমি বড় ঘরকুনো।

—কেন ? —অনুপম জিজ্ঞেস করে।

—আমার যে এখনো কলকাতা শহরটা দেখাই হয়নি। দেখাবে না ?

—ওহো। আমি ভুলেই যাই যে তুমি মংফস্বলের মেয়ে। আচ্ছা দেখাবো।

—কবে ?

- হবে একদিন।

—আজই চলো না।

- কোথায় যাবে ? চিড়িয়াখানা, না যাতুঘর, না কি কালী ঘাটের মন্দিরে ?

—আহা বল্টুর সঙ্গে ওসব কবে আমার ঘুরে দেখা হয়ে গেছে।

—তবে আর কী বাকি রইল ?

—এমনি রাস্তায় ঘুরব আর দেখব।

- রাস্তায় আর কি দেখার আছে। কেবল দোকান আর ভীড়।

—তুমি সঙ্গে থাকলে রাস্তাঘাটও কত অন্যরকম হয়ে যাবে।

—বটে।

—হুঁ।

—আচ্ছা মা'র পারমিশান নিয়ে রেডি হয়ে থেকো। ইস্কুলের পর এসে নিয়ে যাবো। কলকাতার মেয়রকে একটা টেলিফোন করে দেবো। ইস্কুল থেকে বৌকে নিয়ে বেরোচ্ছি, রাস্তাঘাট যেন পরিস্কার থাকে আজ। আর একটা সাইরেনওলা মোটর সাইকেল যাবে আগে আগে। রাস্তার তুধারে লোক-জন দাঁড়িয়ে থাকবে, ফুল ছুঁড়ে দেবে—

– ইয়ারকী করোনা। আর শোনো

—কী ?

– ম্যাটিনিতে একটা ছবি দেখব। উজ্জলায় যে নতুন ছবিটা এসেছে।

—আচ্ছা।

—তারপর রেষ্টুরেন্ট।

– ওঃ বাবা এ যে দেখছি মোস্ট এক্সপেনসিভ ওয়াইফ্।

– বিয়ের পর নতুন নতুন সবাই ওরকম করে। ঘাবড়ে যেও না। ঠিক সামলে নেবো।

—আচ্ছা।

ম্যাটিনিতে ছবি দেখতে গিয়ে তারা দেখল, সামনে 'হাউস ফুল' টাঙানো। লবীতে প্রচণ্ড ভীড়, ভীড়ের মধ্যে সন্দেহজনক চেহারার কয়েকটা ছেলে ঘুরতে ঘুরতে কানের কাছে বলে যাচ্ছে—তু টাকার টিকিট চার টাকা, তু টাকার টিকিট চার টাকা···ভীড় আর গোলমালের মধ্যে রাণুর করুণ কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ইস্ এত কষ্ট করে এসে টিকিট পাওয়া গেল না।

অনুপম বলে—নতুন ছবি, ভীড় তো হওয়ারই কথা, এখন কী করবে ?

—ব্ল্যাকের টিকিট কাটবে ? রাণু প্রশ্ন করে।

—সেটা কি ঠিক হবে রাণু ?

রাণু উন্মুখ মুখখানা তুলে বলে—না হয় রেষ্টুরেন্টে খাওয়াটা বাদ দিলাম।

—সেজন্য নয়, ব্ল্যাকে টিকিট কাটা ঠিক নয়। ঐ যে লম্বা মতো কালো ছেলেটা টিকিট ব্ল্যাক করছে ও এক সময়ে আমার ছাত্র ছিল। লক্কা মার্কা ছেলে, পাশ টাশ কিছু করেনি, পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এখন এই লাইন ধরেছে।

—কোন ছেলেটা গো ?

ঐ যে কালো ছেলেটা, এদিকেই আসছে—

—তোমার তো ছাত্র ছিল ? তাহলে ওকেই বলো না। ঠিক জোগাড় করে দেবে।

—না, না, দরকার নেই, রাণু। ওরা বড় বাজে ছেলে। রাণু কিন্তু অনুপমের কথায় কান দিল না। তু পা এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে ডাকল—এই যে শুনুন।

ছেলেটা তার রুক্ষ মুখটা ফিরিয়ে বলে—বলুন।

—আমাদের তুটো টিকিট দরকার।

—তুটো আট টাকা।

রাণু একটু হেসে বলে—সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু এঁকে চিনতে পারছেন না ? আপনার মাস্টার মশাই ছিলেন। ছেলেটা তেমনি রুক্ষভাবে অনুপমের দিকে তাকায়, হাতের সিগারেটটা লুকোবার চেষ্টা করে না। একটু চেয়ে থেকে বলে—হ্যাঁ চিনি, অনুপম বাবু। স্যার, কেমন আছেন।

অনুপম কুণ্ঠিত গলায় বলে—ভাল, তুই কেমন আছিস ?

—দেখতেই তো পাচ্ছেন স্যার। আমরাও আমাদের মতো ভালই আছি। বিয়ে করেছেন নাকি স্যার ?

—হ্যাঁ। অনুপম সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

—কবে। নেমন্তন্ন করলেন না তো! এই বুঝি আমাদের বৌদি ? বৌদি, নমস্কার।

রাণু চটুল গলায় বলে—নমস্কার, কিন্তু আমাদের একটু কনসেসনে টিকিট দিতে হবে ভাই।

অনুপম খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, ছেলেটার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। ক্ষীণ গলায় বলে—রাণু, চলো চলে যাই।

রাণু বলে—আঃ, দাঁড়াও না।

ছেলেটা একটু হেসে বলে—বিয়েতে যদি নেমন্তন্ন করতেন স্যার, তাহলে তো একটা প্রেজেন্টেশন দিতেই হত। কিন্তু নেমন্তন্ন যখন করেননি তখন আর কী করা যাবে। তুটো টিকিট আছে। পাশাপাশি সীট, কেনা দামে দিয়ে দিচ্ছি

স্যার নিয়ে নিন।

অনুপম দুর্বল গলায় বলে—না না থাক, তোর ক্ষতি হবে।

—কিছু না স্যার, ঠিক পুষিয়ে নেবো, বৌদি চারটে টাকা দিয়ে দিন।

—ভাগ্যিস আপনি ছিলেন নইলে ঠিক ফিরে যেতে হত। স্বামীর উদ্দেশ্যে বলে—ওগো টাকাটা দিয়ে দাও।

অনুপম অগত্যা টিকিট দুটো নেয় টাকা দিয়ে, ছেলেটা নীচু গলায় বলে—

—বৌদি, এই হল-এ আবার কখনো এলে আমার খোঁজ করবেন। আমি ভবা, সবাই চেনে।

—আচ্ছা।

ওরা যখন টিকিট নিয়ে হলে ঢুকতে যাচ্ছে সে সময়ে পিছনে ভবাকে কে যেন জিজ্ঞেস করে, কে রে ভবা, তোর চেনা লোক ?

—চেনাই বটে। ইস্কুলের মাষ্টার।

--বৌটা বেশ জোগাড় করেছে তো !

—বৌটার জন্যই তো টিকিট দুটো লসে ছেড়ে দিলাম।—জবাব দেয় ভবা।

অনুপমের কান মুখ গরম হয়ে ওঠে, লজ্জায় সিটিয়ে যায় সে, রাগু শুনতে পায়নিতো। শুনতে পেলেও রাগুর কোনো ভাবান্তর নেই। ফিস্ ফিস্ করে বলল—কেমন ম্যানেজ করলাম বলোতো !

—ছিঃ রাগু।

—ওমা, ছিঃ করছো কেন ?

—কাজটা ভাল করোনি, ওরা বড় ইতর।

—হোকগে।

ছবি দেখার পর দুজন রাস্তায় বেরিয়ে এল তখন মানুষের প্লাবনে রাস্তা থিক্ থিক্ করছে। বাসে ট্রামে বাদুড় ঝোলা ভীড়। অনুপম হতাশ হয়ে বলে—রাগু।

—উঁ।

—কি করে ফিরবো ? যা ভীড়।—অনুপমের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

—এক্ষুনি ফিরছে কে ! রেস্টুরেণ্টে খাবো। তারপর কলকাতা দেখব।

—আমার মাথা ধরেছে।

—আচ্ছা, বাসায় ফিরে রাতে মাথা টিপে দেবো। অনুপম একটা শ্বাস ছাড়ে। বলে—পড়েছি মোগলের হাতে।

—ঠিকই তো, এখন চলো মোগলের সঙ্গে খানা খেতে হবে। ওই একটা রেস্টুরেণ্ট।

রেস্টুরেণ্টের কেবিনগুলো ভর্তি। ওরা খোলা জায়গায় বসে, মোগলাই আর কষা মাংসের অর্ডার দেয়। রাগুর মুখে চোখে এখন আলো খেলা করে। ঠোঁটে চাপা হাসি। একটুও ক্লান্তি নেই। বলে—

—মাগো, মফঃস্বলে এতকাল যেন ভূতের রাজ্যে ছিলাম। কলকাতা যে কী সুন্দর। অনুপম হাসে। বলে— টের পাবে কেমন সুন্দর। দুদিন থাকোনা।

—আমার কোনদিন খারাপ লাগবে না।

—না লাগলেই ভাল।

মোগলাই আর মাংস খেতে খেতে রাগু চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করে—কেমন ? ভাল না ?

—ভাল।

—মাঝে মাঝে আমরা এরকম খাবো তো ?

—খাবো।

—তুমি ভাল করে কথা বলছো না।

—মাথা ধরেছে।

—মাথা ধরেছে না হাতী, আসলে বৌ নিয়ে বেড়াতে তোমার ইচ্ছে করে না। তুমি বাপু বড্ড শুকনো মানুষ। ফুলশয্যার রাতে আমাকে আয় আর ব্যয়ের ব্যালান্সশীট শুনিয়েছিলে। হ্যাগো, খরচের কথা ভাবছো না তো ?

—না না

—তবে কী ভাবছো ?

—বলো তো কী ভাবছি।

—বলবো ? দাঁড়াও..উম্‌ম্..ভাবছো, এরকম কালোকুচ্ছিৎ বৌ দেখে লোকে না জানি কী ভাবছে !

অনুপম হেসে বলে—

—ঠিক তার উল্টো। বিয়ের জল পড়ে তুমি আরো সুন্দর হয়েছো। চারদিকের লোক ড্যাব ড্যাব করে তোমাকে দেখছে।

—হিংসে হচ্ছে ?

—একটু একটু।

—হোক, একটু হিংসে হওয়া ভাল। তাতে আমার দাম বাড়বে।

—দাম যথেষ্ট বেড়ে গেছে। কত বিল হয়েছে জানো?

—কত?

- সাড়ে আট টাকা।

—ও বাবা!

—তুমি হচ্ছো মোষ্ট এক্সপেনসিভ ওয়াইফ্।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা। এবার থেকে বুঝে চলব। রাগ করোনি ত?

—রাগ কেন হবে! আজ তো অনুরাগ থেকেই সব করে যাচ্ছি।

—রেষ্টুরেণ্ট থেকে বেড়িয়ে ওরা ট্রাম ধরে। বসার জায়গা নেই। দুজন পাশাপাশি রড ধরে দাঁড়ায়।

রাণু বলে—গড়িয়াহাটায় অনেকক্ষণ ঘুরব কিন্তু।

অনুপম শ্বাস চেপে বলে—ঘুরে লাভ কী? ও হচ্ছে বড়লোকের জায়গা।

—আহা কিছু কিনবো নাকি! শুধু ঘুরব তো।

—আচ্ছা।

গড়িয়াহাটায় নেমে ওরা হাঁটতে থাকে। ভিখিরিরা পিছু নেয়। হকাররা ডাকাডাকি করে।

রাণু ডাকে—এই শোনো!

—কী?

—শো-কেসের এই শাড়িটা দেখেছো? কাঞ্জিভরম।

—হুঁ।

——কত দাম গো?

—কে জানে। প্রাইস ট্যাগ তো দেখছি না। দাম দিয়ে হবে কী?

—রাণু একটা শ্বাস ফেলে বলে—কৌতুহল। চলো না। দোকানে ঢুকে দামটা জিজ্ঞেস করি।

—দুর!

— চলো না গো।

বলতে বলতে রাণু বিশাল অভিজাত দোকানটায় ঢুকে যায়। বড় চঞ্চল মেয়ে রাণু। অনুপমকে কিছু ভাববার সময় দেয় না। কুণ্ঠিত পায়ে অনুপম রাণুর পিছু নিয়ে ভিতরে ঢোকে। দোকানের ভিতরে মেয়েদের ভীড়। আলো, রঙ, গন্ধ সব মিলিয়ে একটা অভিজাত আবহাওয়া। রাণু অনায়াসে কাউন্টারের কাছে গিয়ে বলে—কাঞ্জিভরম আর রেশমী বুটির শাড়ি দেখি।

দোকানদার একটার পর একটা শাড়ি সাজিয়ে দিতে থাকে সামনে। বড্ড লজ্জা করে অনুপমের। রাণু একি করছে? সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাণুর পাশে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ওপাশের কাউণ্টার থেকে একটি অল্প বয়সী সুন্দরী মেয়ে এ পাশের কাউণ্টারে এক মহিলাকে দেখে এগিয়ে আসে—আরে ডলিদি?

—ওমা, সাণ্টি।

— কী মোটা হয়েছো ডলিদি। ফ্যাট কমাও।—সাণ্টি মন্তব্য করে।

—বলিস না, বলিস না! কিছু খাইনা। তবু যে কেন ফ্যাট হচ্ছে।—ডলি নামের মহিলাটি জবাব দেয়।

—ডায়েটিং করছো না?

— ডায়েটিং করতে গিয়ে সে যা অবস্থা হল! প্রেসার লো হয়ে অ্যানিমিয়া হয়ে বিচ্ছিরি কাণ্ড। তাই সব ছেড়ে দিয়েছি। তাও বেশী খাই না রে। তবু মোটা হয়ে যাচ্ছি।

—কী কিনছো? শাড়ি? আর কত শাড়ি কিনবে, তোমার তো শাড়ির পাহাড় হয়ে গেছে।

—তোর বুঝি কম?

মেয়েটি চটুল হাসি হাসে, বলে—তোমার কাছে কিছুই না, কোন শাড়িটা নিচ্ছো?

একটা বেনারসী নিলাম, নিজের জন্যে নয়। ললিতার বিয়েতে দেবো। সোনা দেওয়ারই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু যা দাম সোনার। রিসেণ্টলি এই রতন চূড়টা করালাম, অনেক খরচ হয়ে গেল। উনি বলেছেন আর সোনা দানা কিনবেন না, চারশো টাকা বাজেটে সোনার জিনিষ তেমন দেখনসই হবেও না, তাই শাড়িই দিচ্ছি। ললিতাও বলেছিল—আমাকে শাড়ি দিও মাসি।

—রতনচূড় করিয়েছো। দেখি! মেয়েটা ঝুঁকে মহিলার হাত তুলে চূড়টা দেখে গভীর শ্বাস ছেড়ে বলে - ইস্ কী সুন্দর, চওড়া চূড়! ক'ভরি বলো তো!

—এক একটা তিন ভরি।

—আমাকে একবার দিও তো। স্যাকরাকে ডিজাইনটা দেখিয়ে রাখবো।

– করবি?

—ভাবছি। এবার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে গয়না দেবে বলে রেখেছে। —সাণ্টি জানায়।

—গয়না করতে আজকাল ভয় করে। য' ছিনতাই।

—তোমার কী বাবা। নিজের গাড়িতে চলাফেরা করো। তোমাকে ছিনতাই করবে কে?

—তুইও গাড়ি কিনেছিস শুনলাম।

—কিনেছি, কিন্তু মেনটেন করতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে।

—পুজোয় কী গাড়ীতে বেরিয়েছিলি?

—না। ট্রেনে।

—কোথায় কোথায় গেলি?

—দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর। তোমরা?

—বেশীদূর যাওয়া হয়নি রে। ওঁর একটা জরুরী কনফারেন্স ছিল। মোটে সাতদিন ছুটি। তাই হাজারিবাগ ঘুরে এলাম। বম্বে যাচ্ছি ফেব্রুয়ারীতে।

অনুপম মৃদুস্বরে ডাকল—রাণু হল?

রাণু মুগ্ধ হয়ে শাড়ি দেখছিল। জ্ঞান ছিল না ডাক শুনে মুখ ফেরাল। কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে হাসল একটু, বলল—শাড়িটা বলছে দুশো পঁয়ত্রিশ। বেশ সস্তা, না? বলে একটু চোখের ইশারা করে রাণু। অনুপম নিরাসক্ত গলায় বলে সস্তাই তো!

—নিয়ে নেবো?

খুবই বিপদজনক অবস্থা। পাশের দুজন মহিলা মুখ ফিরিয়ে একপলক তাদের দেখে নিল। অনুপম চোখ বুজে বলে—

—ইচ্ছে হলে নাও।

—আচ্ছা দাঁড়াও, আর কয়েকটা দেখে নিই। বলে, রাণু সেলস্‌ম্যানের দিকে চেয়ে বলে—এটা থাক, পিওর সিল্ক দেখান তো।

বলেই আবার অনুপমের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—শোনো. এবার ব্যাঙ্গালোর গেলে কিন্তু আমি চারজোড়া সিল্কের শাড়ি কিনবো।

অনুপমের বুকের মধ্যে একটা কষ্ট হয়। সে রাণুর কানের কাছাকাছি মুখ নিয়ে বলে এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তোমার হলে এসো।

অনায়াসে মাথা নাড়ল রাণু। অনুপমকে ভুলে গিয়ে শাড়ির মধ্যে মজে গেল। অনুপম হতাশা আর লজ্জা নিয়ে বাইরের ফুটপাথে এসে দাঁড়াল। তার

মনে হচ্ছিল রাণুর সঙ্গে তার কত অমিল। রাণুকে সে হয়তো সুখে রাখতে পারবে না।

খালি হাতে কেবল ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে রাণু বেরিয়ে এল অনেকক্ষণ বাদে। চোরের মতো, চোখে অপরাধ বোধ নিয়ে তাকাল অনুপমের দিকে। চারদিকে ট্রাম বাসের শব্দ, হকারদের চীৎকার, তার মধ্যে সে মৃদু স্বরে বলে, —বকবে না তো?

—বকবো রাণু। তুমি গুল মারছিলে কেন?

—না বোকো না। ক্ষমা করো। অন্যায় হয়ে গেছে।

অনুপম উত্তর দিল না।

রাতে যখন তারা শুতে গেল তখন অনুপম বলল—রাণু শোনো।

—কি?

কলকাতায় দুটো শহর আছে।

—সত্যি?

—সত্যি। একটা স্বপ্নের শহর, একটা সত্যিকারের।

—আমরা কিন্তু সত্যিকারের শহরটায় বাস করি।

রাণু একটা শ্বাস ফেলে বলে—ও।

—রাগ কোরো না।

—না, রাগ করব কেন?—রাণু জবাব দেয়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রাণু গুন্ গুন্ করে বলে—স্বপ্নের শহর আর সত্যিকারের শহর। রাণু মনে রেখো তুমি সতিকারের শহরটায় বাস করো।

অনুপম জিজ্ঞেস করে—কী বলছ?

—না। কিছু না।

রাণু অনুপমের বুক ঘেষে মাথাটা এগিয়ে আনে। বলে—যখনই আমরা রাস্তায় বেরোবো তখনই ক'লকাতার মেয়র শহরকে পরিস্কার রাখবেন। আমাদের আগে আগে যাবে সাইরেনওলা মোটর সাইকেল। আমরা গড়িয়াহাটা থেকে হাজার টাকার শাড়ি কিনব। আট ভরি সোনা দিয়ে বানাবো রতনচুড়। সবচেয়ে দামী সীটে সিনেমা থিয়েটার দেখব। ছুটি কাটাতে নিজেদের গাড়িতে বা ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশে বা এরোপ্লেনে চলে যাবো কাশ্মীর, বোম্বে, ব্যাঙ্গালোর।

—হ্যাঁগো, স্বপ্নের শহর কি এরকম? !

—বোধ হয়।—অনুপম ছোট্ট জবাব দেয়।

রাণু বলতে থাকে—দূর ! তুমি কিছু জানো না। ঐ রকম হলে আর কি কোনো মজা থাকবে ? বরং তখন আর স্বপ্ন বলে কিছুই থাকে না। এরকমই আমরা বেশ আছি। মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে এরকম পালিয়ে যাবো, সিনেমা দেখবো, রেস্টুরেণ্টে খাবো আর দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে জিনিষ দেখব।… মাঝে মাঝে ঐ শহরের লোকেদের কথাবার্তার টুকরো কানে আসবে। বুক জ্বলে যাবে হিংসেয়, জ্বলুক, সেই জ্বলুনিরও আনন্দ আছে।… এই।

—আচ্ছা পাগল একটা—অনুপম বলে।

—তুমি এত হিসেবী কেন ?

—কোথায় হিসেবী ?

—ভীষণ হিসেবী। তুমি স্বপ্নও দেখ হিসেব করে। তুমি কি ভাবো আমি ঐ স্বপ্নের শহরের কেউ হতে চাই ? মোটেই না, এরকমই আমরা বেশ আছি।

—সত্যি বলছ ?

—সত্যি, সত্যি, তিনসত্যি।

তারা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে। খানিকটা ভালবাসায় খানিকটা বিশ্বাসে পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর একসময় তারা ঘুমোয়। তাদের ঘিরে থাকে দুরকম কলকাতা। এক কলকাতার চঞ্চল ঢেউ এসে অন্য কলকাতার স্থির তটভূমি ধুয়ে নিয়ে যায় বারবার। সেই স্বপ্ন ও সত্যের মাঝখানটিতেই তারা থেকে যায় বরাবরের মতো। তটভূমি তাদের ধরে রাখে না। ঢেউ ও নিয়ে যায় না তাদের। দু'রকম কলকাতা তাদের ধরে থাকে।